চার দেয়াল

সত্যপ্রিয় ঘোষ

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ

দাম : তিন টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

চিত্ত ঘোষ

বন্ধুবরেষু

চার দেয়াল

*** * এক * ***

বাংলাদেশের আর-পাঁচটা পরিবারের মতো মিত্র-পরিবারও শিবপ্রসাদ নিত্যপ্রসাদ আর আদিত্যপ্রসাদে ত্রিধা-বিভক্ত হ'য়ে যেতে পারতো, কিন্তু দেখুন গিয়ে কলকাতার বিডন স্ট্রীটের ঐ লাল-টকটকে তেতলা বাড়িটায়, দেখবেন ওরা যে শুধুই একান্নবর্তী তা-ই নয়, ওদের সকলের মধ্যেই মোটামুটি মিলমিশ আছে, ওদের সকলের মনেই কেমন আনন্দ আছে।

এর সব-চাইতে বড়ো কারণ অবিশ্যি এই যে জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ আদিত্যপ্রসাদ দু-জনেরই মাসিক উপার্জন গড়পড়তা এক হাজার; মধ্যম নিত্যপ্রসাদের উপার্জনের পরিমাণ যদি বা এর অর্ধেক, সংসারে সাহায্যের পরিমাণ তাঁরই কিন্তু সর্বাধিক, কেননা অবিবাহিত তিনি। মাইনের চেকটা এনে তিনি দিয়ে দেন ছোটো-বৌ নীরজার হাতে, সে-টাকায় কী হয় না-হয় সে-খোঁজ তো নেবেনই না, কেউ তার হিসেব দিতে এলেও বিষম বিরক্ত হন।

স্ত্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা এবং ঝি-চাকর-শোফার-দরওয়ান ইত্যাদি সব নিয়ে এ-বাড়ির বাসিন্দা মোটামুটি পঁচিশের কম না এবং এরা সকলেই কোনো-না-কোনো সূত্রে ঐ ছোটো-বৌরানী নীরজার কাছে বাঁধা। এমনকি, অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার শিবপ্রসাদ সকাল আটটায় রোজ বেরুবেন ডিসপেনসরিতে— তার আগে তিনি যাবেন ঠাকুরঘরে, গিয়ে বিগ্রহের পায়ে প্রণাম করবেন আর পট্টবস্ত্রমণ্ডিত নীরজা যখন আলগোছে তাঁর হাতে ফেলে দেবেন একটি আশীর্বাদী ফুল, সেইটি কানে গুঁজে বলবেন শিবপ্রসাদ, 'আসি তবে ছোটো-বৌমা।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক নিত্যপ্রসাদ ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু

ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে, এমনকি চিরুনিটা কোথায় সেটা পর্যন্ত জানতে তাঁকে একান্ত বিশ্বাস রাখতে হয় ছোটো-বৌ নীরজারই ওপরে। আর, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গেজেটেড অফিসার আদিত্যপ্রসাদ— তাঁর সঙ্গে নীরজার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তো নিগূঢ়, স্বামী-স্ত্রী।

এই হচ্ছে মিত্র-পরিবারের মোটামুটি একটা কাঠামো। একেবারে সুখী পরিবার যাকে বলে আর কি।

সুতরাং বাইরের লোকের পক্ষে 'মিত্রসদন'-এর বাহ্যিক আবহাওয়া আর চালচলন দেখে এ-কথা ভাবা সম্ভব যে মিত্র-পরিবারের জীবনতরী মন্দাক্রান্তা ছন্দেই প্রবহমান।

সেই প্রবাহে একদা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো।

তারিখটা নির্দিষ্ট ক'রেই বলা যায়। একুশে জানুআরি উনিশ শো পঞ্চাশ। সন্ধের সময়।

'পেয়েছি, পেয়েছি—' বলতে-বলতে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকলো উন্মেষ নিত্যপ্রসাদের ঘরে। দুর্লভ কিছু প্রাপ্তির আনন্দে হঠাৎ সে আর্কিমিডিস হ'য়ে গেছে— অবিশ্যি পুরোপুরিই আর্কিমিডিস নয়, কেননা (এই মাঘ মাসের শীতেও গায়ে তার গেঞ্জিটাও না থাক) পরনে আছে ধবধবে একটা পায়জামা— নিজের ঘরে এক-গাদা বইয়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে-কাটতে হঠাৎ কী তার খেয়াল হয়েছে সে-ই জানে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তারপর আর গোটা পাঁচ-সাত লাফের দরকার হয়েছে, নিত্যপ্রসাদের ঘরে এসে পৌঁছতে। এসেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'পেয়েছি, পেয়েছি!' এবং তারপর, যে-প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারটায় চিৎ হ'য়ে বুকের ওপর প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে ভারতীয় দর্শন-সমুদ্রে নিত্যপ্রসাদ

ভাসমান, সেই চেয়ারটার একটা হাতলের ওপর ব'সে প'ড়ে ঘোষণা করলো উন্মেষ, 'পেয়েছি মেজোমামা, এবার হেরে গেলে তুমি আমার কাছে!'

'হেরে গেলাম!' ভ্রূকুটি করলেন নিত্যপ্রসাদ, চওড়া লাইব্রেরিফ্রেম চশমার অত্যন্ত পুরু কাঁচের নিচে আয়ত স্বভাবতীব্র চোখ দুটি তাঁর জলজ্বল ক'রে উঠলো, ভারী গলায় বললেন, 'কিসে হারলুম? কী পেলি তুই?'

'এবারে যা পেয়েছি—' চোখ দিয়েই একটা লাফ দেবার চেষ্টা করলো উন্মেষ, 'তাতে নির্ঘাৎ প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে যে আমাদের যুগটা তোমাদের যুগের চাইতে অনেক অনে—ক বড়ো।'

'বটে!' সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন নিত্যপ্রসাদ, চশমাটা খুলে নিলেন হাতে।

'নিশ্চয়ই! তুমি-না বলছিলে এ-যুগের চাইতে তোমাদের যুগে মানুষের আত্মসম্মান-বোধও ছিলো বেশি?'

'তা সেটা কি মিথ্যে প্রমাণিত হ'লো!'

'প্রকাণ্ড মিথ্যে।'

'কারণ?'

'তোমাদের যুগে তোমরা যেটাকে আত্মসম্মান-বোধ ব'লে মনে করতে, আসলে সে-বোধটিকে আর যা-ই বলা যাক আত্মসম্মান-বোধ কোনো রকমেই বলা যায় না।'

উষ্মা প্রখরতর হ'লো নিত্যপ্রসাদের চোখে, বললেন না কিছু।

'কেননা আত্মসম্মান-বোধটা কখনো একতরফা হ'তে পারে না। নিজেকে সম্মান পেতে হ'লে অন্যকে সম্মান দিতে হবে আগে। আত্ম-সম্মান-বোধ জিনিসটার জন্ম, সুতরাং, অন্যকে সম্মান দিতে পারলে

তবেই।' (গত বছর আন্তঃ-বিশ্ববিত্থালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উন্মেষ প্রথম হয়েছিলো।)

'কথাটা বোধ করি রবীন্দ্রনাথের। তিনি শুনেছি আমাদের যুগেরই মানুষ ছিলেন।'

'হ্যাঁ, তোমাদের যুগের মানুষ ছিলেন এবং কথাটা বলেওছিলেন এই কারণেই যে তোমরা সব-সময় উদারভাবে সব মানুষকে সমান সম্মান দিতে পারতে না। পারোনি। রবীন্দ্রনাথ নিজে বিরাট পুরুষ ছিলেন, আর তাই—'

'ব'লে যাও!'

'আমরাই যে এ-যুগে সমস্ত মানুষকে সমান সম্মান দিতে পারছি সে-দাবিও করি না, কিন্তু একথা ঠিক যে তোমাদের যুগের চাইতে আমাদের যুগে মানুষের এই চেতনা আরো স্পষ্ট হয়েছে। আরো ব্যাপক, আরো উদার—'

মুখ ফিরিয়ে নিত্যপ্রসাদ দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'অবিশ্যি সেটা যুগেরই নিয়ম—' নিজের যুক্তির দড়ি বেয়ে ডুবুরির মতো নেমে গেল উন্মেষ নিজেরই মনের সমুদ্রে। হাতড়ে-হাতড়ে কথা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো তা নিত্যপ্রসাদের কাছে, 'বলা চলে ঐতিহাসিক নিয়ম। ক্রমেই মানুষ বেশি উন্নত হবে, সমাজ বেশি খাঁটি হবে। ফাঁপা সভ্যতার ধাপ্পা, কৃত্রিমতা ক্রমেই বেশি ক'রে কেটে যেতে থাকবে। মানুষ নতুন ক'রে বাঁচতে শিখবে।'

'মার্ক্স!'

উন্মেষ চুপ।

'মানুষ দিন-দিন সভ্য হচ্ছে, না আরো অসভ্য হচ্ছে?' নিত্যপ্রসাদ প্রায় হুমকি দিলেন একটা।

'দিন-দিন সভ্য হচ্ছে—' বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলার চেষ্টা করলো উন্মেষ, আর সেই জন্যেই কথাটা দুর্বল শোনালো। বোঝা গেল এ-বিষয়ে মনে খটকা আছে তার।

তার কারণ হয়তো বা এই যে, তার মনের প্রায় সমস্ত বোধ-বিচার শিক্ষা-সংস্কার এই নিত্যপ্রসাদেরই মনের প্রত্যক্ষ ছায়া। দশ বছর বয়স থেকে যে সে নিত্যপ্রসাদের একেবারে হাতে-গড়া মানুষ। চাঁদের আলো যেমন পুরোপুরিই সূর্যের, এই একুশ বছরের তরুণ, সিক্সথ্ ইয়ারের ছাত্র উন্মেষের মনটা ঠিক ততটা না হ'লেও প্রায় অনেকটাই যে নিত্যপ্রসাদের।

'দিন-দিন সভ্য হওয়ার জন্যেই কি দেশে আজ এত অনাচার, এত মারামারি কাটাকাটি?'

'তা অনেক দিনের অনেক পাপ জ'মে ছিলো, আজ হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে, একটু বিশৃঙ্খলা তো আসবেই। ফরাসী বিপ্লবের—'

'হুঁ, তোমাদের সেই বিরাট বিপ্লবের জন্যেই—' উত্তেজনা বাড়লো নিত্যপ্রসাদের, 'একটা যুদ্ধ শেষ হ'তে না-হ'তে আর-একটা যুদ্ধ লাগানোর জন্যে তোমরা হন্যে হ'য়ে উঠেছো!'

'এটা তোমার ভুল যুক্তি মেজোমামা—' উন্মেষকে একটু শ্রান্ত মনে হ'লো যেন, 'যুদ্ধ লাগানোর জন্যে আমরা হন্যে হ'য়ে উঠিনি, তার জন্যে হন্যে হ'য়ে উঠেছে পৃথিবীর ইম্পিরিয়ালিস্ট পাওয়ারগুলো।'

'বেশ তো, কিন্তু তার জন্যে তোমাদের কোনোই দায়িত্ব নেই! আজকের এই পাওয়ারগুলোর খ্যাপামির জন্যেও দায়ি আমাদের যুগ?'

'নিশ্চয়। তোমরা যারা জীবনের নতুন নীতি, নতুন ইণ্টারপ্রিটেশন মেনে নাওনি— আজকের এ-খ্যাপামির দায়িত্ব তো তাদেরকেই নিতে হবে।'

স্কুল-কলেজের কোনো পরীক্ষায়, কোনো বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় যে-উন্মেষ কোনোদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি, সে আজ নিত্যপ্রসাদের সঙ্গে এমনি একটা সাধারণ তর্কে, এমনি একটা আটপৌরে সহজ প্রসঙ্গে কেন যে এত উন্মনা, এত পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লো এত অল্পেই, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু লক্ষ্য করবার জন্যে ঘরে তো কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নেই।

'আচ্ছা!' নিত্যপ্রসাদ এমন একটা ফুৎকার দিলেন যেন উন্মেষ ভীষণ একটা ছেলেমানুষী কথাই ব'লে ফেলেছে। 'কী তোমাদের সেই নতুন ইণ্টারপ্রিটেশন অব লাইফ?'

উন্মেষ চুপ ক'রে রইলো।

'ব'লেই ফ্যালো না!' নিত্যপ্রসাদ যেন বিদ্রূপ করছেন উন্মেষকে। যেন অতর্কিতে নিজের বয়স আর মর্যাদা ভুলে গিয়ে নেমে এসেছেন তিনি অনেক নিচে। কুটিল অসংযত হ'য়ে গেছে তাঁর ভঙ্গি।

চুপ ক'রেই রইলো তবু উন্মেষ।

'ডায়লেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম বোধ হয়!'

চোখ তুলে তাকালো উন্মেষ নিত্যপ্রসাদের চোখে। কিন্তু বললে না কিছু।

'তা হঠাৎ এমনি রাতারাতি একটি মার্কসিস্ট হ'য়ে গেলে কী ক'রে তুমি! নাম-টামও লিখিয়েছো নাকি পার্টিতে?' সমানে-সমানে তর্কের মেজাজ থেকে নিত্যপ্রসাদ ইতিমধ্যে গুরুজনী শাসনের মেজাজে পৌঁছে গেছেন।

উন্মেষ উত্যক্ত হ'য়ে উঠলো। কেননা ব্যাপারটা এমনি মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়াবে অনুমান করেনি সে। মেজোমামার সঙ্গে নিছক খানিক পণ্ডিতি তর্কের প্রেরণাতেই ছুটে এসেছে সে নিত্যপ্রসাদের ঘরে, কিন্তু

এ যে কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বেরুনোর মতো হ'য়ে দাঁড়ালো। সে তো এত সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চায়নি, দোষের মধ্যে এই যে, সে নিত্যপ্রসাদের নিজের যুগের উচ্চকণ্ঠ মাহাত্ম্য-কীর্তন মেনে না নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজেছে এবং যে-যুক্তি পেয়েছে তারই একটি তুলে ধরেছে নিত্যপ্রসাদের কাছে।

উন্মেষকে অমনি মুখনিচু ব'সে থাকতে দেখে একটু নরম হলেন নিত্যপ্রসাদ। মনে-মনে এক দুর্ভাবনার হাত থেকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তবুও গুরুজনী কর্তৃত্বের নাগপাশটা আরো-একটু শক্ত ক'রে নেবার জন্যেই বোধ করি আরো-একটা ধমক তিনি না দিয়ে পারলেন না, 'তা, কবে থেকে এ-সব হচ্ছে তলে-তলে?'

'কী, হয়েছে কী, বকছো কেন ওকে?' বিভাবতী এসে দাঁড়ালেন।

বিভাবতী নিত্যপ্রসাদের ছোটো বোন। আদিত্যপ্রসাদেরও ছোটো। সোনায়-দানায় সুখী ভাগ্যবতী সাত ছেলে-মেয়ের মা বিভাবতী। দিন কয়েক আগে বাপেরবাড়ি বেড়াতে এসেছেন।

'বকবো না, একশো বার বকবো। দিন-দিন গোল্লায় যাচ্ছে, গাধিয়ে যাচ্ছে উনিশটা!' অনেকক্ষণ পর্যন্ত শাসন চালিয়ে বেশ প্রসন্ন হ'য়ে এসেছে নিত্যপ্রসাদের মেজাজ, এবার তাই তৃতীয় একটি প্রাণীকে পেয়ে গিয়ে স্বাভাবিক মেজাজে নেমে আসতে পারলেন।

কিন্তু এদিকে বিভাবতীর অবস্থা দাঁড়ালো শোচনীয়। নিত্যপ্রসাদের কথা শুনে প্রথমে অল্প একটু হাসলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রসাদের 'গাধিয়ে' শব্দটা ছিটকে এসে পড়লো তাঁর স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর ওপর, আর পড়তেই সারা শরীর কেঁপে উঠলো তাঁর, হাসির দমকে ফেটে পড়লেন তিনি, প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো দুমড়ে কুঁকড়ে এলিয়ে পড়লেন একটা সেটির ওপর, হাসির টুকরোগুলো তাঁর ছিটকে-

ছিটকে সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, এতক্ষণকার থমথমে গম্ভীর হাওয়াটাও বাতিল হ'য়ে গেল।

বিভাবতীর এত হাসির কী কারণ ঘটলো অতর্কিতে সেটা অবিশ্যি ঠাহর ক'রে উঠতে পারলেন না নিত্যপ্রসাদ। উন্মেষ তো ভড়কে গিয়ে উঠেই দাঁড়ালো। ভাবলো, মাসিমা অবিশ্যি কারণে অকারণে হেসে ওঠেন, কিন্তু তাই ব'লে হঠাৎ এমন পাগলের মতো হাসি।

অবশেষে বিভাবতী মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন হাসিটা। হাঁপাতে লাগলেন।

নিত্যপ্রসাদ গম্ভীর কপট আশঙ্কায় মাথা নেড়ে বললেন, 'না না খুকি, এ হাসির কথা নয়, এমনি ক'রে যদি উনিশ গোল্লায় যেতে থাকে তো ও পাসই করতে পারবে না— এ আমি একেবারে লিখে দিতে পারি।'

স্মিত হাসি ফুটলো উন্মেষেরও ঠোঁটে এবার। নিশ্চিন্তে ব'সে পড়লো আবার সোফাটায়।

'আবার 'ল' নিয়েছেন সঙ্গে!' বকতে লাগলেন নিত্যপ্রসাদ, 'একশো-বার ক'রে বললাম, ওরে, ও তুই পারবিনে, পারবিনে। ছোঁড়ার তবু আক্কেল হ'লো! —না মেজোমামা, ও আমি ঠিক পারবো। পার এখন! ছোঁড়া নিজেই চলতে পারে না, সঙ্গে নিয়েছে একটা গাধা-বাট!'

ততক্ষণে বিভাবতী সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'বাঃ! উনিশই যদি একসঙ্গে এম. এ. আর 'ল' না পড়তে পারে—' উন্মেষের একটা হাত বিভাবতী নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাহ'লে তুমিই বা কেমন ক'রে ও-দুটো একসঙ্গে পড়েছিলে আর ভালো পাসও করেছিলে— যেখানে উনিশ বি. এ.-তে হ'লো ফার্স্ট আর তুমি তো মোটে··· সেকেণ্ডও না— একেবারে থার্ড!'

উন্মেষ বিভাবতীর হাতে একটু চাপ দিয়ে তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছিলো, কিন্তু বিভাবতী সেটা গায়ে মাখলেন না, ভাবলেন না এ-কথায় নিত্যপ্রসাদ ভীষণ খাপ্পা হন।

হলেনও তাই। উন্মেষের মাথায় এক চাঁটি মেরে বললেন, 'বল সত্যি ক'রে কী ক'রে ফার্স্ট হলি তুই— কার নোট মুখস্থ ক'রে, বল সত্যি ক'রে—'

'তোমার তোমার তোমার···হ'লো তো!'

'হুঁ—' চোখ পাকিয়ে নিত্যপ্রসাদ আর একবার শাসিয়ে দিলেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত যেন একথা স্মরণ থাকে।' নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার শুলেন নিত্য-প্রসাদ। তাকালেন বিভাবতীর দিকে, ভাবখানা, শুনলি তো!

'তা হ্যাঁ রে ছোঁড়া—' মুহূর্তে আবার শক্ত হ'য়ে গেছে তাঁর গলা, বললেন, 'তুই যে একদম এলো-গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস বড়ো! ভেবেছিস কী! যা, কিছু গায়ে দিয়ে আয় শিগগির। একটা-কিছু না বাধিয়ে তোর আর সোয়াস্তি নেই। যাঃ—'

'যা-একটা অলবড্যে অলম্বুশ হচ্ছে ও দিন-দিন—' বিভাবতী যোগান দিলেন, 'শীতের মধ্যে জামা একটা গায়ে দিবি, তা-ও অন্য লোককে ব'লে দিতে হবে! কী রাশিতে যে বাপু জন্ম তোমার। তা হ্যাঁ মেজদা, কাল নাকি সমস্ত স্কুল-কলেজে আবার স্ট্রাইক?' শঙ্কান্বিত বিভাবতী একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললেন।

বোঝা গেল, স্পষ্টই, নিত্যপ্রসাদ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন মনে-মনে। আর এইটেই বিপদ। সত্যিই যখন তিনি রাগেন, তখন হঠাৎ যেন গুমোট বেঁধে যান। থমথমে হাওয়ায় শাদা মেঘ সিঁদুরে হ'য়ে ওঠে।

বিভাবতীর কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে নিত্যপ্রসাদ বোজানো-বইটা খুলে

ফেললেন। চশমাটা সেঁটে দিলেন চোখে। ন'ড়েচ'ড়ে বসলেন একবার। কিন্তু ছাপার অক্ষরগুলোর দিকে তিনিই তাকিয়ে রইলেন, না ছাপার অক্ষরগুলোই তাঁর দিকে, বোঝা গেল না।

—এ তুমি কী করলে মাসিমা, মেজোমামার কাছে কি এ-প্রসঙ্গটা না তুললেই চলতো না! মুখে নয়, বিভাবতীর দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে নীরব অনুযোগ জানালো উন্মেষ।

বিভাবতী আরো শঙ্কিত হ'য়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে বাপের-বাড়ি বেড়াতে এসে অসাবধানে নিত্যপ্রসাদের স্বভাবটা বুঝি ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উন্মেষের চোখে চোখ পড়তেই বিভাবতী সন্ত্রস্ত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। এবং এরকম পরিস্থিতিতে প্রায়ই যা অনিবার্য, বিভাবতী আগুনে, অবিশ্যি না বুঝে, ঘি ঢাললেন।

বললেন, 'অখিল— ঐ যে পাশের বাড়ির ছেলেটি আসে, সে-ই তো ব'লে গেল। নয়তো আমি আবার কেমন ক'রে জানবো। বা-রে-বা, তোর কাছেই তো বললো!' —বিভাবতী উন্মেষকে দলে টানতে চাইলেন।

বিরক্তি লাগলো উন্মেষের। উঠে পড়লো। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। আর, উন্মেষকে চ'লে যেতে দেখে বিভাবতীও উঠলেন।

'উনিশ!'

ফিরতে হ'লো। চৌকাঠের ওপার থেকে ফিরতে হ'লো উন্মেষকে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, চোখে গাম্ভীর্য টেনে উনিশ ফিরে এসে বসলো ফের সোফাটায়।

'কী বলেছে অখিল?' চোখ তুললেন না নিত্যপ্রসাদ বই থেকে, গম্ভীর গলায় বললেন।

উত্তরে কী-একটা বলতে চেষ্টা করলো উন্মেষ, কিন্তু কিছুই ব'লে উঠতে পারলো না। চুপচাপ ব'সে রইলো গোঁজ হ'য়ে।

বিভাবতী, ইতিমধ্যেই রীতিমতো পীড়িত, ব'লে উঠলেন, যেন না ব'লে পারলেন না, 'আরে না মেজদা, উনিশ তাই ব'লে স্ট্রাইক চায় না। ও তো বরং বলছিলোই, আমি কিছুতেই স্ট্রাইকে যাচ্ছিনে, ম'রে গেলেও না, হ্যাঁ—' উন্মেষের দিকে বিভাবতী ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বরফ একটু গললো বুঝি। একটু বুঝি উজ্জ্বল দেখালো।

'কিন্তু স্ট্রাইকটা কিসের, সেইটেই আমি জানতে চাই—' প্রায় গর্জন ক'রে উঠলেন নিত্যপ্রসাদ।

উন্মেষ চুপচাপ ব'সেই রইলো।

'তুই যদি না জানিস—' বিভাবতী সাগ্রহে সাহায্য করতে চাইলেন, 'বল-না, জানিনে আমি কিছু।'

—ব'লেই কয়েক মুহূর্ত সময় ছেড়ে দিলেন বিভাবতী যেটুকু লাগতে পারে উন্মেষের তাঁর বুদ্ধিটা লুফে নিতে। কিন্তু অত্যন্ত শঙ্কিত বিভাবতী যখন লক্ষ্য করলেন উন্মেষের জড়তা কাটলো না তবু, নিজেই এগিয়ে এলেন তখন, হাত নেড়ে বললেন, 'ও ছেলেমানুষ, ও এ-সবের জানেই বা কী বলো! তুমি ওর ওপর অনর্থক খাপ্পা হচ্ছো কেন—'

'জানবো না কেন—' ছেলেমানুষ ব'লে যেন তার পৌরুষকে অপমান করা হ'লো, তাই পরুষ গলায় একরকম চেঁচিয়েই উঠলো উন্মেষ, 'না-জানার কী আছে!'

'হ্যাঁ, কী জানো সেইটেই জিগ্যেস করা হচ্ছে!'

'স্কটিশের যে-আটটি ছেলেকে—' অস্বাভাবিক গলায় বললো উন্মেষ, 'রাস্টিকেট করেছে, তাদের ফিরিয়ে নেবার দাবিতে—'

কী বলবে উন্মেষ অজানা ছিলো না নিত্যপ্রসাদের, তাই ফেটে

পড়বার জন্যে একরকম তৈরিই ছিলেন। কিন্তু বারুদে যখন আগুন পড়লো, এক অমানুষিক চেষ্টায় নিজেকে চেপে রাখলেন নিত্যপ্রসাদ, বলতে চাইলেন, 'কলেজের শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব কলেজ-কর্তৃপক্ষের, না কি তা-ও তাঁদের ছাত্র-য়্যুনিয়নের কাছ থেকেই শিখে নিতে হবে!' —কিন্তু উদ্‌গত রোষ দমনের চেষ্টায় একথাগুলো তাঁর ছত্রখান হ'য়ে গেল, কোথায় হারিয়ে গেল, যা বললেন তিনি তা যেন তাঁর গলা থেকে বেরুলো না, কেমন একরকম অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বললেন তিনি, 'তুমি কি স্কটিশে পড়ো?'

উন্মেষের ইচ্ছে হ'লো চিৎকার ক'রে বলে, 'না!' কিন্তু নির্বাক, একটু ন'ড়েচ'ড়ে বসলো শুধু সে।

'বলো, তুমি কি স্কটিশে পড়ো?'

'কী ফ্যাসাদেই পড়লাম গা—' বিভাবতী ব্যাকুল গলায় বললেন, 'স্কটিশে ও পড়তে যাবে কোন দুঃখে বলো দেখি, ও না ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ঐ তোমার দোষ মেজদা, কী থেকে কী যে তুমি টেনে আনবে!'

'তুমি যাবে একটু এখান থেকে এখন—' ধমক দিলেন নিত্যপ্রসাদ বিভাবতীকে, 'জিনিসটা আমি একটু বুঝে নিতে চাই।'

অস্বস্তিতে বিভাবতী হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তবু একটু উশখুশ করলেন, তারপর, 'বোঝো তুমি—' বলতে-বলতে পালিয়ে বাঁচলেন।

'ছেলেরা এমন-কিছু অন্যায় করেনি—' উন্মেষ ব'লে ফেললো, 'যাতে তাদের একেবারে রাস্টিকেট করা চলে।'

প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ের পরিমাণ সম্বন্ধে উন্মেষের মনে খটকাই ছিলো, তাই এ-ধর্মঘটে সায় দেয়া উচিত কি না এ নিয়ে তার মন বেশ চঞ্চলই হ'য়ে পড়েছিলো। বিশেষ ক'রে মেজোমামার ভয়টাই ছিলো বেশি। হয়তো দেখা যেত, সে ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে—

কিন্তু কেমন যেন হঠাৎ তার মনের মধ্যে সব জট পাকিয়ে গেল। কী বলতে কী ব'লে বসলো। ধর্মঘটীদের সে সমর্থন করলো।

'ও! মেয়েদের গায়ে হাত তোলাও তোমাদের কাছে—' নিত্যপ্রসাদের ঠোঁট প্রায় কাঁপতে লাগলো, 'এমন-কিছু অন্যায় নয়!'

'মেয়েটা অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিলো আগে।'

'আর তাই ছেলেটা মেয়েটার গালে চড় মেরে সভ্যতা বজায় রেখেছে!'

'ছেলেটা তো বলছে, চড় সে মারেনি, শুধু ঠেলে দিয়েছিলো।'

'আর মেয়েটা তো বলছে, শুধু চড়ই সে মারেনি, গায়ের জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে দিয়েছে!'

'কিন্তু এ নিয়ে সত্যিকারের কোনো তদন্তই হয়নি।' উন্মেষ হাঁপিয়ে উঠলো।

'চুপ কর!' গর্জন ক'রে উঠলেন নিত্যপ্রসাদ, 'সব তদন্তওয়ালা এসেছেন! যত সব অকালকুষ্মাণ্ডের দল!'

উত্তেজনার তাপে উঠে পড়লেন নিত্যপ্রসাদ। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে পায়জামা আর জোব্বায় আচ্ছাদিত সেই ছ-ফুট লম্বা দেহটির থেকে ফিকে কালো একটি ছায়া নানান আকৃতি ধ'রে ওঠানামা করতে লাগলো মেঝে থেকে দেয়ালে, দেয়াল থেকে মেঝেয়। আর একটি ছায়া কিন্তু রইলো স্থির, নিশ্চল, একাকার।

'না, এ প্রায় অসম্ভবই হ'য়ে দাঁড়ালো—' যেন অনেক বিবেচনার পর নিত্যপ্রসাদ অবশেষে স্বগতোক্তি করলেন, 'তোমাকে আমি আর রাখতে পারলুম না! না— না! কালই লিখে দিচ্ছি মন্মথকে, সে এসে ব্যবস্থা করুক তোমার— হ্যাঁ, পরের ছেলের দায়িত্ব আমি রাখি কেন— যাও,

নিজের ঘরে যাও, দেখো ভেবেচিন্তে কী করবে তুমি।' একটু থামলেন নিত্যপ্রসাদ, এক-ঝলক তাকিয়ে নিলেন উন্মেষের দিকে, 'তবে আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না, হ্যাঁ, এটা স্থির জেনো— ও নো! হাউ ক্যান আই হেল্প!'

অস্থির পায়ে বেরিয়ে গেল উন্মেষ ঘর থেকে।

ঘণ্টা দুই পরে। রাত ন'টা।

'এই যে মানিকচন্দর, হচ্ছে কী ব'সে-ব'সে—' নাচের ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলো ঘূর্ণি।

মানিকচন্দ্রের গ্রাহ্য নেই।

'বোকচন্দরের মুখে বাক্যি নেই কেন!' দৈত্যের মতো মোটা একটা বই চোখের সামনে খুলে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ব'সে থাকা বোকচন্দ্রের বাক্যি হ'রে গেছে সন্দেহে ঘূর্ণি উন্মেষের থুঁতনিতে হাত দিলো।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে-হাতখানা এমন তীব্র একটা চিমটির সংবর্ধনা পেলো যে যন্ত্রণায় তা নাচতে আরম্ভ করলো, যতক্ষণ-না ঘূর্ণি সেটাকে কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে চিৎকার ক'রে উঠতে পারলো, 'রাক্ষস কোথাকার, গুণ্ডা কোথাকার! দাঁড়া-না, জ্যাঠামণিকে ব'লে আমি তোকে আরো কী নাকালটা ক'রে ছাড়ি দেখবি এখন!'

'যা, তাই করগে যা, এখানে ব'সে নাকে কাঁদিসনে।'

'অ্যা অ্যা অ্যা!' ভেংচি কাটলো ঘূর্ণি, 'হাবা কোথাকার, এক নম্বরের হাবা! কেমন বকুনিটা খেলি জ্যাঠামণির কাছে! পেট ভরেছে?'

'কী রে, তুইও এসে জ'মে গেলি নাকি। আয় শিগগির খেতে।' দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়ালেন নীরজা, তাড়া দিলেন।

'এই ছ্যাখো-না মা—' নাকে কেঁদে উঠলো ঘূর্ণি, 'গঙ্গারামটা কী করছে !'

'কী করছে—' নীরজা ঘরের মধ্যে না ঢুকে আর পারলেন না।

'কী করছিস রে গঙ্গারাম !' এগিয়ে এসে উন্মেষের চেয়ারের পিঠে দাঁড়িয়ে নীরজা উন্মেষের চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আদর করলেন, চুলে টান্ দিয়ে বললেন, 'চল, খেতে চল, সবাই ব'সে আছে। একি, একদম খালি-গা হ'য়ে ব'সে আছিস তুই, হ্যাঁ রে হতচ্ছাড়া ছেলে, সাপের পাঁচ পা না কি দেখেছিস বল দেখি, অ্যাঁ। না, তোর পেছনে টৈটৈ ক'রে-ক'রে আর পারিনে বাপু—' বলতে-বলতে নীরজা খুঁজে-পেতে নিয়ে এলেন উন্মেষের গেঞ্জি আর জাম্পার, ঢুকিয়ে দিলেন তার গায়ে, যেন একটি রবারের পুতুলের গায়েই ঢোকানো হ'লো তা।

'বাঃ ! বেশ তো ! চমৎকার !' নীরজার ব্যবহারে চমৎকৃত ঘূর্ণি হৈচৈ ক'রে উঠলো, লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে 'আচ্ছা, বলছি আমি জ্যাঠামণিকে—' শাসিয়ে গেল।

'কী যে তিড়িং-তিড়িং করে ফড়িঙের মতো—' আক্ষেপ করলেন নীরজা, 'এক কুড়ি বয়স হ'লো, তবু যদি মেয়ের ধিঙ্গিপনা গেল ! নে ওঠ, চল—খিদে নেই পেটে !'

'আমি আজ তোমাদের সঙ্গে বসবো ছোটোমামি।' বললে উন্মেষ মৃদু গলায়।

'ওমা কেন ?'

'এমনি।'

'এমনি ! ও !' হেসে ফেললেন নীরজা, 'মেজোভাসঠাকুর বকেছেন তাই ?'

'না ছোটোমামি না, এ হাসির কথা না, মেজোমামার এত বাড়াবাড়ি আমার সহ্য হয় না।'

হাসি মিলিয়ে গেল নীরজার।

'কেন তিনি ওরকম করেন! স্বাধীনভাবে বুঝবার চলবার এখনো কি আমার বয়স হয়নি!'

'ছি উনিশ, ছি! মেজোভাসঠাকুরের নামে অমন ক'রে বলতে আছে—'

'কেন, তিনি কি সমালোচনা-টোচনার উর্ধ্বে নাকি?'

'উনিশ!' চমকে উঠলেন নীরজা, 'কী বলছিস তুই যা-তা!'

'তুমি তো তা বলবেই, তোমাদের তো আর গায়ে লাগে না!' বেপরোয়া উন্মেষ ব'লে চললো, 'আমাকেই ভুগতে হয়!'

'ভুগতে হয়!' নীরজা উন্মেষের কথাবার্তায় অবাক হ'য়ে গেলেন, ব্যাকুলভাবে বললেন, 'তোকে না মেজোভাসঠাকুর প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন—'

গুম হ'য়ে রইলো উন্মেষ। নীরজাও চুপ ক'রে রইলেন কতক্ষণ। তারপর উন্মেষের মাথায় হাত রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'মেজোভাসঠাকুরকে কোনোদিন ভুল বুঝিসনে উনিশ। সে-দুর্মতি যেন তোর কোনোদিন না হয়।' ব'লে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে ব'লে গেলেন, 'শুয়ে পড়িসনে যেন, আমার সঙ্গেই খাবি এখন।'

নীরজা চ'লে যেতেই যে-আগুনে উন্মেষ পুড়ছিলো এতক্ষণ, সেইটেই আরো লেলিহ শিখা বিস্তার করলো। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে পড়লো সে। কী সে করবে এখন, কেমন ক'রে সে এ-যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবে!

মনে হ'তে লাগলো তার, তার চাইতে অপদার্থ তার চাইতে অসার্থক জীবন যেন পৃথিবীতে আর দুটি হ'তে পারে না। কেননা, কী মূল্য তার জীবনের— স্বাধীন সত্তা স্বাধীন অস্তিত্ব ব'লেই যার নেই কিছু, কী মানে তার বেঁচে থাকার।

এ যেন একটা মাটির পুতুল। সেটা ইচ্ছে হয় রাখো, ইচ্ছে হয় যখন খুশি পায়ের তলে ফেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফ্যালো। কোনো আপত্তি আসবে না, কোনো প্রতিবাদ উঠবে না। ভেঙে নতুন ক'রে গ'ড়ে নাও সেটা, তোমার খুশি মতো, তোমার মর্জিমাফিক। এই, এই আমার জীবন?

সমস্ত চেতনা উন্মেষের আজ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে নিত্যপ্রসাদের বিরুদ্ধে। নিত্যপ্রসাদের স্নেহের বন্ধন আজ কেমন যেন হঠাৎ নাগপাশ হ'য়ে উঠলো উন্মেষের কাছে। আজ বারো বছর পর্যন্ত যে-স্নেহের আড়ালে-আবডালে, যে-স্নেহের আলো-হাওয়ায়, যে-স্নেহের শিক্ষা-দীক্ষায় উন্মেষ আজ একুশ বছরের একটি তরুণ, একুশ বছরের একটি জলজ্যান্ত মানুষ, সেই মানুষটি যেন নিত্যপ্রসাদের স্নেহের সোনার কাঠি শিয়রে নিয়ে এতকাল ঘুমিয়ে ছিলো। সেই সোনার কাঠি আজ কেমন ক'রে গেছে স'রে, একুশ বছরের ঘুমন্ত ছেলেমানুষটি আজ জেগে উঠে যেন নিজের অস্তিত্বে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছে।

কত কীই মনে হ'তে থাকে উন্মেষের।

একবার মনে হ'লো তার, সে যেন একটা লাগাম-বাঁধা ঘোড়া! ছোট্ বললে ছুটলাম, থাম্ বললে থামলাম। এই তো আমার জীবন!

অথবা কুকুর? আহা সেই প্রভুভক্ত একান্ত বশংবদ কুক্কুরের জীবটি!

অপদার্থতার এত বড়ো একটা গ্লানি, অসার্থকতার এত বড়ো একটা লজ্জা— মনে-মনে ভেঙেচুরে ছত্রখান হ'য়ে যেতে লাগলো উন্মেষ— চিরজীবন, সমস্ত জীবন ধ'রে কি ব'য়ে বেড়াতেই হবে আমাকে?

ভালোবাসেন! প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন!

তবে আর কী, মুখ থুব্‌ড়ে নাক গুঁজে চোখ বুজে প'ড়ে থাকো পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গে, নিদিধ্যাসন করো, আর আত্মোন্নতির অদ্বিতীয় উপায়-স্বরূপ মানসে ও প্রত্যক্ষে তাঁকে, পরম চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তাঁকেই প্রদক্ষিণ করো নিয়ত, আর কায়মনোবাক্যে সেই-যে এক কর্তাভজা সাধু আসে বড়োমামার কাছে তার মতো পিটপিটে চোখে ব'লে ওঠো থেকে-থেকে, 'হেই কত্তা আউলে মহাপ্রভু! আমি তোমার সুখে চলি-ফিরি, তিলার্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু!'

এই-না এমন ভালোবাসার দাবি!

উন্মেষ যেন পৃথিবী পাহাড় অরণ্য সমুদ্র ডিঙিয়ে এক উত্তাল দুর্বার বেগে উড়ে চ'লে যেতে লাগলো কোন মহাশূন্যের দিকে আর রুদ্ধশ্বাস চিৎকার করতে লাগলো নির্বাক ভাষায়— কেন, কেন একটি মানুষ আর-একটি মানুষকে এমনি ভালোবাসবে যাতে একজনের জীবন বাঁধা প'ড়ে যাবে সংকীর্ণতার নাগপাশে, অসার্থকতার গ্লানিতে, পরাধীনতার লজ্জায়? ভালোবাসার বন্ধনে কেন একজন মানুষ অন্যজনের জীবন এমন ক'রে অর্থহীন ক'রে দেবে?

এ-পর্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। কিন্তু সে কি আমি? মেজোমামা আজও কবুল করিয়ে নিলেন— আমি নই সে, ফার্স্ট হয়েছে তাঁর নোট-গুলো! সে কি মিথ্যে? আমি কি শুধু মুটেগিরিই করিনি? মেজোমামার টেব্‌ল থেকে পরীক্ষা-ঘরে ব'য়ে নিয়ে গেছি দিস্তা-দিস্তা মহামূল্য সব ধ্যান ধারণা চিন্তা গবেষণা, আর তার দাম হিসেবে ভারী-ভারী সব নম্বর ফের ব'য়ে নিয়ে এসেছি মেজোমামার ঘরে। আনন্দের, হাসির, তৃপ্তির হিল্লোল ব'য়ে গেছে মেজোমামার মুখে, কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও কখনো লেগেছে কি আমার মুখে? কখনো কি আমি জেনেছি সাফল্য শব্দের কী

অর্থ, কেমন ক'রে সফল হ'তে হয়, সফল না হ'লে কী হয় ? তাহ'লে সফল হ'য়েই বা আমি করলাম কী ! 'আরে উন্মেষ বোস যে ফার্স্ট হবে সে তো জানা কথাই, যাকে বলে স্বতঃসিদ্ধ—' সেদিন কে যেন বলছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন ? বি.এ-তে ইংরেজি অনার্সে আমার ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হওয়া উপলক্ষে মেজোমামা বাড়িতে যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, সেই সভায় অধ্যক্ষ চক্রবর্তী প্রথমেই এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন মেজোমামাকে, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলেছিলেন, 'ইট্'স্ ইওর অ্যাচিভমেণ্ট প্রফেসর মিত্র !' মেজোমামার মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলো, মুখে হাসি ফুটেছিলো। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, অধ্যক্ষ চক্রবর্তী তখন মৃদুহাস্যে সংক্ষেপে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন, 'কংগ্র্যাচুলেশনস্ উন্মেষ, অলসো ইট্'স্ নাথিং আনইউজুয়াল ফর ইউ।' আসলে কথাটা কি উনি সেই বিশেষ, সেই গভীর অর্থেই বলেননি— যে বলেছিলো 'স্বতঃসিদ্ধ' ?

টেব্‌লের ওপর মুখ গুঁজে উন্মেষ নিজের চেতনাকে ঝাঁকাতে লাগলো, এমনি ক'রে নিজের অহং-বোধের শূন্যমুখী টানে সে ছত্রখান হ'য়ে যেতে লাগলো।

এবং এমনি অবস্থায় আচ্ছন্ন চেতনায় ঘুমিয়ে পড়লো উন্মেষ টেব্‌লের ওপর।

নির্বোধ টেব্‌ল-ল্যাম্পটা জ্বলতে লাগলো একই ভাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলো ঘূর্ণি।

'ও মা, ছেলের কাণ্ড ভ্যাখো !' গালে হাত দিয়ে খেদ করলো সে, স্বগতোক্তি করলো, 'যাই মাকে ডেকে নিয়ে আসি, অবস্থা কিছু গুরুতর মনে হচ্ছে ! ওরে ও গঙ্গারাম, ওঠ্ ওঠ্, হয়েছে, জ্যাঠামণি ব'লে দিয়েছেন আর কক্ষনো বকবেন না তোকে, নে, উঠে পড়। নাঃ, এ যে সত্যিই ঘুমুচ্ছে মনে হচ্ছে ; ঐঃ—' উন্মেষের চুল ধ'রে এক ঝাঁকুনি লাগালো ঘূর্ণি।

উঠে বসলো উন্মেষ। ঘুমের ঘোরে চোখ কচলাতে লাগলো।

'খুব হয়েছে, নিন, এবার খেতে যেতে আজ্ঞা হয়।'

দাঁড়ালো উন্মেষ। গম্ভীর গলায় বললে, 'চল যাচ্ছি।'

'বাঃবা, চোখ দুটো কী! গাঁজা খেয়েছেন যেন!' একটু ভয়ে-ভয়েই ঘূর্ণি দরজার দিকে এগুলো।

পেছন-পেছন এলো উন্মেষ।

আর ঘূর্ণি ঘরের বাইরে পা দিতেই পেছন থেকে উন্মেষ দড়াম ক'রে দরজাটা দিলে বন্ধ ক'রে।

দিয়ে ফিরে এলো, আলোটা নিভিয়ে দিলো, বিছানায় এসে লেপমুড়ি দিয়ে দরজার ওপিঠে ঘূর্ণির হৈচৈ শুনতে লাগলো।

* * দুই * *

স্কটিশ চার্চ কলেজের আটটি ছেলেকে রাষ্টিকেট করা হয়েছে— তারই প্রতিবাদে আজ কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজ ধর্মঘট করুক, স্কটিশের অধ্যক্ষকে বাধ্য করুক এই সর্বনাশা শাস্তি প্রত্যাহার ক'রে নিতে— পশ্চিম বাংলা ছাত্র-ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত।

স্কটিশের অধ্যক্ষ কেন এমন কাজ করতে গেলেন? কী এমন অন্যায়টা হয়েছিলো ছেলেদের? তা অন্যায়টা তো তুচ্ছ নয়— বিশিষ্ট অধ্যাপক বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর অপরেশ রায়চৌধুরী ছেলেদের পিকেটিং-এর বেষ্টনী অগ্রাহ্য ক'রে কলেজে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন ব'লে গোপাল বসাক নামে ষণ্ডামার্ক ছেলেটি তাঁকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপর শুইয়ে দিয়েছিলো, তারক সেন ব'লে ছেলেটি হেলেন গোস্বামী নামে মেয়েটিকে চড় মেরেছিলো, রগচটা পাগলা প্রভাত স্বয়ং অধ্যক্ষের নাকের সামনেই আস্তিন গুটিয়েছিলো— এ-সব অপরাধ কি তুচ্ছ করবার মতো?

কিন্তু এমন অসভ্যতা কেন করতে গেল তারক-গোপাল ওরা? ভব্যতা-জ্ঞান কি আজকালকার ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ খুইয়েছে? ওরা নিজেরা তো তা স্বীকার করে না। বলে: আপনারা আমাদের গ্রাহ্য করতে শিখুন, আমরাও আপনাদের গ্রাহ্য করতে পারবো। আমরা বলেছিলাম আজ কলেজ বসতে পারে না, দেশের হৃদয়হীন সরকার ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের নির্বান্ধব দীন দুঃস্থ স্ত্রী-পুরুষের ওপর গুর্খা সৈন্য দিয়ে যদি অমন বর্বর প্রলয়কাণ্ডটা করাতে পারলো, আমরা তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও জানাতে পারবো না? সমস্ত দেশটাকে তোমরা একটা মগের মুল্লুক ক'রে তুলতে পারলে, আর তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তুলতে গেলেই

শহরময় একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর কারফিউ জারি ক'রে আমাদের ঠাণ্ডা বানাতে চাও তোমরা! আমরা বলছি, আজ কলেজ বসবে না, আপনারা আমাদের বাধা দেবেন না।

কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ এ-সব বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। উদ্বাস্তু সমস্যার ক্ষেত্রে দেশের সরকার গণতান্ত্রিক কি স্বৈরাচারী, কে কোথায় গুলি চালাচ্ছে কি কী করছে সে-সবও কি দেখতে হবে একজন কলেজের অধ্যক্ষকে, অধ্যয়নই যাদের একমাত্র তপঃ হওয়া উচিত সেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের? দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সিকেয় তুলে দিয়ে? আদার ব্যাপারী নেবে জাহাজের খবর! অধ্যক্ষ অবাক ব'নে যান আজকালকার ছেলেমেয়েদের কীর্তিকলাপে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আবার হেলেন গোস্বামীর মতো ছেলেমেয়েও তো আছে যারা কলেজ-চৌহদ্দির মধ্যে ছাত্র-ফেডারেশনের চাইতে কলেজের অধ্যক্ষকেই মেনে চলা অধিকতর কর্তব্য ব'লে মনে করে, কলেজ-গেটের মুখে ধর্মঘটী বেষ্টনী যখন জোড়হাতে অনুরোধ জানায়: 'ঢুকবেন না, দয়া ক'রে ঢুকতে চেষ্টা করবেন না—' তখনো যারা ফস্ ক'রে ব'লে বসে: 'যত্তো সব নন্‌সেন্স! ইডিয়টের মতো কেবল স্ট্রাইক করলেই হ'লো—' ধর্মঘটীরা তখন অবিশ্যি তাকে ছেড়ে কথা কয় না।

কিন্তু দশের মুখ চেয়ে সবাই মিলে করলো স্ট্রাইক আর কোতল হ'য়ে যাবে মাঝখান থেকে স্কটিশের আটটি ছেলে— এটা কী ক'রে আর-দশজন মেনে নেয়! পশ্চিম বাংলা ছাত্র-ফেডারেশনের এবার তাই আরো বড়োরকম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত: যদ্দিন পর্যন্ত স্কটিশের অধ্যক্ষ এই শাস্তি প্রত্যাহার না করছেন তদ্দিন পর্যন্ত কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজ ধর্মঘট চালিয়ে যাক। বাইশে জানুআরি থেকে শুরু হবে ধর্মঘট।

আজ সেই ধর্মঘটের দিন। বাইশে জানুআরি আজ।

ভাবনা-চিন্তায় আর উত্তেজনায় সমস্ত রাত কাল ঘুমোতে পারেননি নিত্যপ্রসাদ। কেননা, এটা তো ঠিক যে প্রাণ থাকতে তিনি কোনো-রকম ধর্মঘটকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদ করতে চাও করো, নিত্যপ্রসাদ নিজেও কি কোনোদিন কোনো অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করেছেন! একথা কি কেউ জানে না যে যে-কোনোরকম অন্যায় দেখলেই কী রকম বিষিয়ে ওঠে তাঁর মন, কী যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেন অন্তরের অন্তস্তলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা কী দারুণ ধিক্কারে জ্ব'লে ওঠে— তার পরিচয়-প্রমাণ কেউ কি কোনোদিন পায়নি! কিন্তু কেন যেন, কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মঘট-ব্যাপারটায় নিত্যপ্রসাদ সায় দিতে পারেন না। প্রতিবাদ জানাবার পন্থা ও নয়— বলেন তিনি।

কী করবেন না-করবেন কিছুই তিনি গুছিয়ে ভেবে নিতে পারছেন না মনের মধ্যে। কেমন যেন সব এলোমেলো হ'য়ে গেছে, জট পাকিয়ে গেছে।

কাল আবার ধর্মঘটের মুখে পড়তে হবে, ধর্মঘটীদের বেষ্টনী ভেদ করবার বিবিধ হুড়-হাঙ্গাম ভোগ করতে হবে— এই ভেবেই সমস্তটা রাত বিনিদ্র রইলেন নিত্যপ্রসাদ।

ধর্মঘট তো বলতে গেলে আজকাল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের মধ্যে ক'টা দিন আর শান্তিতে কাটছে! এমনি একটা মামুলি গা-সওয়া ব্যাপার নিয়ে সমস্ত রাত একেবারেই চোখের পাতা এক করতে পারবেন না— নিত্যপ্রসাদের ঘুম পাতলা হ'লেও এত পাতলা তো নয়!

উদ্বেগটা তাই শুধুমাত্র ধর্মঘট নিয়েই নয়। অনাচারে ছেয়ে গেছে দেশ, পাহাড় থেকে পদস্খলিত হ'য়ে গড়াতে-গড়াতে সর্বনাশের অতল গহ্বরে জাহান্নমে চ'লে যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা, গত পাঁচ বছর ধ'রে অনেক-

কিছু দেখে-দেখে এ-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হ'য়ে গেছেন নিত্যপ্রসাদ। ধ্বংস অনিবার্য এবং নিশ্চিত জেনেও স্বাভাবিক নিয়মবাঁধা কাজকর্ম এবং রাতের নিদ্রা তো তাঁর নিশ্চিন্তই ছিলো— কাল হঠাৎ এমন কী অঘটন ঘটলো যে নিত্যপ্রসাদের এমন নির্বিকল্প নিশ্চিন্ততাতেও ফাটল ধরলো!

উন্মেষের কালকের আচরণ নিত্যপ্রসাদের কাছে সত্যিই এমনি আকস্মিক এমনি অপ্রত্যাশিত যে এমনটাই ঘটলো, নিত্যপ্রসাদের ঘুমই হ'লো না রাত্রে।

কিন্তু এমন কী অন্যায় আচরণ বা বিদ্রোহ দেখলেন উন্মেষের যে তিনি এতটা বিচলিত হলেন। তেমন-কিছু গর্হিত প্রতিবাদ কি আচরণ তো দেখা যায়নি উন্মেষের, বাড়াবাড়ির মধ্যে শুধু এই যে, কাল রাত্রে খায়নি সে এবং সে-খবর রেখেছেন নিত্যপ্রসাদ। আর, নিত্যপ্রসাদ এক বিষয়ে হাজার নির্বিকল্প হ'লেও অন্য এক বিষয়ে মনটি তাঁর অত্যন্ত সজাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অত্যন্ত ভীরু। এক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিও সামান্যতম অসংগতিও নিত্যপ্রসাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মুহূর্তে। স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় নিত্যপ্রসাদের; তাঁর অতৃপ্ত কামনা আর বুভুক্ষু পিতৃত্ব উন্মেষকে আশ্রয় করেছে আজ এক যুগ হ'তে চললো; আজ বারো বছর পর্যন্ত তিনি লালনপালন করছেন যে তাঁর অন্তরের অন্তরতমটিকে, সে কি আজ তার ঐ-চোখ ঐ-বিদ্রোহ ঐ-ব্যঙ্গ দেখবার জন্যে!

সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে ওঠা অনেক কালের অভ্যাস নিত্য-প্রসাদের। আবছা ছাই-ছাই অন্ধকারে ঢাকা থাকে তখন সমস্ত পৃথিবী সমস্ত শূন্যমণ্ডল, বাতাস তখন কী ঠাণ্ডা শুদ্ধ শান্ত, নিশ্বাসে আর অনুভূতিতে তখন কী প্রশান্তি আর ব্যাপ্তিই যে লাগে। সুপ্তি থেকে জেগে আস্তে আলগোছে বুক পর্যন্ত ঢাকা লেপটা সরিয়ে দেবেন, উঠে হাত-পা ঝেড়ে আড়মোড়া ভেঙে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াবেন তাঁর ঘরের

সুমুখের ঝুল-বারান্দাটিতে। একটা কুশন-আঁটা বেতের মোড়া পাতা থাকে ওখানে, সেই মোড়ায় ব'সে অপেক্ষা করবেন নিত্যপ্রসাদ ধ্যানমগ্ন চৈতনায় সূর্য উঠা পর্যন্ত; সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে পরে উঠে পড়বেন, তখন শুরু হবে অন্যান্য প্রাতঃকৃত্য— বাঁধাধরা নিয়ম নিত্যপ্রসাদের।

এই বাঁধাধরা নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটলো কাল রাত্রে। বারান্দায় এসে বসবার কথাও ভুলে গেলেন। আর আশ্চর্য, সমস্ত রাত ছটফট ক'রে শেষ রাতের দিকেই বিশ্রি একটা তন্দ্রার ঘোরে অভিভূত হলেন নিত্য-প্রসাদ। পরিশ্রান্ত দেহ-মনে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন বিছানায়। এদিকে সূর্য উঠলো, পুব আকাশ ছাপিয়ে ক্রমশ নিত্যপ্রসাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, আর শেষপর্যন্ত লম্বা তীরের মতো এক ফালি রোদ হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে পর্যন্ত। ওদিকে ঘূর্ণির জন্যেও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিত্যপ্রসাদ দরজা খুলে বেরিয়ে বাথরুমে চ'লে গেলে সেই অবসরে সে তাঁর বিছানা তুলে ফেলবে, ঘরটা ঝাঁটপাট দেবে, টেব্‌লটা এটা-ওটা গুছিয়ে ফেলবে (নিত্যপ্রসাদের ঘরের এ-কাজগুলো যে নীরজা ঝি-চাকরকে না দিয়ে ঘূর্ণির জন্যে বরাদ্দ করেছেন তার একটি কারণ বোধ করি এই যে যে-মানুষটা বিয়ে-থা ক'রে নিজের একটি সংসার তৈরি করলেন না সে-মানুষটিকে এইটুকু বেশি-যত্ন বেশি-পরিচর্যাই দান করা যাক; আর-আর সব ঘরে এ-কাজগুলো তো ঝি-চাকরদের জন্যেই নির্দিষ্ট)। দ্বিতীয়বার এসেও যখন ঘূর্ণি খোলা পেলে না নিত্যপ্রসাদের দরজা তখন একটু ভাবনাই লাগলো তার, সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল তার কালকের গণ্ডগোলটা, উন্মেষের কাল রাত্রে না-খাওয়া। উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে তখন হাজির হ'লো ঘূর্ণি মা-র কাছে। নীরজা তখন ঠাকুরঘরের কাজে ব্যস্ত, নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন। খবর শুনে হাতের কাজ থেমে গেল তাঁর, কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন, শেষে বললেন, 'ছাখ আর-কিছুক্ষণ।

কী যে সব অশান্তি চারদিকে, আর পারিনে। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আর-কিছুক্ষণ দেখে শেষে ডাকিস আমাকে।'

ডাকবার আর দরকার হয়নি, কেননা নিত্যপ্রসাদ খানিক পরেই দরজা খুললেন। একটু বেখাপ্পামতো হ'লেও অন্যান্য কাজকর্মগুলিও হ'তে লাগলো। তাঁর সকালের খাবার এককাপ দুধ এবং দুটি সন্দেশ—তা-ও খেলেন কোনো হাঙ্গামা না ক'রে। অন্যান্য দিন এ-সময়ে তাঁর ঘরে বেশ একটা ভিড় জ'মে উঠতে থাকে— বাড়ির এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢোকে এ-ঘরে। নিত্যপ্রসাদের কাছে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অবাধ প্রশ্রয়, অফুরন্ত আব্দার। প্রশ্রয় না দিয়েও পারেন না, আবার সকাল বেলাকার ঘণ্টাখানেক সময় অন্তত দরকার হয় তাঁর লেখাপড়ার জন্যে, মহা ফাঁপরে পড়েন তিনি। এই উভয়সংকট থেকে তাঁকে রক্ষা করতে আসেন সেই নীরজা-ই, কখনো ঘূর্ণিকেও পাঠান বাচ্চাগুলোকে তাড়া দিয়ে একতলায় পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিতে। আজ কিন্তু ঘূর্ণি গতিক বুঝে ছেলেমেয়েগুলিকে এ-ঘরে একেবারে ঢুকতেই দেয়নি, ঘরের বাইরে থেকেই সবাইকে ঠেকিয়েছে। যতক্ষণ থাকতে হ'লো এ-ঘরে নিজেও সে কাঠ হ'য়ে সন্ত্রস্ত হ'য়েই রইলো এবং অবশেষে নিত্যপ্রসাদের খাওয়া হ'য়ে যেতে নির্বাক নির্বিকারভাবে কাপ-ডিসগুলো তুলে নিয়ে চ'লে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে, একটু বা চমকে ঘুরে দাঁড়ালো— মৃদুস্বরে ডাক দিয়েছেন তাকে নিত্যপ্রসাদ।

গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন নিত্যপ্রসাদ, 'হ্যাঁ রে, উনিশ কোথায়? কী করছে জানিস?'

'পড়ছে।' সঙ্গে-সঙ্গে বললো ঘূর্ণি, যদিও মিনিট পনেরো আগেও সে দেখে এসেছে যে উন্মেষ ঘরের দরজাই খোলেনি এখনো, আর তার মানে, সে ঘুম থেকেই উঠেছে কিনা সন্দেহ।

'পড়ছে ? আচ্ছা যা।'

ফিরলো ঘূর্ণি। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে ফের দাঁড়াতে হ'লো।

নিত্যপ্রসাদ বলছেন, 'আচ্ছা শোন তো রুণি, এক কাজ কর তো, উনিশকে একবার ডেকে দে তো, একটা কথা মনে পড়লো—'

একটা উত্তাল হাসির ঢেউ ফেনিয়ে উঠলো, আর ঘূর্ণি প্রাণপণে সেই হাস্যহীন হাসি চাপবার চেষ্টা করতে-করতে এসে হাজির হ'লো উন্মেষের ঘরে। উন্মেষ ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে চেয়ার ঠেসে ব'সে আছে টেব্‌লের ওপর পা তুলে দিয়ে। চঞ্চল ত্বরিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেব্‌লটার ওপর একেবারে চেপে ব'সে পড়লো ঘূর্ণি পা ঝুলিয়ে, উন্মেষের পায়ের পাতায় একটা খোশামুদে চিমটি কেটে অতি ভালোমানুষের মতো বললে, 'জ্যাঠামণি তোমাকে ডাকছেন উনিশদা।'

উন্মেষের ঘুম-জড়ানো রক্তিম দুটি চোখ তির্যকভাবে গিয়ে পড়লো ঘূর্ণির দিকে।

ও, এখনো রাগ পড়েনি তাহ'লে ? মনে-মনে আরো ভড়কালো ঘূর্ণি, গলায় আরো-একটু নিবিড়তা সঞ্চার ক'রে বললে, 'ঈশ্‌, কী কাণ্ডটাই না করলে কাল, বকুনি খেয়ে ছেলেমানুষের মতো ভাতের ওপর রাগ—'

'থাম্‌ থাম্‌, যথেষ্ট হয়েছে।' কটু গলায় ঝেঁজে ওঠে উন্মেষ। হঠাৎ উঠে প'ড়ে হন্‌হন্‌ ক'রে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আর সোজা গিয়ে ঢোকে নিত্যপ্রসাদের ঘরে।

উন্মেষের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলেন নিত্যপ্রসাদ। 'এ কী রে, এরকম লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা করেছিস কেন, অ্যাঁ ?' —অন্যদিন হ'লে ঠিক জিগ্যেস করতেন নিত্যপ্রসাদ, কিন্তু আজ এ-সময় কেন যেন এমন কথা বলতে তাঁর বাধলো। কয়েক মুহূর্ত উন্মেষের মুখের দিকে হতভম্ব চেয়ে থেকে শেষে বললেন, 'হ্যাঁ রে উনিশ, আমার ঠিক

মনে পড়ছে না— বসওয়েলের ওপর নোট কি সেদিন কম্‌প্লিট করতে পেরেছিলাম ?'

কী বিশ্রিভাবে তাকিয়ে থাকে উনিশ ! অস্বস্তি লাগে নিত্যপ্রসাদের। উঠে পড়লেন ইজিচেয়ারটা থেকে হঠাৎ, আস্তে-ব্যস্তে গেলেন ঘোরানো বুক-শেলফটার কাছে, কী-একটা বই খুঁজলেন কতক্ষণ এলোপাথারি, শেষে মাঝখান থেকে আঙুলের টানে যে-বইখানা বেরিয়ে এলো সেইখানাই টেনে নিয়ে ফিরে এলেন ইজিচেয়ারে, এবং দ্বিগুণ চিন্তিত চোখেমুখে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কী রে, তোরও মনে পড়ছে না ?'

'বসওয়েল শেষ হয়নি সেদিন।' অবশেষে বললো উন্মেষ নির্বিকল্প শাদা গলায়।

'শেষ হয়নি, না ? আমারও তাই মনে হচ্ছিলো। আজকে ওটা শেষ ক'রে ফেলতেই হবে। ঈশ্, এখনো কত-কিছু বাকি আছে রে, এখনো বসওয়েলই শেষ হ'লো না—' অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে স্বগতোক্তি করলেন নিত্যপ্রসাদ, 'এত হাঙ্গামার মধ্যে কি আর পড়াশুনো হয়, কী সর্বনাশই যে লাগলো চারদিকে—' উন্মেষের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'আচ্ছা যা তাহ'লে। হ্যাঁ ভালো কথা, আমার ক্লাস যেন আজ ক'টায় ?'

ক্লাস ক'টায় ! হাসি পায় উন্মেষের। যেন তাঁকেও ব'লে দেবার মনে করিয়ে দেবার দরকার হ'তে পারে যে আজকে বা কোনদিন কবে ক'টায়-ক'টায় তাঁর ক্লাস। এ-প্রশ্নের তাৎপর্য সে পরিষ্কার বুঝলো আর তার উত্তরে 'আজ তো প্রথম পীরিয়ডেই আপনার ক্লাস—' একথা না ব'লে নিত্যপ্রসাদের উহ্য প্রশ্নটার অবতারণা সে নিজেই করলো এবার, বললে, 'আজ কি ক্লাস হ'তে পারবে, স্ট্রাইক—'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন নিত্যপ্রসাদ। একেবারে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন অস্থির গলায়, 'আমিও তো তাই বলছি, স্ট্রাইকের ঝামেলা আছে আজ,

চল, আজকে একটু তাড়াতাড়ি চল, একা-একা চ'লে যাসনে যেন আবার। আজ একসঙ্গে যাবো, না না, একটু সাবধান হওয়া ভালো, যা যা, তুই কি এখনো মুখটুখ ধুসনি নাকি অ্যাঁ, কী রে, যা, যা চানটান ক'রে আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নে— আঃ গোল্লায় যাবে দেশটা, গোল্লায় যাবে।' উত্তেজিত হ'য়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করলেন নিত্যপ্রসাদ।

উন্মেষ বেরিয়ে গেছে ততক্ষণে ঘর থেকে।

কী করবেন না-করবেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না নিত্যপ্রসাদ। উনিশ সম্বন্ধে না-হয় তবু কতকটা নিশ্চিন্দি, তিনি স্বয়ং তার কাছে-কাছে থাকবেন, কিন্তু আর-আর ছেলেমেয়েগুলো? কে সামলাবে তাদের? এই সর্বনাশা গোলমালের মুখে কচি-কচি ছেলেমেয়েগুলোকে একা-একা ছেড়ে দেয়া যায় কখনো। অথচ কে-ই বা এখন আগলায় এতগুলো ছেলেমেয়েকে। ওদের বাবাদের যেন এ-সম্বন্ধে কোনো দায়-দায়িত্বই নেই, আশ্চর্য! একজন আছেন রুগী আর জপ-তপ-হরিনাম নিয়ে; আর-একজন রেল আর ঘোড়ারোগ নিয়ে। ব্যস্, মিটে গেল— অসহ্য বিরক্তিতে রগের শিরা দুটো তাঁর দপ্‌দপ্ করতে লাগলো। অদ্ভুত, অদ্ভুত এই সংসারের মানুষগুলি! কেনই বা এরা বিয়ে করে মরতে, আর কেনই বা এরা মানুষ হ'য়ে জন্মেছে সংসারে!

ঢং ক'রে একটা শব্দ হ'লো দেয়াল-ঘড়িটায়। চমকে উঠলেন নিত্যপ্রসাদ। সাড়ে সাতটা। সাড়ে সাতটা, দাদা তাহ'লে এখনো বেরোননি বোধ হয় ডিসপেনসরিতে, ঘরেই পাওয়া যাবে। ত্বরিত পায়ে চললেন নিত্যপ্রসাদ দোতলায় শিবপ্রসাদের ঘরে।

কিন্তু বেশি দূর যেতে হ'লো না। সিঁড়ির মুখেই পাওয়া গেল তাঁকে। স্নাত, ঈষৎ সিক্ত দেহ, ধপধপে ফিনফিনে শাদাপাড় ধুতির আঁচলাটি গলায় পেঁচিয়ে বুকের ওপর ঝোলানো, খড়ম-পায়ে খট-খট

খটাখট করতে-করতে, অনতিউচ্চ অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে উঠে আসছেন শিবপ্রসাদ তেতলায়, ঠাকুরঘরে ঠাকুরের চরণামৃত নেবেন, প্রণাম করবেন। মেদস্ফীত ঢলঢলে অভিজাত চেহারা শিবপ্রসাদের, ঝকঝকে উজ্জ্বল কাঁচাহলুদের মতো গায়ের রঙ। প্রশস্ত টাকে, সুঠাম পেশল পিঠে, অনতিপুষ্ট ভুঁড়িতে টোপা-টোপা জল মুক্তাবিন্দুর মতো টলটল করছে। নিত্যপ্রসাদ গতিরোধ করলেন শিবপ্রসাদের, গম্ভীরমুখে তাকিয়ে রইলেন শিবপ্রসাদের দিকে।

ধর্মের পথে কত বিঘ্ন! অনিবার্য একটা বিরক্তির রেখা শিবপ্রসাদের মুখে ফুটে উঠে আবার সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়েও গেল। মিলিয়ে গেল এইজন্যেই যে বিঘ্নের কারণ হয়েছেন এক্ষেত্রে আর কেউ না—নিত্যপ্রসাদ। কিন্তু নিত্যপ্রসাদের সমস্ত মুখে যে রাজ্যের বিরক্তি এসে জমা হ'লো তার একটি রেখাও অদৃশ্য হ'লো না। নিত্যপ্রসাদ বললেন, 'একটা কথা শোনার সময় হবে?'

হাঁ-না কিছুই বললেন না শিবপ্রসাদ। নাম-কীর্তন তো তাঁর শেষ হয়নি এখনো, এখন এই অর্ধপথে কি ক'রে তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসতে পারেন। নিত্যপ্রসাদ এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই কণ্ঠ তাঁর স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু অভ্যাসবশে ঠোঁট দুটি নড়ছেই, অর্থাৎ এখন তিনি মনে-মনে নীরব উচ্চারণে নাম-কীর্তন করছেন। তদ্গতচিত্ত ঢুলুঢুলু-নয়ন হ'য়ে রইলেন শিবপ্রসাদ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত অবাক রইলেন নিত্যপ্রসাদ আর শেষে অসহ্য বিরক্তিতে পথ ছেড়ে দিলেন, স'রে দাঁড়ালেন একটু।

একটুও অপ্রতিভ দেখালো না শিবপ্রসাদকে, বেশ নির্বিকারভাবেই এগিয়ে চ'লে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে।

এবার নিত্যপ্রসাদ আদিত্যপ্রসাদের কথা ভাবলেন। আদিত্যপ্রসাদের ঘরগুলিও দোতলাতেই। সিঁড়ি ভেঙে চটি ফটফট করতে-করতে গিয়ে হাজির হলেন তিনি আদিত্যপ্রসাদের শোবার ঘরের দরজায়। শোবার ঘরের দরজায় এইজন্যে যে, তাঁর ধারণা আদি এখনো ঘুম থেকেই ওঠেনি; কিন্তু তার ঘুম না ভাঙলেও দেশময় এই মারামারি কাটাকাটি তো কিছু থেমে থাকছে না, আজকের গণ্ডগোলে আবার ক'টা খুনজখম হবে কে জানে— হে ভগবান, হে ভগবান! নাস্তিক নিত্যপ্রসাদ ভয়ে ভাবনায় ভগবান-নাম জপতে-জপতে এসে দাঁড়ালেন আদিত্যপ্রসাদের শোবার ঘরের দরজায়। এক-মুহূর্ত থমকে থেকে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

নিত্যপ্রসাদের চটির শব্দ এ-বাড়িতে কে না চেনে— হঠাৎ শব্দটা কানে আসতেই চমক লাগলো আদিত্যপ্রসাদের, চমকটা এতই বেশি যে ধড়মড় ক'রে উঠেই বসলেন একেবারে। নিত্যপ্রসাদের এ-ঘরে আসাটা অপ্রত্যাশিত সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ এসে হাজির হবেন তিনি, এইটেই আদিত্যপ্রসাদের কাছে অস্বাভাবিক লাগলো। ঘুম ভেঙেছে তাঁর আজ সাত-সকালে, গতকাল রাত্রে নাইট-ক্লাবে যাওয়াটা হ'য়ে ওঠেনি তাঁর, সন্ধের সময় তৈরি হ'য়ে বেরুবেন এমন সময় এসে হাজির ধরমতলার এক 'পার্টি', বেশ শাঁসালো এক চামড়ার মহাজন। রেলের ক্লেম্‌স্‌ সেকশনের অফিসার আদিত্যপ্রসাদ— মহাজনদের নেকনজরটা বেশ-একটু ভালোই আছে তাঁর ওপর। মেওয়ার গন্ধ পেয়ে নাইট-ক্লাবের কথাও ভুলতে পেরেছিলেন তিনি কাল সন্ধ্যায়। বহুৎ-বহুৎ সুক্রিয়া জানিয়ে উঠতে-উঠতে দিলওয়ার খাঁ আটটা বাজিয়ে দিয়েছিলো, একটা রাত তাই আদিত্যপ্রসাদকে তাস দাবা বা বিলিয়ার্ড না-খেলেই কাটাতে হয়েছিলো কাল।

নিত্যপ্রসাদ খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্বভাবতই তিনি একটু গম্ভীর, সেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে অসহনীয় এক অস্বস্তি আর চাপা-খিটখিটে বিরক্তি মিশে মুখের যা চেহারা হয়েছে তাঁর— দেখে আদিত্যপ্রসাদ প্রমাদ গুনলেন।

'কী হয়েছে? বোসো না—' খাড়া হ'য়ে বসলেন আদিত্যপ্রসাদ।

শক্ত হ'য়ে খুঁটির মতো দাঁড়িয়েই রইলেন নিত্যপ্রসাদ, বললেন তিক্ত গলায়, 'আজ সমস্ত স্কুল-কলেজে স্ট্রাইক, জানো সে-কথা?'

'স্ট্রাইক? কেন?' আরো তটস্থ হলেন আদিত্যপ্রসাদ নিত্যপ্রসাদের রকম দেখে, বড়ো বেশি উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা দেখিয়ে আরো এগিয়ে এসে পা-দুটো ঝুলিয়ে দিলেন খাট থেকে।

'কেন আবার কী! স্ট্রাইক-ফ্রাইক যারা ক'রে বেড়ায় তাদের কি কোনো 'কেন' লাগে! করলেই হ'লো!'

'কী ব্যাপারে করাচ্ছে স্ট্রাইকটা? অফিস-টফিসও নাববে না তো আবার? না অবিশ্যি অফিস—'

'এই গণ্ডগোলের মধ্যে ছেলেপিলেদের তো আর একা-একা ছেড়ে দেয়া যায় না, কী করা যায় বলো—'

'ছেড়ে দেবার দরকার কি, যেতে বারণ ক'রে দিলেই হ'লো ওদের।'

যাওয়া বারণ? এটা তো একেবারেই খেয়াল হয়নি তাঁর। যাওয়াই বারণ ক'রে দিলে অবিশ্যি আপদ-বিপদটা নির্ঝঞ্ঝাটেই এড়ানো যায়, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এ-ধর্মঘটে পরোক্ষ সমর্থন বা সাহায্য করা হ'য়ে যাবে না?

হয় হোক! গোল্লায় যাক নীতিধর্ম আদর্শবাদ! আর পারেন না নিত্যপ্রসাদ এমনি ক'রে দুর্ভাবনার জালে জড়িয়ে যেতে।

বিতৃষ্ণার একটি মুদ্রা ফুটলো নিত্যপ্রসাদের বাঁ-হাতের আঙুলে, ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বিড়বিড় ক'রে কী বলতে লাগলেন তার

বিন্দুবিসর্গও বোধগম্য হ'লো না আদিত্যপ্রসাদের। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে রইলো তাঁর।

ঘূর্ণি পর্যন্ত সকলের স্কুল-কলেজ যাওয়া আজ বারণ হ'য়ে গেল। কলেজের পড়ুয়া এক ঘূর্ণিই, বেথুনে ফোর্থ ইয়ার আর্টস, আর সব স্কুলের।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এবং উন্মেষের সম্বন্ধে মত বদলালেন না নিত্য-প্রসাদ। অতটা সহ্য হবে না তাঁর। ঘূর্ণিকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন উন্মেষকে, সে যেন ন'টার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে তৈরি হ'য়ে নেয়, ন'টার সময়েই আজ বেরুতে চান তিনি। সাবধানের মার নেই।

কিন্তু দেখা গেল ধর্মঘটীরা নিত্যপ্রসাদের চাইতেও বেশি সতর্ক। প্রতিটি স্কুল-কলেজের গেটে-গেটে তারা আটটারও আগে এসে জমাট বেঁধেছে।

আর তার চাইতেও বেশি সতর্ক গভর্মেণ্ট। ঝাঁকে-ঝাঁকে মিলিটারি আর পুলিশ ভারী-ভারী জঙ্গী ট্রাকে বোঝাই হ'য়ে এসে কাক-ভোর থেকেই মহানগরীর সর্বত্র মোতায়েন হ'য়ে গেছে।

অর্থাৎ কিনা প্রচণ্ড একটি যুদ্ধের নিখুঁত একটি ভূমিকা ন'টা বাজবার অনেক আগেই সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয় পক্ষের প্রস্তুতি-পর্ব নিষ্পন্ন হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দশটা এখনো বাজেনি ব'লেই, শেষপর্যন্ত ঘণ্টা দেড়েক সময় দু-পক্ষের মধ্যে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ালো ব'লেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে গোলদিঘির পাড়ের লোকেরা স্টেনগান রাইফেল-টাইফেলগুলি থেকে হাত নামিয়ে হাতের দস্তানা আবার খুলে ফেললো, আর সেনেটের পাড়ের লোকেরা হাতের ঢিল পকেটে রাখলো।

এরাও মানুষ ওরাও মানুষ। সেই মানুষে মানুষেই একটা যুদ্ধ হবে, একটু খুনোখুনি হবে। ঐ মানুষগুলোই যখন দিনের শেষে তাদের খাঁকি কোর্তাকুর্তিগুলি খুলে ফেলে শাদা মানুষ হ'য়ে বাসে চেপে লেকে হাওয়া খেতে যাবে তখন এই মানুষগুলিই ওদের বলবে, 'দাদা দেশলাইটা একবার দেবেন?'

তবু এ ওর বুকে গুলি ছুঁড়বে, ও এর মাথা সই ক'রে ঢিল ছুঁড়বে। ওরা ঢিল ছুঁড়বে ওদের নীতি-আদর্শ কায়েম করতে, সম্মান-স্বাধীনতা আদায় ক'রে নিতে; আর এরা সেটা বানচাল ক'রে দেবার জন্যে গোলাবারুদের মুখে ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। অমন অমানুষিক কাজ কেন এরা করবে? করবে ওপরওয়ালার রক্তচক্ষুর নির্দেশে, হুকুমে, করবে পেটের দায়ে।

ট্রাম-বাস ভর্তি হ'য়ে উঠতে-উঠতে ন'টায় লাগলো জোয়ার। জোয়ারের মুখ লালদিঘির দশ দিকে। সেই জোয়ারের তোড়ে ট্রামবাস-বাহিত হ'য়ে ভেসে যেতে-যেতে যারা প্রৌঢ়, যাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বুক-মুখ ভয়ে-ভাবনায় গেল শুকিয়ে; যারা তরুণ যুবক তারা যৌবনের উত্তেজনায় তারুণ্যের তাপে উল্লাসে চিৎকার ক'রে বাহবা দিয়ে যেতে লাগলো সেনেটের পাড়ের যুযুধানদের, টিটকিরি দিতে লাগলো গোলদিঘির পাড়ের হেলমেটগুলোকে।

ঝির্‌ঝির্ ক'রে হাওয়া দিচ্ছিলো সকাল থেকেই। হঠাৎ কখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে সে-হাওয়া। কবোষ্ণ রৌদ্র অলস-আবেশবশে আঁচল ছড়িয়ে যেন বসেছিলো, মানুষের রক্তচক্ষুর অগ্ন্যুৎপাতে পুড়ে গেল সে-আলস্য, গনগনে হ'য়ে উঠলো সমস্ত পরিমণ্ডল।

সাড়ে ন'টা বাজলো। মির্জাপুরের ওপর আই. এন. এ. সি., আর. ডব্লিউ. এ. সি.-র গাড়িগুলো এসে সারি-সারি দাঁড়িয়ে গেল। দু-একজন

অসমসাহসিক খবরের কাগজের রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে এখানে-ওখানে হান্না দিতে লাগলো। কলুটোলার ওদিক থেকে কতগুলো প্রেতচক্ষু মানুষ ভিড় ক'রে কেমন ক'রে চলে এসে সেনেটের পাড়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ডুবে রইলো, তাদের দু-হাত পকেটে ঢোকানো, তাদের দু-চোখে সুর্মা, তাদের দু-কান ঝাঁকড়া বাবরি চুলে ঢাকা। আর তাদের জন্যে কতকগুলি সাইকেল অদূরেই অপেক্ষা করতে লাগলো। ছেলেমেয়েরা কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই লক্ষ্য করতে পারলো না, আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের উত্তেজনায় তারা তখন এতই দিশেহারা।

পৌনে দশটা বাজলো। বাসওয়ালারা তাদের বাঁধা পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলো। বাঁধা পথ ছাড়লে কোন পথে যেতে হবে তা-ও তাদের বাঁধা-ই। ট্রামের কণ্ডাক্টর ড্রাইভারেরা যে যেখানে ছিলো সেখানেই ট্রাম থামিয়ে নেমে এলো। হাসপাতালে ডাক্তারেরা তৈরি হ'তে লাগলেন, কতকগুলো বেড-ও খালি করিয়ে নিতে লাগলেন।

ধর্মযুদ্ধ কি একেই বলা হ'তো ত্রেতা-দ্বাপরে? এই ঘোর কলিতেও তবে মানুষ ধর্মযুদ্ধের সংস্কার ভোলেনি!

উল্লাস নয়— চিৎকার, যুদ্ধের চিৎকার, ওয়ার-ক্রাই, মারণ-চিৎকার আর মরণ-যন্ত্রণা আকাশে উঠবে দশটায়!

টেনে-হিঁচড়ে উন্মেষকে নিয়ে বেরুতে-বেরুতে নিত্যপ্রসাদের সাড়ে ন'টা বেজে গেল। কালো অস্টিনটা দাঁড়িয়ে ছিলো গেটে, বাড়ির মেয়েদের কাকুতিমিনতি আপত্তি চোখের জল তুচ্ছ ক'রে উন্মেষকে নিয়ে স্টার্ট নিলো যখন তখন ন'টা বেজে পঁয়ত্রিশ।

কিন্তু কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মুখে ঠেকে গেল নিত্যপ্রসাদের গাড়ি। বিবেকানন্দ রোডের পর থেকেই ধর্মতলা ড্যালহাউসিমুখী ট্রামগুলো

নিশ্চল জনপ্রাণীশূন্য দাঁড়িয়ে আছে একটার-পর-একটা। রাস্তার ওপর এখানে-সেখানে চাক-চাক জটলা জল্পনা-কল্পনা আর আলোড়ন-উত্তেজনা। হৈ-হল্লা হুড়হাড় দুপদাপ শব্দে থমকানো হাওয়া নাড়া খেয়ে উঠছে থেকে-থেকে। রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলোর জানালা-বারান্দা চাতালে রোয়াকে আর তিল-পরিমাণ ফাঁক নেই। এরই মধ্যে ভিড় কাটিয়ে-কাটিয়ে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত যদি বা এগোনো সম্ভব হ'লো, তারপরে গাড়ি আর চললো না নিত্যপ্রসাদের।

অগত্যা নেমে পড়তে হ'লো এবার গাড়ি থেকে। পিছু-পিছু উন্মেষও নেমে আসে, লজ্জায় ঘেন্নায় মুখখানা তার পাথর ব'নে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে এসে ডান-দিকের ফুটপাথে উঠতেই ফস্ ক'রে এক-দল ছেলেমেয়ে এসে আচমকা ঘিরে ফেললে নিত্যপ্রসাদকে।

ঐভাবে ঘেরাও হ'য়ে যাওয়াটা নিত্যপ্রসাদের জীবনে আজকে আর অভাবিত-অনাস্বাদিত কিছু নয়। বরং এ-জাতীয় ব্যাপারটা ইদানীং একটু ঘন-ঘনই ঘ'টে যাচ্ছে। দেশময় অন্যায় অত্যাচার পাপা[illegible]রের ন্যাকড়ায় আগুন লেগে গেছে, আর ন্যাকড়ার আগুন তো— [illegible]কধিকি জ্বলছেই, থেকে-থেকে জ্ব'লে উঠছে দাউদাউ ক'রে, আর এই প্রলয়ঙ্কর খাণ্ডবদাহনের মধ্যে থেকে নিজের ধ্যান-ধারণা নীতি-আদর্শকে রক্ষা করতে গেলে ঐ-আগুনের ঝাপ্টা যে তাঁকেও রেহাই দেবে না— এটা নিত্যপ্রসাদ মেনেই নিয়েছেন।

কিন্তু তবু, আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটলো তাঁর। হঠাৎ এভাবে ঘেরাও হ'য়ে গিয়ে তাঁর স্বাভাবিক রাশভারি ব্যক্তিত্বটা যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেল, চোখমুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল হঠাৎ, মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর ফ্যাকাশে হ'য়ে যাওয়া সমস্ত মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটলো, অসহায়তা আর ত্রস্ত উত্তেজনা বৃথাই

সামলাবার চেষ্টা করলেন, ব'লে উঠলেন চিড়বিড় ক'রে, 'কী, কী, মারবে নাকি অ্যাঁ, ভেবেছো কী—'

ছেলেমেয়েগুলি চড়াও হয়েছে তাঁর ওপর, চড়াও হয়েছে তাঁকে মারবার জন্যেই— ব্যাপারটাকে নিত্যপ্রসাদ এভাবে না নিয়ে যদি সহজভাবে নিতে পারতেন তো ছেলেদের মাথায় হয়তো নিত্যপ্রসাদের গায়ে হাত তোলার কথা আসতেই পারতো না; কিন্তু নিত্যপ্রসাদ ছেলেদের এভাবে তাঁকে ছেঁকে ধরার ব্যাপারটাকে গুণ্ডামি ভাবলেন, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনায় ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এইভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। ছেলেমেয়েগুলিও তাই খেপে উঠলো অসভ্যের মতোই, যে যেমন খুশি টিপ্পনী কেটে উঠলো একসঙ্গে, 'অত তড়পাবেন না স্যর, চিচিং ফাঁক ক'রে দেবো একেবারে!'

'বেশি ফ্যাচফ্যাচ করলে একেবারে আড়ং ধোলাই হ'য়ে যাবে স্যর!'

'পণ্ডিতে শেখে দেইখ্যা আর মূর্খে শেখে ঠেইক্যা! আপনে কোনটা হইতে ইচ্ছা করেন স্যর!' —ইত্যাদি মন্তব্যের একেবারে শিলাবৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেল।

নিত্যপ্রসাদও রুখে উঠলেন। কিন্তু ক্লাসে দেড়শো-দুশো ছেলেমেয়ের সামনে অধ্যাপনারত নিত্যপ্রসাদ প্রসন্ন মেজাজে ইংরেজি সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করতে-করতে ছেলেদের কোনোরকম বেয়াড়াপনা দেখলে প্রচণ্ড মেজাজে যেমন ক'রে রুখে ওঠেন, সেই রুখে-ওঠার মধ্যে যে অমোঘ ব্যক্তিত্ব স্বপ্রকাশ হ'য়ে ওঠে, তার ছিটেফোঁটাও নেই এখনকার নিত্যপ্রসাদের মধ্যে।

ইতিমধ্যে উন্মেষ আরেক কাণ্ড ক'রে বসলো।

কাল রাতের সেই ব্যাপার থেকে উন্মেষের মানসিক অবস্থা

একেবারেই স্বাভাবিক ছিলো না। বিশেষত মেজোমামা নিত্যপ্রসাদ তো একরাত্রের মধ্যেই তার কাছে নিকটতম সুহৃদ থেকে একেবারে কঠিনতম শত্রুতে গিয়ে ঠেকেছেন। তার ওপর আবার এতগুলো ছেলে-মেয়ের সামনে অপদস্থ হ'তে এইভাবে টেনেহিঁচড়ে তাকে নিয়ে আসা,— সহের শেষ প্রান্তে পৌঁছে উন্মেষের মনটা হঠাৎ দম বন্ধ হ'য়ে যাওয়া ঘড়ির মতোই প্রায় বিকল হ'য়ে গিয়েছিলো। অনেকটা যেন নির্বোধ চেতনাতেই থমকে ছিলো তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি। হঠাৎ নিত্যপ্রসাদকে নিয়ে এই হল্লাটা শুরু হ'য়ে যেতেই তার জড়তা কেটে গেল, খানিকক্ষণ ভয়ে-ভাবনায় আড়ষ্ট হ'য়ে থেকে শেষে ছুটে চ'লে এলো একেবারে সেনেট-হলটার সিঁড়ির কাছে। ছেলেমেয়েতে ঠাসা জায়গাটা। তার মধ্য থেকে হঠাৎ একটি ছেলে, অরবিন্দ মৈত্র, উন্মেষের সতীর্থ এবং ছাত্র-আন্দোলনের একটি পাণ্ডা, পাশ থেকে উন্মেষের হাতটা ধ'রে ফেললে, 'আরে উন্মেষ যে, কী ব্যাপার—'

উন্মেষ নিজেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করলে না, কিন্তু কথা যখন সে বললে, দেখা গেল গলাটা তার উত্তেজনায় কেঁপে গেল একটু : 'কতকগুলো ছেলে ওদিকে পাকড়েছে মেজোমামাকে···মারবে ব'লে শাসাচ্ছে—'

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলো অরবিন্দ নিত্যপ্রসাদের উদ্ধারে। আরো পাঁচ-সাতটি ছেলেও অরবিন্দকে অনুসরণ করলো পলকের মধ্যে।

ওদিকে আরো কয়েক গাড়ি সশস্ত্র সামরিক ফৌজ এসে গেছে। সমস্ত রাস্তা পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। পুলিশের দুটো ওয়্যার্লেস ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে দু-দিকে, গলদঘর্ম অপারেটররা যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখছে লালবাজারকে। আর তার মধ্যে আবার আরবী ঘোড়ার মদমত্ত ঠক্কর-মারা খুরের শব্দও ভাসলো বাতাসে।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কালো-কালো কয়েকটা বন্দী-গাড়িও এসে দাঁড়ালো একপাশে নিঃশব্দ-সঞ্চারে। হ্যাঁ, এতক্ষণে রাজশক্তি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রাজদ্রোহীরাও প্রস্তুত। জান কবুল করতে পারা তাদের ধ্রুব সংকল্প-রক্ষায়, তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, এইটেই আজ মহত্তম প্রস্তুতি! একটি প্রাণীও এখনো ঢুকতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের বেষ্টনী ভেঙে।

অরবিন্দ দৌড়ে চ'লে গেলেও উন্মেষ কিন্তু ঐখানেই নিশ্চল হ'য়ে রইলো।

চমক ভাঙলো তার হঠাৎ একটি মেয়ের ডাকে। একটু দূরে, ভিড়ের মধ্যেই একটু আলগা থেকে কয়েকটি মেয়ে একটি জটলা পাকিয়েছে, তার মধ্যে থেকেই সুতপার নজর পড়েছে উন্মেষের দিকে। সুতপা ডাকলো, 'উন্মেষবাবু—'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল উন্মেষ ওদের দিকে।

'ঠেকে, না কায়মনোবাক্যে?' ভ্রূভঙ্গি-সহকারে বললে সুতপা।

একথার অর্থ, তুমি যে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা না ক'রে বাইরে দাঁড়িয়ে আছো এতে প্রমাণ হচ্ছে যে তুমিও স্ট্রাইকে আছো, কিন্তু সেটা ঠেকে না স্বেচ্ছায়? উন্মেষের চোখ-মুখ আরো শক্ত হ'লো। কথা বললে না।

'আপনার মেজোমামা আসেননি উন্মেষবাবু?' প্রশ্ন করলো বিনতা মুখোপাধ্যায়।

'এসেছেন—'

'কোথায় তিনি? তিনিও কি আজ স্ট্রাইকে জয়েন করবেন!' আধা-কৌতুক আধা-বিস্ময় সুতপার গলায়।

উর্মিলা সেন ফস্ ক'রে হেসে ফেললে।

উন্মেষ মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'আরে কী মুশকিল, রাগ করছেন কেন!' চারদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা, কিন্তু এর মধ্যেও সুতপার পরিহাসপ্রিয়তা অকুণ্ঠিত।

চারদিকের এই হৈহৈ উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির বিদিশা চক্রবর্তী। এলো সে যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার মতো। বিদিশা এদের সতীর্থা নয়— এরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। বিদিশার সঙ্গে পরিচয় শুধু বিনতা আর উর্মিলার, পরিচয়টা অবিশ্যি খুবই নিবিড়। প্রতিবেশী হিসেবে প্রথম আলাপ হয় বিদিশার উর্মিলার সঙ্গে, শেষে বিনতার সঙ্গেও। একহারা ছিপছিপে কালো মেয়ে বিদিশা। মুখের গড়নটি ভারী মিষ্টি। আধময়লা শাদা একটা মিলের শাড়ি আঁটোসাটো ক'রে পরা। ঢাকার মেয়ে, কথাবার্তায় সেটা স্পষ্টই সে ঘোষণা করতে চেষ্টা করে। বৃত্তি পেয়ে পাস করেছিলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, এখন প্রেসিডেন্সিতে বি. এ. পড়ছে, কিন্তু অতিমাত্রায় রাজনীতি করে, স্ট্রাইক করে, বক্তৃতা দেয়— ইত্যাকার অপরাধে বিশেষ শাস্তিবলে তার বৃত্তি পাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। আজকের স্ট্রাইকেও তার সক্রিয় ভূমিকা। একে-ওকে ঠেলে এসে দাঁড়ালো সে বিনতার মুখোমুখি। এসেই উর্মিলার একটা হাত আর বিনতার একটা হাত টেনে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে চাপা গলায় বললে, 'বিনিদি ভাই, দেখছো এদের কাণ্ডটা, এইবার ট্যাঙ্ক মেশিনগান আনলেই ষোলো কলা পূর্ণ! গণতন্ত্র, গণতন্ত্র! মরুকগা যাউক, শোনো অখনে তোমাদের যা বলতে আসলাম— তোমাদের হুঁশটুশ তো আবার একটু বাহাইরা! একটু সাবধানে থাইকো, আইজ ভয়ানক গুলিগোলা চলবো মনে হইত্যেছে, তোমাগো থাইকা আর দরকারটা কী, যাওগা না—'

'আর তুই?' উর্মিলা হেসে উঠে বললে, 'তোর বুঝি গুলিগোলায় কিছু হবার না? ঢাকার মেয়ে তাই?'

'হ হ তাই। একশোবার তাই। কী বা জানলা গুলিগোলা খুনা-খুন্নির— মরুকগা যাউক, শোনো অখনে যা কইতে লইছি—'

'থাক হয়েছে, আর-কিছু কইতে লইও না।' ধমকেই উঠলো বিনতা, 'ফাজিল মেয়ে, নিজে উড়নচণ্ডী হ'য়ে গুলিগোলার মুখে উড়ে বেড়াচ্ছেন আর আমাদের এসেছেন সাবধান করতে!'

'আরে আমি তো সাবধান আছিয়ই—'

বিনতা মারবার ভঙ্গিতে হাত তুলতেই থেমে গেল বিদিশা, তাড়াতাড়ি বিনতার হাতটা ধ'রে ফেলে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, থাইকো না সাবধান, মিট্টা গেল। কিন্তু অখনে তোমাদের এইখানেই অধিষ্ঠান করোনের দরকারটা কী আছে তো দেখি না কিছু— ওদিকটায় সইরা গিয়া দাড়াইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইব নাকি, তেমন-তুমন বুঝলে হ্যারিসন রোড দিয়া পালাইতে পারবা—'

'মন্দ নয় ভাই, তাই চল।' বিনতাকে ভীরু গলায় বললে উর্মিলা। চারদিকের এই আগ্নেয়-সজ্জার মধ্যে উর্মিলার বুকের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ধ'রে যেন হাতুড়ি পিটছে কেবল, তবু যে সে আছে এর মধ্যে, তবু যে সে হেসে উঠছে মাঝে-মাঝে, সে কেবল বিনতার উপরে তার অস্বাভাবিক একটা নির্ভরতা আছে ব'লেই। আর সব-কথায় হাসিটা তো তার স্বভাব।

'আমি ভাই পালাই, আর না···পুলিশগুলো কেমন কটমট ক'রে তাকাচ্ছে দ্যাখো না, এবার স'রে পড়াই উচিত, তোমাদের বাপু সাধ থাকে তো শহীদ হও!' বলতে-বলতে সুতপা হঠাৎ একা-একাই ছুটলো প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বিনতারাও পায়ে-পায়ে এগুতে লাগলো। বিদিশা বিনতার একটা হাত বাগিয়ে ধ'রে উত্তেজনার তাপে টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো।

এমনি সময় হঠাৎ চোখে পড়লো ওদের, হাঁপাতে-হাঁপাতে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কাকে যেন খুঁজতে-খুঁজতে নিত্যপ্রসাদ এদিকে আসছেন।

নিত্যপ্রসাদ খুঁজছেন যে উন্মেষকে সেটা বিনতাদের জানা। হয়তো বিনতা উন্মেষকে ডেকে যোগাযোগটা করিয়েও দিতো। কিন্তু হঠাৎ এই সময় উত্তেজনাটা তাদের চোখের সামনেই কেমন চ'ড়ে গেল, প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের দিকটায় ভয়ানক একটা হল্লার শব্দ উঠলো।

ভয় পেয়ে ঊর্মিলা পেছনে হ'টে এলো দু-পা। বিনতা বিদিশাকেও দু-হাতে সাপ্‌টে ধ'রে টেনে নিতে ভুললো না। চারদিকে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চিৎকার শুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু বিদিশা এবারে একেবারে খেপে উঠলো। তার কলেজের গেটে গোলমাল, সে কি আর ঠিক থাকতে পারে, বিনতার হাত ছাড়িয়ে সে ছুটলো সেদিকে। ঊর্মিলা কিন্তু পেছন থেকে বিদিশার আঁচলটা ধ'রে ফেললে শক্ত হাতে— একটা হুটোপুটি ঝগড়া লেগে গেল দু-জনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত আর-একটা দৃশ্য চোখে পড়লো বিনতার। রাস্তার মাঝখানে ক্ষিপ্ত চোখে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহ এক উন্মাদ। বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু দেহ, পরনে দো-ফেরতা পাট করা এক নেংটি, দু-কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে উন্মাদ রাস্তার মাঝখানে, রোষকষায়িত নেত্রে ধিকিধিকি জ্ব'লে উঠেছে প্রলয়ংকর আগুন। চার-পাঁচটা পুলিশ এধার-ওধার থেকে লাঠি বাগিয়ে এসে ঘিরে ফেললে লোকটাকে, আর, একটি পুলিশ এসেই তার লাঠিটা দিয়ে এক খোঁচা মারলে ওর পেছনে। আর যাবে কোথায়— আঃ! সে কী ভৈরব হুঙ্কার! থরথর কেঁপে উঠলো সমস্ত পরিমণ্ডল, সমস্ত হাওয়া। উন্মত্ত হিংস্রতায়, আদিম অতিকায় বর্বর একটা পশুর মতো যেভাবে সে লাফ দিয়ে পড়লো পুলিশটার ওপর— দেখে আতঙ্কে চোখ বুজে গেল বিনতার।

সঙ্গে-সঙ্গে দশ দিক থেকে হৈ-হল্লা উঠলো আকাশে, তৎপর পুলিশ-বাহিনী সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করলো, ছেলেমেয়েদের ওপর পাখিসাট মেরে লাঠিচার্জ কিল চড় ঘুষি লাথি শুরু ক'রে দিলো নির্বিচারে। আর্ত চিৎকার তুলে উর্ধ্বশ্বাস মানুষেরা নেংটি ইঁদুরের মতো এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। তারই মধ্যে বহু ছেলেকে, পাশের হেয়ার স্কুলের কয়েকটি বাচ্চা ছেলেকে, এমনকি কয়েকটি মেয়েকে পর্যন্ত দেখা গেল লাফিয়ে পড়তে প্রতিরোধ-সংগ্রামে। প্রাণপণে তারা চেষ্টা করতে লাগলো পুলিশের এই বর্বর চণ্ডলীলা ঠেকাতে, থামাতে। কিন্তু এত-এত বারুদ যেখানে জমা করা হয়েছে, সেখানে কি এইটুকু আগুনও জ্বলবে না! আরে দাঁড়াও, কয়েক রাউণ্ড তো হ'য়ে যাক পয়লা দফায়! এইও হটাও! ডিসপার্স! ফায়ার! লেহি লেহি লিকলিকে নীল জিভ মেলে শিস তুলে কত কেউটে যে আকুল ছন্দে লাফিয়ে পড়লো বাতাসে, মানুষের বুকে!

ডাক-ছেড়ে কেঁদে উঠেছে সমস্ত এলাকাটা। অগ্ন্যুদ্গার আর তপ্তধূম, আর্তনাদ আর হাহাকার! একপক্ষের উন্মত্ত পাশব গালিগালাজ ও নৃশংস তাণ্ডবলীলা আর অন্যপক্ষের অগ্নিকল্প কঠিন শপথ ও মরণপণ প্রতিরোধ!

সাক্ষী রইলো রাজপথ।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তগুলো কেটে যেতে, আকস্মিকতার কালো অন্ধকারের পর্দাটা ফিকে হ'য়ে এলে বিনতার শ্বাস-প্রশ্বাস একটু নিয়মিত হ'লো যখন, চোখ খুলে তাকিয়ে বাইরের পৃথিবীকে চিনে নেবার চেতনা এলো যখন, কিছু-একটা বলবার চেষ্টায় থরথর কেঁপে উঠলো তার ঠোঁট দুটো। কিন্তু অসহ্য দুর্বলতায় কিছুই বলতে পারলে না সে, শুধু

অসহায়ের মতো গাড়ির ভেতরকার অন্যান্য মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ফ্যালফ্যাল ক'রে।

'এই যে বিনতা আমি—' পাশ থেকে প্রশান্ত অভয় দিলে, হাসলো একটু, 'ভয় নেই, দস্যু-কবলে পড়োনি।'

চমকে উঠে পাশ ফিরতেই বিনতা দেখতে পেলো প্রশান্তকে। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো তার। সাহস পেয়ে উঠে বসলো। মুখ ফিরিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গাড়ির ভেতরকার আহত চারটি প্রাণীকে দেখতে লাগলো বার-বার।

প্রশান্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো, সাগ্রহে বললো, 'কী, কেউ চেনা-শোনা আছে নাকি?'

বিনতা মাথা নাড়লো।

'তবে? কী দেখছো? ভয় করছে?' হাসলো আবার প্রশান্ত।

প্রশান্তর হাসি দেখে জ্বালা ধ'রে গেল বিনতার। মুখ ফিরিয়ে সে দেখতে লাগলো— চারটি আহতের মধ্যে কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছেলে, কপালটা গেছে থেঁৎলে, কালো ভুরু জোড়া চাপ-চাপ রক্তে মাখামাখি, চোখ দুটি খোলা, স্থির, বীভৎস, সোজা তাকিয়ে আছে বিনতার দিকে। আর-একটি, নেংটিপরা হতভাগা চেহারার দশ-বারো বছরের জুতো-বুরুশ-করা ছেলে। আশ্চর্য, এ-অবস্থাতেও ও ওর কাঠের বাক্সটা, ওর জীবনের একমাত্র সম্বলটা, আঁকড়ে ধ'রে আছে ডান-হাতে। কী ভাগ্যিস, পুলিশের লাঠিটা বোধ হয় ওর ডান পা-টার ওপর দিয়েই গেছে; কিন্তু তাতে বিশেষ-কিছু এসে যাবে কি— রাস্তার ওপর ব'সে-ব'সে দু-হাতে জুতো-পালিসের কাজটা স্বচ্ছন্দেই ও চালিয়ে নেবে আর পুলিশে তাড়া করলে নেংচে-নেংচে দৌড়ে পালাতেও পারবে বোধ হয়। পারবে না?—ভাবে বিনতা তৃতীয় আহতের

গোঙানি শুনতে-শুনতে। মা-মা ক'রে গোঙাচ্ছেন ভদ্রলোক, খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা মুখটা, মুখের এক দিকে কী সাংঘাতিক একটা কালশিরে, বয়স অন্তত চল্লিশ তো হবে। কিন্তু বিনতার সমস্ত চেতনা অবশ হ'য়ে গেল চতুর্থ আহতটির দিকে চোখ পড়তে। ভদ্রলোকের পাঁজরাটা কি ফুটো হ'য়ে গেছে? ঈশ্, এত রক্ত মানুষের গায়ে থাকে? ছেলে তিনটি— স্বেচ্ছাসেবক? কিন্তু পারছে না তো রক্তের তোড়টা থামাতে?

মেডিকেল কলেজের ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে থামলো অ্যাম্বুলেন্স-গাড়িটা।

'এ কোথায় নিয়ে এলে?' অস্ফুটে বললো বিনতা।

'যমপুরীতে!' হাসতে-হাসতে প্রশান্ত লাফ দিয়ে নামলো গাড়ি থেকে।

আরো-তিনটি মেডিকেলছাত্র, আর. ডব্লিউ. এ.সি.-র স্বেচ্ছাসেবক, ছিলো গাড়িটাতে। স্ট্রেচারে ক'রে নামিয়ে নিয়ে গেল আহতদের।

'ভয় পেয়ো না বিনতা, দেরি হবে না বেশি!' ব'লে গেল প্রশান্ত।

বিনতার বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো। চোখ ছাপিয়ে জল এলো। অন্ধ একটা প্রশ্ন কোত্থেকে ভেসে এসে ওর মনের চৌকাঠের ওপর মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো— হায় ভগবান, এরা যদি আর না ফেরে? যদি ম'রে যায় এরা এই হাসপাতালেই? কিন্তু কী এদের অপরাধ? কেন এরা মরবে?

একটা ডানা-ভাঙা পাখি নিঃসীম শূন্যে যেন ঘুরে-ঘুরে পড়তে লাগলো নিচের দিকে।

'ওকি বিনতা, ঘুমিয়ে গেলে নাকি, অ্যাঁ, আচ্ছা নার্ভাস তো! এত ছেলেমানুষ তুমি, উঁ!' হা-হা ক'রে হাসলো প্রশান্ত। অন্য ছেলে তিনটিও হেসে উঠে শব্দটা জোরালো করলো।

লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে পড়লো চারজনে গাড়িতে। চললো গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে।

প্রশান্তর ঠোঁটে হাসিটা লেগেই ছিলো। ফটক থেকে গাড়িটা নামতেই বিনতার দিকে একটু নিবিড় নজর বুলিয়ে প্রশান্ত প্রত্যাহার করলো হাসিটা। ভুরু কুঁচকে বললে, 'আমাদের নামিয়ে দে ভট্‌চায, বিনতাকে ট্রাবল্‌ড এরিয়ায় নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সংকোচে লজ্জায় বিনতা এতটুকু হ'য়ে গেল। চকিতে সোজা হ'য়ে বসলো, বললো অপদস্থ গলায়, 'তোমার নামার দরকার কি, আমাকে নামিয়ে দাও এখানে।'

ছেলেমানুষী কথা শুনে চোখ বুজে ঠোঁট টিপে-টিপে যেমন হাসেন প্রবীণেরা তেমনি হাসলো প্রশান্ত। প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রেক কষলো ভট্‌চায।

তড়াক্ ক'রে নেমে প'ড়ে প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে দিলো বিনতাকে নামতে সাহায্য করতে।

সাহায্য না নিয়েই বিনতা নামলো।

'নমস্কার—' ছেলে তিনটি অভিবাদন জানায়।

নীরব প্রতি-নমস্কার জানালো বিনতা।

চ'লে গেল ওরা গাড়ি ছুটিয়ে। আর বিনতা তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

'চলো তোমাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নিই।'

'কোথায়?'

'চলোই না।'

'না, খাবো না কিছু।'

'আরে ছি-ছি, তুমি খাবে কেন, আমি-ই খাবো, বাঘের খিদে পেয়েছে।'

'আমি তবে ফিরি—' দাঁড়িয়ে পড়লো বিনতা, আর সঙ্গে-সঙ্গে পা বাড়ালো ফিরবার।

'পাগল, ও-রাস্তায় এখনো গুলিগোলা চলছে যে।'

একটু চমকেই উঠলো বুঝি বিনতা, বললে, 'এখনো?'

'নিশ্চয়, ঘণ্টা তিনেক তো চলুক। এসো এই রেস্তরাঁটায়—'

আর আপত্তি করতেও যেন বিরক্তি লাগলো বিনতার, ক্লান্তি লাগলো। আর তাই ঢুকলো প্রশান্তর পেছন-পেছন।

'আজকের অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, মেয়েরা যতই না কেন প্রগতির টনিক গিলুক, ফাণ্ডামেণ্টালি তারা এখনো ক্ষীরোদাসুন্দরীদের যুগেই আছে।' কালো পর্দা-ঘেরা কেবিনটায় গুছিয়ে বসতে-বসতে প্রশান্ত একটা মাঝারি মাপের হাসি ব্যবহার করলো কথাটা ব'লে এবং একটি দামি চুরুট ঢোকালো মুখে।

'অথচ পাকামিটা আছে— কৃষ্ণা রায় তো সেদিন, বুঝলে বিনতা, বমিটমি ক'রে অস্থির! চোখ-মুখ উল্টে যায় আর কি।'

বিনতা যে কিছুই শুনছে না, সেটা গ্রাহ্যই করলো না প্রশান্ত। আত্মতৃপ্তির নিরপেক্ষ বেগে সে ব'লে চললো, 'আরে বাবা মেয়ে হ'য়ে জন্মেছো এ-দেশে, আই. সি. এস. হ'য়ে যাও— ইণ্ডিয়ান কুকিং সার্ভিসটায় উৎরতে পারলে আর চাই কি…তা না পড়তে এসেছেন তিনি ডাক্তারি! সেদিন ডিসেক্‌শন-রুমে একটা ইঁদুরের ডিসেক্‌শন দেখে শ্রীমতী বমিটমি ক'রে ডক্টর সর্বাধিকারীর সামনে কী কেলেঙ্কারিটাই না করলে! চেনো না তুমি কৃষ্ণা রায়কে? ঐ যে সেই মেয়েটা, দেখেছিলে আমার সঙ্গে— পাতলি-পল্লু শাড়ি ছাড়া আজকাল যে আর অন্য কিছু পরেই না।'

বিনতা চুপ। টেব্‌লে কনুই রাখা, মাথা নামানো দু-হাতের ওপর, চোখ দুটি বোজা।

'খারাপ লাগছে শরীর?' চেয়ারটা একটু ঘনিষ্ঠ ক'রে নিলে প্রশান্ত। বিনতার একটা হাত আলগোছে ছুঁয়ে ডাকলো, 'বিনতা—'

'বলো—' যেন কত দূর থেকে বললো বিনতা, মাথা তুললো না।

'তোমার আজ কলেজে আসাই উচিত হয়নি। কেন এলে বলো তো। হাঙ্গামা যে হবে সে তো আমরাও জানতুম। তবু তো আমি এসে পড়েছিলাম ব'লে— আর সত্যিই, কী ভাগ্যিস প্রথম রাশটাতেই তুমি আমার নজরে প'ড়ে গিয়েছিলে— খুব বেঁচে গেলে যা হোক।' দম নিলো প্রশান্ত, তারপর হেসে বললে, 'আর নয়তো এতক্ষণে হয়তো মর্গে গিয়েই হাজির হ'তে!'

'মর্গে—' চমকে ওঠে বিনতা।

'ও কি, দূর্! হাসালে তুমি— যেন সত্যিই তুমি গেছো মর্গে!' কলরব ক'রে হেসে উঠলো প্রশান্ত।

বয় কফি আর কাজু বাদাম পরিবেশন করলো।

'আচ্ছা প্রশান্ত, কেউ মারা-টারা তো যায়নি, না?' শঙ্কিত চোখে তাকালো বিনতা প্রশান্তর দিকে।

প্রশান্ত হাসলো ঠোঁট টিপে।

ব্যথায় কালো হ'য়ে যায় বিনতার মুখ। বললো, 'ক'জন মরলো?' কথাটা বলতেই এক-ঝলক উত্তেজনা ছুটে এলো বিনতার ঠোঁটে, মুখে। ফের বললো, যেন বলতে পারলো অসহ্য চেষ্টায়, 'কে-কে মরলো বলতে পারো? চেনো কাউকে? নাম জানো?'

এবার প্রশান্তকে গম্ভীর হ'তেই হ'লো। বলতে হ'লো, 'তা তো জানিনে, তবে মনে হ'লো মরেছে কয়েকজন—'

'আর এখনো না মরলেও কয়েকজন তো মরবেই।' প্রশান্ত তার অভিজ্ঞতা থেকে বললো।

'কেন, মরবেই কেন ?'

'মরবে বুদ্ধির দোষে।'

'বুদ্ধির দোষে!'

'নিশ্চয়। জানে পুলিশে যখন গোলাগুলি চালাবেই, কী দরকার রোজ-রোজ হাঙ্গামা হুজ্জুৎ ক'রে।'

বিনতা কোনোমতেই এ-কথায় সায় দিতে পারলো না। বললে সে মৃদু তীক্ষ্ণ গলায়, 'পুলিশে কারণে-অকারণে গোলাগুলি চালাবে ব'লে আমাদের চুপচাপ ঘরের কোণে মুখ গুঁজে ব'সে থাকতে হবে ?'

হা-হা ক'রে হেসে উঠলো প্রশান্ত। বললে ভারিক্কি চালে, 'ঐখেনেই তোমাদের হিসেবের ভুল বিনতা।

'হিসেবের ভুল!' কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলো বিনতা। শেষে বললে, 'হিসেবের ভুল মানে? কী বলতে চাও ?'

'খুব কঠিন কিছু বলতে চাইনে। কথাটা সোজা বুদ্ধিতে বুঝতে চেষ্টা করো। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমিই বলো না কেন আজকের এ-স্ট্রাইকটার হেতুটা কী।'

'হেতু? ওঃ, তোমরা তো আবার…জেগে ঘুমিয়ে থাকলে হেতু বোঝা যায় না। আর যদি ধ'রে নেয়াই যায় ছেলেমেয়েদের মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তবু দেশের কর্তাদের, এই পাকা-পাকা-মাথাওয়ালা গভর্মেণ্টেরই বা এ-মতিচ্ছন্ন হ'লো কেন ?'

'ওঃ গভমেণ্টের মতিচ্ছন্ন! সে আর হবে কী, সে তো হ'য়েই আছে, এ গভমেণ্টের কি কোনো ফাদার-মাদার আছে! ভুঁইফোড় যত্তো হরিদাস পাল এসে জুটেছে! এরা না নিজের বুদ্ধিতে চলে, না পরের বুদ্ধিতে! এদের না আছে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি অব ক্যারেকটার, না ক্যাপিটালিস্ট ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে ভালো ক'রে গাঁটছড়া বাঁধবার শিক্ষা—

ফলে যা হয়, কখন কী ক'রে বসেন এঁরা তা নিজেরাই জানতে পারেন না! কী-রকম স্ট্রাইক একটা প্রহসন মাত্র, আর কী-রকম স্ট্রাইক গভর্মেণ্টের পক্ষে মৃত্যুবানের সামিল— এতই যদি মালুম হবে এই গভর্মেণ্টের, তাহ'লে আর কথা কী ছিলো!' থুঁতনিতে হেসে উঠে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করলো প্রশান্ত।

বিনতা অবাক।

'অথচ মজা এই—' নিজের বুদ্ধির ঘোড়ায় চেপে প্রশান্ত আবার ছুটতে শুরু করলো টক্‌টক্‌-টকাটক ক'রে, 'যে যা করে সকলেই খুব সিরিয়াসলিই করে! ছাত্রছাত্রীর দল স্ট্রাইকটা করাতে এলো এমনভাবে যেন তা একেবারে তাদের জীবন-মরণ সমস্যা। পুলিশের পাল নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো গভর্মেণ্ট, যেন তাদেরও এটা একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা! কী হাস্যকর ব্যাপার! আর মাঝখান থেকে মরছে কারা? যারা এ-দু'পক্ষের কোনো পক্ষেই নেই!'

যেমন তাকিয়েছিলো বিনতা প্রশান্তর মুখের দিকে তেমনিই তাকিয়ে রইলো।

বিনতার নির্বাক দৃষ্টিটার মধ্যে যে বিরক্তি আর করুণা মিশ্রিত একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা অনুমান করা অসম্ভব হ'লো না প্রশান্তর পক্ষে। কিন্তু সে-অনুমান আচ্ছন্ন হ'লো তার চরিত্রগত আত্মম্ভরিতায়, বিনতার ব্যঙ্গকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ব'লে উঠলো সে, 'নাঃ, চলো তোমাকে বাড়িই পৌঁছে দিয়ে আসি, ভেঙে পড়েছো একদম! দূর্, দূর্, এর'ম তো হামেশা হচ্ছে, এইটুকুতেই এমন ভেঙে পড়লে চলে। এক কাজ করবে? চলো সিনেমিত হই—এলিটে ভালো বই আছে, চলো—'

বাদামের প্লেটটা প্রশান্তর দিকে ঠেলে দিয়ে বিনতা বললে, 'বাড়িই যাই, হয়তো ভাবছে সবাই।' চুমুক দিলো বিনতা কফিতে।

'কে ভাববে ! মা না বাবা ? না তোমার ভ্রাতৃবর নীলাম্বর ?'

'আমার ভাই তো আরো-একটি আছে।'

'তা আছে। পূষন্ অবিশ্যি খবরটা পেয়ে গিয়ে থাকলে বাতাসা-ই মানত ক'রে ফেলেছে এতক্ষণে দিদির জন্যে।' আরো হাসলো প্রশান্ত।

কফির পালা ক্রমে শেষ হ'লো। বিল চুকলো।

রাস্তায় নেমে প্রশান্ত ইশারায় একটা রিক্সা ডাক দিলে।

'রিক্সা ডাকলে কেন অনর্থক !' অত্যন্ত বিরক্ত দেখালো বিনতাকে।

'যে-রকম কাহিল হ'য়ে পড়েছো হেঁটে যেতে পারবে না।'

'তা সে তো ট্রাম-বাসই আছে।'

'পাগল ! ও-রাস্তায় এখুনি ট্রাম-বাস !'

'কেন, কেন, গুলিগোলা কি এখনো চলছে ?'

স্নিগ্ধ হাসলো প্রশান্ত। ভু-চোখে কৌতুক ঘনিয়ে তুললো, বললে, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো, একেবারে যেন নতুন মানুষ তুমি আজ !'

বিনতা বললে না কিছু।

'এক ধাক্কাতে তুমি এতটা কাহিল হ'য়ে যেতে পারো, এ আমি নিজে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না।'

কথা না ব'লে বিনতা রিক্সায় উঠে বসলো। গুলিগোলা তাহ'লে এখনো চলছে ! এ কী অবস্থা হ'লো দেশের ! মানুষের বাঁচবার কি আর কোনো উপায়ই থাকবে না আজ ? এ কী অরাজকতা, এ কী মতিগতি হ'লো মানুষের। বিদিশা, উর্মিলা, তার আর-আর বন্ধুরা—সবাই ভালো আছে তো ? সবাই ভালোয়-ভালোয় ফিরতে পেরেছে তো বাড়িতে ? সমস্ত বুকটা বিনতার ব্যথায় তুমড়ে-তুমড়ে যেতে লাগলো।

আর প্রশান্ত এদিকে বিনতার পাশে ব'সে চেষ্টা করতে লাগলো

হাল্কা হাসি-ঠাট্টায়, তার নিজস্ব পদ্ধতিতে উল্টোপাল্টা নানান অসংলগ্ন কথাবার্তায়, আজ-কাল-পরশুর ছোটো-ছোটো ঢেউয়ের মধ্যে বিনতার মনটা টেনে আনতে। আসন্ন নেতাজীদিবস থেকে স্বাধীনতাদিবস পর্যন্ত, ভারতের কমনওয়েলথভুক্তির অপকারিতা থেকে অবিলম্বে ফুটবল স্টেডিয়াম গঠনের উপকারিতা পর্যন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানের কয়লা আনবার দুর্মতি থেকে দিনে পাঁচ কাপের বেশি চা না-খাবার জন্যে তার সাম্প্রতিক সুমতি পর্যন্ত কথার পক্ষীরাজ উড়িয়ে নিয়ে চললো প্রশান্ত।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। বিনতা একটি কথাও বললে না। নির্বাক নির্বিকার ঠাণ্ডা ব'সে রইলো সে।

গ্রে স্ট্রীটের একটি গলির মুখে এসে থামলো রিক্সা। চাপা কানা গলি, ভেতরে রিক্সা ঢোকানোর উপায় নেই। দু-টাকার একটা নোট ফেলে দিলে প্রশান্ত, সেলাম ঠুকে বিদায় হ'লো রিক্সাওয়ালা।

দরজায় কড়া নাড়তে সারদাই এসে দরজা খুললেন। সারদা বিনতার মা।

'উর্মিলার ভাই এসেছিলো খোঁজ নিতে—' বললেন সারদা মৃদু গলায়।

'কার খোঁজ নিতে, আমার ?'

'না, উর্মিলার। এখনো নাকি ফেরেনি সে।' মাথার আঁচলটা আরো-একটু টেনে কপালের নিচে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে স'রে যেতে-যেতে বললেন সারদা।

'এখনো ফেরেনি ? সে কি, এখনো ফিরছে না কেন··· তুমি তাহ'লে প্রশান্ত, একটু বোসো আমার ঘরে, আমি একটু খোঁজ নিয়ে আসি।'

'না চলো, আমিও যাই। আমার আবার ডিউটি আছে হাসপাতালে দুটো থেকে। কবে যে এ-দুর্ভোগ কাটবে বাবা, পারিনে আর—'

আবার বেরুলো দু-জনে।

প্রশান্ত বিদায় নিলে। বিনতা একটু এগিয়ে গিয়ে আর-একটা গলিতে ঢুকলো।

কিছুটা গিয়েই মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল উর্মিলার সঙ্গে। সমস্ত মুখটা ওর ফ্যাকাশে, সমস্ত রক্ত মুখ থেকে যেন কোনো যন্ত্র দিয়ে নিংড়ে বের ক'রে নেওয়া হয়েছে। বিনতা ভুলে গেল এটা প্রকাশ্য রাস্তা। জড়িয়ে ধরলো একেবারে উর্মিলাকে, অস্ফুটে ডাকলো, 'উর্মি !'

আস্তে ছাড়িয়ে নিলো উর্মিলা নিজেকে।

'কী হয়েছে রে উর্মি ?'

'চল, তোদের বাসায় চল, বলছি—'

'কেন বল না—' দ্রুত পা চালিয়ে যেতে-যেতে বললো বিনতা, 'বল-না ভাই, আমার যেন কিরকম লাগছে— কী, হয়েছে কী তোর ? ভালো কথা, বাসা হ'য়ে আসছিস তো ?'

'হুঁ।'

'তো বলছিসনে কেন কিছু ?'

অস্বাভাবিক ভাবটা কাটলো না উর্মিলার। চুপ ক'রেই রইলো।

পা চালিয়ে চ'লে এলো দু-জনে বিনতাদের বাসায়।

নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ছুটে এসে বসলো বিনতা উর্মিলার পাশে।

কিন্তু উর্মিলা ততক্ষণে বিনতার খাটের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে শুরু করেছে।

'উর্মি !' বিরক্ত, ব্যাকুল বিনতা ধমকে উঠলো। সে-ধমক কান্নার মতো শোনালো।

কিন্তু মিনিট দশেক সময় দিতেই হ'লো উর্মিলাকে। সামলে উঠবার

জন্যে। ঢেউটা কাটিয়ে উঠবার জন্যে। বিনতা উর্মিলার পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে পাথর হ'য়ে ব'সে রইলো। কী এমন হ'তে পারে! কী হ'তে পারে উর্মিলার!

অনেকক্ষণ পরে, অনেক কষ্টে ব'লে ফেললো উর্মিলা, 'বিদিশা মারা গেছে—'

'অ্যাঁ—' একটা আর্ত শব্দ বেরিয়ে এলো বিনতার গলা চিরে, 'উর্মি—' কিন্তু আর একটি কথাও বলতে পারলো না বিনতা। হৃদ্‌স্পন্দন সহসা যেন স্থির হ'য়ে গেল।

'সে যে কী দৃশ্য ভাই, আমি তো ওকে ছাড়িনি···ছিলুম ওর সঙ্গে-সঙ্গেই। দুটো গুলি লেগেছিলো। তলপেটে একটা। কপালে একটা। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে তুলে নিলে ওকে। আমি অনেক ক'রে কান্নাকাটি করতে আমাকেও নিলে ওর সঙ্গে। মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে ওর মা ভাই বোন সব এলো— কিন্তু হ'লো না কিছু। ঈশ্, ওর বিধবা মা-টা ভাই যা করছে—' আবার শব্দ ক'রে কেঁদে উঠলো উর্মিলা। দু-হাতে মুখ ঢেকে গোঙাতে লাগলো।

বিনতা কাঁদলে না। অস্বাভাবিক কয়েকটা ভাঙাচোরা রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে। মৃত্যুর একটা কালো রহস্যময় পর্দা নাচতে লাগলো চোখের সামনে। তার সমস্ত চেতনায়।

' ম'রে গেল বিদিশা? আজও একসঙ্গে কলেজে গেলাম যে-বিদিশার সঙ্গে, সে আর নেই এই পৃথিবীতে?

পৃথিবীটা ভেঙেচুরে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে। যা-কিছু ভালো যা-কিছু সুন্দর— সব যেন ছারখার ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। এখানে আলো নেই, এখানে বাতাস নেই। দম বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো বিনতার। মুহ্যমান অবশ অচেতন একটা পাথর ব'নে গেল বিনতা।

* * তিন * *

দিন-সাতেক পরের একটা অধ্যায়।

সকালবেলা।

'বিনু, একটা কথা ছিলো তোর সঙ্গে—' সারদা এসে দাঁড়ালেন বিনতার ঘরে।

একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে পড়ছিলো বিনতা। উঠে ব'সে বললে, 'কী কথা?'

সদাবিষণ্ণ মূর্তি সারদার। এক-নজরেই মনে হয় অনেক ঝড়-ঝাপ্টা, অনেক দুঃখের কালো ইতিহাস তাঁর জীবনের পাতায়-পাতায়। বয়স হয়েছে সবে তো পঞ্চাশ, অথচ দেখে মনে হয় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছেন। মুখের চামড়া কুঁকড়ে ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটি নিষ্প্রভ, কোটরগত। যৌবনের কাঁচা-হলুদ-রঙ যেন পুড়ে-পুড়েই তামাটে হ'য়ে গেছে। মাথার ওপর চওড়া লাল কি কালোপেড়ে শাড়ির আঁচলটি সব সময়েই তোলা আছে। আভরণের মধ্যে দু-হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা আর নোয়া। কপালের ওপর মস্ত সিঁদুরের টিপটি কখনো-কখনো জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে ওঠে— তবে সেটা কদাচিৎ। কিন্তু সারদাকে দেখলে সব-চাইতে চোখে যেটা লাগে সে হচ্ছে তাঁর চলাফেরা কথাবার্তায় সদাসন্ত্রস্ত সদাবিষণ্ণ কেমন অসহায় একটা ভাব। দেখলেই কেমন যেন শিরশির ক'রে ওঠে বুকের ভেতর, মৃত্যুর একটা চেহারা যেন ভেসে ওঠে মনের মধ্যে।

সারদা জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন, 'আজ তোর কলেজে না-গেলে হয় না, শুনছি নাকি আজও গোলমাল হবে সেদিনকার মতো—'

'গোলমাল তো রোজই হচ্চে—' হেসে উঠলো বিনতা, 'কলেজ তাহ'লে ছেড়েই দিই, কী বলো মা!'

কী বলবেন ভেবে পান না সারদা।

'আচ্ছা, যাবো না আজ, বলছো যখন।'

যেন খুব অনুগৃহীত হলেন সারদা। মুখে হাসি ফুটলো একটু। এবার তাই মেয়ের সঙ্গে ভরসা ক'রে আরো যেন একটু ঘনিষ্ঠ হ'তে চাইলেন। কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'আর পীতুকেও তাহ'লে মানা ক'রে দে যেন ইস্কুলে না যায় আজ!'

'দেব'খন। কোথায় গেল সে, সকাল থেকে দেখাটি নেই? বেরিয়েছে নাকি?'

'না, বেরুবে কেন, পড়ছে দেখলাম তো ঘরে ব'সে।'

'পড়ছে, না কবিতা লিখছে!' জোর ক'রে, মা'কে একটু খুশি করবার জন্যেই বোধ করি, হেসে উঠলো বিনতা।

সারদার মুখেও হাসি ফুটলো। তা ছাড়া ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে আজকের মতো কতকটা নিশ্চিন্তও হলেন। প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন স্কুল-কলেজে আজ যাবে না ওরা।

কিন্তু আর কী বলবেন, আর কী বলা যায় মেয়েকে, এক যেন ভাবলেন সারদা। কিন্তু কোনো বক্তব্যই এর পর আর মনে এলো না তাঁর। চুপচাপ কিছুক্ষণ তাই দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে 'যাই, ভরত আবার বাজারে যেতে চাচ্ছে না— বলছে, আজ নাকি বাজার বসবেই না, হরতাল-টরতাল কী-না-কী হবে—' বলতে-বলতে ফিরলেন সারদা।

বিনতার কেমন-একটু মায়া লাগলো। ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে, ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে আর-পাঁচজন মায়ে-মেয়েতে যেমন কথা হয় ঘরকন্নার, আজে-বাজে আটপৌরে সব কথা, তেমনি ক'রে দুটো কথা বলে মায়ের সঙ্গে আজ। কিন্তু এ কী অভিশাপ, এ কী অভিশাপ আমার জীবনে যে নিজের মায়ের সঙ্গে

আমি মন খুলে দুটো কথা বলতে পারিনে! —কেমন বিশ্রি একটা গ্লানিতে মনটা ছেয়ে গেল তার। মুখের ওপর বইটা ফেলে শুয়ে পড়লো বিনতা। আকাশ-পাতাল কী ভাবতে লাগলো সে-ই জানে।

একটু পরে পা টিপে-টিপে ঘরে উঁকি মারলো পীতু অর্থাৎ পীতাম্বর অথবা বিনতার পূষন্। দিদিকে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতে দেখে সম্পূর্ণ মূর্তিখানা নিয়ে আবির্ভূত হ'লো এবার ঘরের মধ্যে। কমনীয়, হরিণদেহ, চোদ্দ বছরের ছেলে পূষন্। স্বপ্নালু দুটি চোখে সৃষ্টির হাজার বিস্ময় যেন লুকনো। এক-মাথা এলোমেলো ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল হাজারখানেক প্রশ্নচিহ্ন হ'য়ে উড়ছে সব-সময় বাতাসে।

কয়েক মুহূর্ত মনে-মনে কি মুশাবিদা করলো পূষন্, আর তারপর ব'লে উঠলো ছড়ার স্বরে :

'বইয়ে মুখ গুঁজে ভাবছো কী—
দেখছো-না আমি এসে গেছি?'

বই সরিয়ে চোখ মেললো বিনতা। মুখের মেঘলা ভাবটা যেন সঙ্গে-সঙ্গেই একটু ফর্সা হ'য়ে গেল, কিন্তু নকল ধমকে চোখ পাকিয়ে বললে, 'তা তো দেখছি, কিন্তু এতক্ষণ ছিলেন কোথায়— সকাল থেকে তো টিকিটি দেখা যাচ্ছে না?'

পূষন্ ভারিক্কি চালে বললে, 'একটু ব্যস্ত ছিলুম দিদি!'

'দিন-দিন ব্যস্ততা তোমার বাড়ছে!'

'বাড়বে না? বয়স বাড়ছে যে।'

দুর্বোধ্য চোখে-মুখে তাকিয়ে রইলো বিনতা পূষনের মুখের দিকে।

'কী যে বহুব্রীহি সমাসের মতো তাকিয়ে থাকো কিচ্ছু মানে বোঝা যায় না—' ব'লে এগিয়ে এসে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ে পূষন্ বিনতার পায়ের কাছে। বিনতার কোলের ওপর হাত দু-খানা রেখে মুখ উঁচু ক'রে

খুব-একটা বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতে বললে, 'এতক্ষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মুখস্থ করছিলাম দিদি।'

ভ্রূকুটি করলো বিনতা। ভাবখানা এই যে, মিথ্যে কথা বললে মার খাবি কিন্তু বাঁদর।

প্রত্যুত্তরে পূষনের মুখের ভাবে যেটা ফুটলো তা হচ্ছে এই যে, মিথ্যে কথার ধার সে ধারে না। অত্যন্ত নির্মল চিত্তে অপরিসীম আত্মতৃপ্তি দেখিয়ে ফের বললে সে, 'আজকেরটা নিয়ে আমার স্টকে তিপ্পান্নটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন জমলো। আর আটটা হ'লেই থার্ড বয় ব্যোমকেশকে ছাড়াবো।'

প্রাণপণে গাম্ভীর্য রক্ষা করতে লাগলো বিনতা। হেসে ফেলে সে হেরে যেতে রাজি নয় পূষনের কাছে। কিন্তু কী ফাজিল হয়েছে পূষনটা আজকাল। উঃ, মুখখানা আবার কেমন ক'রে আছে ছাখো-না। গাম্ভীর্য অটুট রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াসে বিনতা পূষনের গালে এক চড় কষিয়ে বললে, 'ফের মিথ্যে কথা! সত্যি ক'রে বল কী করছিলি?'

মার খেয়ে চোখমুখ ছলছলিয়ে উঠলো পূষনের। কথার কোনো জবাব দিলো না।

'কী করছিলি বল। কবিতা লিখছিলি?' বিনতাকে আরো কঠিন দেখালো।

কবিতার নাম শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো পূষন্, ক্ষুব্ধ চোখে-মুখে ব'লে উঠলো তাড়াতাড়ি, 'আমি বলে ভূগোল পড়ছিলাম!'

'ফের!' কান ধরলো বিনতা পূষনের।

কান ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টায় বললে পূষন্, 'আরে আরে! আমি জলবায়ু-প্রভেদের কারণ মুখস্থ করছিলাম। ছাড়ো, ছাড়ো না···সত্যি, সত্যি বলছি। সত্যি কথা বলা দেখছি মহা বিপদ—আচ্ছা দেখবে

মুখস্থ বলবো ? নিম্নলিখিত দশটি কারণের উপর কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে। যথা— অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্রস্রোত, অত্যাচার, অকারণ পীড়ন, স্বেচ্ছাচারিতা, সাম্রাজ্যবাদ—'

সশব্দে হেসে ফ্যালে বিনতা। হাসতে-হাসতে এলিয়ে পড়লো চেয়ারে।

পূষনের মুখে কিন্তু হাসির লেশও নেই। উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিরক্ত চোখে সে স'রে গেল দূরে। বললে, 'ভারি বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার। কথায়-কথায় কেবল— আর যদি আসি তোমার ঘরে—' ব'লে সে হন্‌হন্‌ ক'রে রওনা হ'লো চ'লে যাবার জন্যে।

বিনতা ছুটে গিয়ে ধরলো পূষন্‌কে। হাতে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে আনতে-আনতে বলতে লাগলো অত্যন্ত অনুতপ্ত গলায়, 'সত্যি, কী অন্যায় আমার! ভাইটি কি আমার এখনো সেই ছোট্টোটি আছে যে কথায়-কথায় কান ম'লে দেওয়া— আজ বাদে কাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যে জেণ্টলম্যান হ'তে যাচ্ছে—'

'বাজে বোকো না তো।' সত্যিকারের একটা ধমকই দিয়ে বসলো পূষন্‌।

'ওরে বাবা রে!' ফের চেয়ারে এসে পূর্বাবস্থায় পূষন্‌কে টেনে-হিঁচড়ে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসতে-বসতে চোখ দুটি একটু বড়ো হ'লো বিনতার। সারা মুখে অপরূপ একটি ভঙ্গি ছড়িয়ে পড়লো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদিও বসলো এবার পূষন্‌, ব'সেই কিন্তু মুখ গুঁজলো বিনতার কোলের মধ্যে। পূষনের চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বিনতা বললে, 'কী কবিতা লিখলি রে পূষন্‌? বল-না শুনি—'

পূষন্‌ নিথর।

'এই পাগলা, এই !'

নির্বিকার তবু।

'আচ্ছা ছেলে তো!' পূষনের চুলের মুঠি ধ'রে টানতে লাগলো বিনতা।

খানিকক্ষণ শক্ত হ'য়ে অত্যাচারটা সহ্য ক'রে শেষে হঠাৎ মাথাটা তুললো পূষন্, বললে রুক্ষ মেজাজ দেখিয়ে, 'কী বলছো বলো—'

বিনতা চোখে অনুনয় ঘনিয়ে বললো, 'বল-না, কবিতাটা কী লিখলি—'

'মনে নেই।'

'খুব হয়েছে, নে, বল, বল-না—'

'কাল কী বলেছিলে মনে আছে?'

'বই? আচ্ছা, কাল কিনে দেবো দোকান খোলা থাকলে— আজ তো সব হরতাল।'

'আমাদেরও আজ স্ট্রাইক হ'য়ে যাবে, আজও ঠেকাতে পারবেন না হেডমাস্টারমশাই।'

'আজ তোর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই পূষন্।'

'না আমি যাবো। ভীতুর মতো রোজ-রোজ বাসায় ব'সে থাকতে ভারি বিশ্রি লাগে আমার!'

'খুব হয়েছে বীরপুরুষ!'

'বীরপুরুষ মানে? এমনি ক'রে ভয়ে-ভয়ে সবাই যদি ঘরে ব'সে থাকে তবে স্ট্রাইক করার মানেটা কী হয়?'

'সে-মানে যা-ই হোক তুই যেতে পাবি না। আমিও যাচ্ছিনে আজ।'

'এ কিন্তু তোমার অন্যায়, দিদি।'

চুপ ক'রে রইলো বিনতা। এর কোনো জবাব খুঁজে পায় না সে।

আর তা না পেয়ে পূষনের চোখে এইখানে যেন সে ছোটো হ'য়ে গেল। কিন্তু কাঁদুনেগ্যাস-গুলি-বোমায় যে-তাণ্ডবলীলাটা হবে আজ আবার সমস্ত শহরময়—ভাবতেও সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে বিনতার। ওরই মধ্যে যাবে পূষন্ স্কুলে? না না, কক্ষনো না। বিনতা কিছুতেই যেতে দিতে পারে না পূষন্‌কে ঐ সর্বনাশের মধ্যে।

পূষনের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বিনতা শুয়ে পড়ে চেয়ারে, বইটা খুলে মুখখানা আড়াল ক'রে ফ্যালে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো পূষন্ দিদিকে। চোখ দিয়ে সে তার দিদির মনের কথাও যেন প'ড়ে নিতে জানে। শেষে কতক্ষণ পরে বললে, 'আমাদের স্কুলে সেই যে গণ্ডগোলটা হয়েছিলো না দিদি—' গলাটা এর পর একটু চড়িয়ে বলতে লাগলো পূষন্, 'কাল সেই পিওনটির চাকরি গেল। পিওনটার সে কী কান্নাকাটি কাল! ওর বৌ এসেছিলো ছুটতে-ছুটতে, পণ্ডিতমশায় আর হেডমাস্টারমশায়ের পায়ে প'ড়ে সে কী কান্নাকাটি তার!'

'এত সব হ'য়ে গেছে আমাকে বলিসনি তো কিচ্ছু—' মুখ থেকে বইটা সরিয়ে ম্লান গলায় বললে বিনতা।

'কখন বলবো বলো? কাল কত রাত্তিরে ফিরলে তুমি খেয়াল আছে!'

'তোদের হেডমাস্টার নাকি লোক খুব ভালো? এই নাকি সেই ভালোর নমুনা!'

'তাঁর দোষ কী। আর-সব মাস্টারমশায়রা সব্বাই যে জোট বেঁধেছেন শ্যামাবতারের এগেন্‌স্টে। অবিশ্যি চাকরিটা আবার হবে বোধ হয়। কাল কান্নাকাটির চোটে মাস্টারমশায়রা তো বললেন তাঁরা তাঁদের কমপ্লেন তুলে নেবেন।'

'বা-বা-বা! কী এত গল্প হচ্ছে ভাই-বোনে! স্কুল-কলেজ নেই নাকি কিছু!' দরজায় এসে দাঁড়ালো বই-হাতে উর্মিলা।

'এ কি উর্মিলাদি, ক'টা বাজে— এক্ষুনি চ'লে এলে!' ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় পূষন্।

'সাড়ে দশটা।' বললে উর্মিলা।

'সাড়ে দশটা!' লাফিয়ে উঠবার উপক্রম করতে-করতে পূষন্ বললে, 'যাঃ মিথ্যুক, সাড়ে দশটা হ'তেই পারে না, সাড়ে ন'টা বড়ো-জোর। দেখি ঘড়ি!' ব'লে এগিয়ে এসে উর্মিলার হাতটা ধ'রে ফেলে হাতঘড়িটার দিকে তাকালো, সেকেণ্ড কয়েক তাকিয়ে থেকে ভ্রূ দুটো কুঁচকে উর্মিলার হাতখানা অসীম বিতৃষ্ণায় ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে ঘরের বাইরে চ'লে যেতে-যেতে ব'লে গেল পূষন্, 'কেন যে তোমরা এই বিটকেল খেলনা ঘড়িগুলো পরো বুঝি না, ক'টা বাজে একটুও যদি বোঝা যায়—'

'পূষন্, এই পূষন্—' সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো বিনতা।

'স্কুলে যাবো না, ভয় নেই, আসছি এক্ষুনি!'

'যাক, ভাইকে তো যেতে দিচ্ছো না বুঝলাম—' এগিয়ে এসে উর্মিলা বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো, 'কিন্তু তুই নিজে?'

'আমিও যাচ্ছিনে আজ।'

'যাক বাবা বাঁচলাম। ভয় ছিলো তুই রাজি হবি কি না। আমিও তবে যাচ্ছিনে আজ।' হাতের খাতা আর বইটা ছুঁড়ে দিলো উর্মিলা খাটের ওপর।

উর্মিলা চ'লে গেছে। বিনতা ব'সে-ব'সে লম্বা দুপুরটা কী ক'রে কাটাবে সেই ভাবনায় অবসন্ন হ'য়ে রইলো। কলেজ না গিয়ে হঠাৎ যেন সে ত্রিশঙ্কু-দশায় প'ড়ে গেল। একদুপুর এখন তাকে শূন্যে ভাসতে হবে।

পূষন্ খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে এসে বিছানায় চিৎ হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র মধ্যে ডুবেছে ইতিমধ্যে। বিনতা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানা নিলো। বেলা বেড়ে উঠতে-উঠতে নিঃঝুম দুপুর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে লাগলো, যেন একশো বছরের প্রবৃদ্ধ মহাস্থবির একটি কচ্ছপের মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন স্ফীত দুপুর-বেলাটা মুখ থুবড়ে প'ড়ে রইলো গ্রে স্ট্রীটের এই গলিটার ওপর। ছোট্টো দোতলা এই রঙচটা হলদে বাড়িটা স্থির নিস্পন্দ হ'য়ে রইলো। মাঝে-মাঝে দূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো ফেরিওয়ালাদের দীর্ঘ প্রলম্বিত নির্বিকার ডাক, আর পাশের মস্ত পাঁচতলা বাড়িটা থেকে মাঝে-মাঝে একটা কলহের কোলাহল।

সাতখানা ঘর নিয়ে এই প্রাচীন দোতলা বাড়িটা। নিচে চার, ওপরে তিন। বাসিন্দাও বর্তমানে সাত। রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দর, সারদা, বড়ো ছেলে নীলাম্বর, বিনতা, পূষন্, ঝি বুড়ি-চপলা আর চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটি চাকর ভরত। ওপরের পুব-দক্ষিণ-খোলা প্রশস্ত ঘরখানা ঠাকুরঘর, সোনার পাতে মোড়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত এ-ঘরে। সারাটা দুপুর সারাটা রাত রোজ প'ড়ে থাকেন সারদা এ-ঘরে একা মুমূর্ষুর মতো। দেবতার সম্মান বাঁচিয়ে বিগ্রহবেদী থেকে অনেক দূরে একেবারে দরজার মুখে কাঁথা-কম্বলে ভূমিশয্যা সারদার— যেন এক তদ্গতচিত্তা শুদ্ধাচারিণী সেবিকা তাঁর দেবতার মন্দির-দুয়ারে প্রহরারতা। অথচ এর পাশের ঘরখানা যেন এক প্রেতলোক, অভিশপ্ত একটি যক্ষের মতো ষাট বছরের বৃদ্ধ সারদার স্বামী রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায় ওর মধ্যে পক্ষাঘাতে পঙ্গু অনড় হ'য়ে আছেন আজ এক-নাগাড়ে দশ বছর, নিম্নাঙ্গ তাঁর অসাড় দুরারোগ্য। ওপরের অন্য ঘরখানা সারদার

বড়ো ছেলে নীলাম্বরের। বার-তিনেকের চেষ্টায় প্রবেশিকাটা উৎরোতে পেরেছিলো অবিশ্যি নীলাম্বর, যদিও সেটা না পারলেও ক্ষতি ছিলো না। সে এইটেই সার বুঝেছে যে শিক্ষা-সংযম-আত্মনির্ভরশীলতা হেন-তেন সাধারণ ব্যাপারগুলোর প্রয়োজন হা-ঘরে হা-ভাতেদের জন্যে। কিন্তু এই সেদিনও সে হিসেব ক'রে দেখেছে যে বাপের টাকা এখনো তার নামে জমা আছে ব্যাঙ্কে খুব কম ক'রেও পঁচিশ-তিরিশ হাজার, অবিশ্যি ফাটা-শিমুলের তুলোর মতো ও-ক'টা টাকা উড়ে যেতে আর ক'দিন লাগবে সে-ও একটা প্রশ্ন বটে— কিন্তু যাক তো আগে, আগে থেকেই *হাঁসফাঁস করাটা নিছক ক্ষীণপ্রাণের লক্ষণ। তার জীবনের আওয়াজ হ'লো: লাইফ ইজ্ টু এনজয়, দি কিংডম ইজ্ অ্যাট হ্যাণ্ড!* অতএব *আপাতত ঘোড়ারোগ, সোমরস আর নন্দনবাসিনী সংসর্গে জীবনপাত্র-খানি টইটুম্বুর হ'য়ে উঠুক তো।* পরের কথা পরে।

ভরতের আস্তানা রায়বাহাদুর আর নীলাম্বরের ঘরের মাঝখানকার করিডোরটায়; করিডোরের দুটো মুখেই ভরত দুটো চটের পর্দা খাটিয়ে নিয়েছে। ভরতের স্থান এখানে নির্দিষ্ট হবার কারণ এখান থেকে এক-সঙ্গেই সে রায়বাহাদুর এবং নীলাম্বরের ফাই-ফরমাশ খাটতে পারবে, কার কখন দরকার পড়ে বলা তো যায় না। নীলাম্বর আবার একটা ইলেকট্রিক বেল বসিয়ে দিয়েছে, বেলটা ভরতের আস্তানার মধ্যে দেয়ালে বসানো, আর দুটো সুইচ— একটা তার নিজের ঘরে, অন্যটা বাড়ির সদর-দরজায়। ইলেকট্রিক বেলের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করেছে সে এই কারণে যে প্রায় প্রতিরাত্রেই বাড়ি ফিরতে নীলাম্বরের আড়াইটে তিনটে হয়, তখন এসে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করাটা বিশ্রি লাগে নীলাম্বরের।

একতলার হাওয়াটা কিন্তু অন্যরকম। দোতলার হাওয়ার দোলা নিচের ইট-কাঠ মৃদু ছুঁয়ে গেলেও চরিত্রটা তার আলাদা।

একতলার চারখানা ঘরের একখানা বিনতার, একখানা পূষনের, একটি রান্নাঘর এবং অন্য যে প্রকাণ্ড ঘরখানা কোনোকালে ভাঁড়ার বা স্টোর-রুম হিসেবে নির্দিষ্ট ছিলো সেটাকে এখন আর ভাঁড়ার ঘর বলা অনর্থক, কেননা সেটা এখন বুড়ি-চপলার এবং কয়েক শো আরশুলা-ইঁদুর-চামচিকের আস্তানা। এই প্রকাণ্ড ঘরটার অবস্থা আরো চমকপ্রদ এই হিসেবে যে ঘরখানা একটা চটের পর্দায় দু-অংশে বিভক্ত। একাংশে মস্ত একখানা মেহগিনির ছাপা-খাট, খাটটার ওপরে-নিচে টাল-দেওয়া কী যে আছে আর কী নেই তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া কঠিন—জাজিম, তোশক, কার্পেট, জরি-বসানো ভেলভেটের পর্দা, রুপোর ফরসি, সটকা, বোহেমিয়ান ঝাড়-লণ্ঠন, ওক্-কাঠের মহারানী ভিক্টোরিয়া, পাখির খাঁচা, সোনালি গিল্ড করা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আয়না, একটা প্রকাণ্ড অচল দেয়াল-ঘড়ি, বুনো হরিণের মাথা, ক্রুশবিদ্ধ যীশু, কারুকার্যখচিত কয়েকটি ফুলের ভাস, কয়েকখানা তৈলচিত্র, তুরস্ক-পারস্য-মডেল লাস্যময়ী মর্মর মূর্তি ইত্যাদি বিচিত্র সব জিনিসপত্র! তবে কিনা সবই এখন ঘন মাকড়সার জালের তলে সিকি-ইঞ্চি ধুলোর আস্তরণের নিচে সমাধিস্থ, সবই এখন ছেঁড়া-ভাঙা-রঙচটা। খাটটার পাশে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুকে বাসনপত্র তালাবন্দী। তার পাশে একটি বিলিয়ার্ড-বোর্ড—এরও ওপরে-নিচে স্তূপীকৃত জিনিসপত্র। আর তার পাশের মস্ত মাটির জালাটাতে কী-সব আছেন সে শুধু পরমা প্রকৃতিই জানেন। আরো আছে কয়েকটি মার্বেল পাথরের টেব্‌ল, সোফা-কাউচ-ডিভান, একটা প্রকাণ্ড কাঁচভাঙা আলমারি। অর্থাৎ সমস্ত অংশটা যেন ছোটোখাটো একটি জাদুঘর। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই জাদুঘরের ইতিহাস উদ্ধার করতে পারলে রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের খানদানী ঐতিহ্য আর অভিশপ্ত জীবনের বিচিত্র কাহিনী উদ্ধার করতে পারতেন।

বুড়ি-চপলা এ-ঘরটার এই অভিশপ্ত হাওয়াটার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে বোধ করি এইজন্যেই যে যদি কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক হঠাৎ এসে কোনোদিন হাজির হন এ-ঘরে তাহ'লে সে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে ও-পাশের ঐ-জিনিসপত্রগুলির প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে, ওর প্রতিটি জিনিসই তো বুড়ি-চপলার খুব ভাল ক'রেই চেনা।

এই প্রসঙ্গে বুড়ি-চপলা সম্বন্ধে আপাতত এইটুকু ব'লে রাখা যেতে পারে যে দেখতে থুরথুরি বুড়ি হ'লেও বয়স তার বড়ো জোর পঞ্চাশ এবং আজ থেকে বাইশ বছর আগে কুচবেহারে থাকতে রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দরের ঔরসে তার গর্ভে যে অবাঞ্ছিত সন্তান এসেছিলো, যে-সন্তান মানিক মুখোপাধ্যায় নামে জন্মাবধি শ্যামসুন্দরের অর্থে কলকাতার সরকারি অনাথসদনে লালিত-পালিত হ'য়ে অবশেষে এখন যে চঞ্চলকুমার নাম নিয়ে বাংলা দেশের চলচ্চিত্রে ভাঁড়ামির অভিনয় ক'রে জনপ্রিয়তার শিখরদেশে উত্তীর্ণ, সেই চঞ্চলকুমার যে বস্তুত তার মানিক-ই, এ-খবর বুড়ি-চপলা আজও রেখে থাকে।

ঘুমোতে চাইলেই যদি ঘুম আসতো তবে সংসারের পনেরো আনা দুঃখের হাত থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারতো। অবচেতন মনের কোঠায় নেমে যাবার জন্যে বিনতা গুটিসুটি লেপের তলায় ডুবে থেকে মনে-মনে একটা কুড়ুল দিয়ে ঘা মারতে লাগলো প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়িতে (নিদ্রাকর্ষণের এ-পদ্ধতিটা সম্প্রতি বিনতা জেনেছে প্রশান্তর কাছ থেকে), কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হ'য়ে যেতে লাগলো, এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা ঘণ্টা মনে হ'তে লাগলো, সমস্ত পৃথিবীটা ক্রমেই অসহ্য দুর্বিষহ মনে হ'তে লাগলো বিনতার কাছে, চোখ ফেটে তার কান্না পেতে লাগলো, অথচ কেন যে এই জ্বালা, কিসের এ যন্ত্রণা,

কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। শেষপর্যন্ত একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে সে উঠে বসলো— লেপটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে রইলো খাটের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে।

অন্তহীন শূন্যতা। অন্তহীন সময় যেন বিষধর একটা সাপের মতো ফণা তুলে নাচতে লাগলো তার মুখের কাছে, তার চেতনার অন্তরতম প্রদেশে। অবশ, আচ্ছন্ন, পাথর হ'য়ে ব'সে রইলো বিনতা।

চোখ পড়লো টেব্‌লের ওপরে কাঁচের জলপাত্রে রাখা ভার্বেনা ফুল-গুলির দিকে, ফুল পাতা সব শুকিয়ে কুঁকড়ে কী বিশ্রিই হ'য়ে আছে, জলটা বদলানো হয়নি আজ কতদিন মনেই করতে পারে না সে, ঘরের কোণে চারপাইয়ের ওপর রাখা চীনেমাটির টবে মেডেন-হেয়ারের গায়ে আটকে আছে একটা ন্যাকড়ার কানি, দেখলো সে। চমৎকার! সমস্ত গ্লানি অবসাদ প্রাণপণে ঠেলে সে উঠে যায় টবটার কাছে, পরম যত্নে ছাড়িয়ে নেয় ন্যাকড়াটা মেডেন-হেয়ারের গা থেকে, দূর ক'রে ছুঁড়ে দেয় সেটা জানালার বাইরে।

কিন্তু তারপর? আর কী করার আছে? বই এখন অসম্ভব। ঘর সাজানো? ঝাঁট দেবো ঘরটা? না কি পূষনের ঘরে যাবো?

সুন্দরমের সঙ্গে একটু আলাপ করলে কেমন হয়? অবশেষে ভাবতে পারলো সে এক-সময়। এবং এটা ভাবতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গিয়ে বিনতা তার টেব্‌লের দেরাজ খুলে টেনে বের করলো একটা খাতা। কলমটা বের করলো খুঁজে বইয়ের স্তূপের মধ্য থেকে এবং খাতা-কলম নিয়ে বিছানায় ফিরে এসে লেপটা বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হ'য়ে তার কাল্পনিক একটি মানুষের সঙ্গে আলাপ শুরু করলো।

ডায়েরি লিখবার প্রথম প্রেরণা পায় বিনতা তার কাকার কাছ থেকে সীমাচলমে থাকতে। তার বয়স তখন এগারো। তারপর থেকে

কখনো-সখনো নিয়ে বসে সে এই মোটা বাঁধানো খাতাখানা, নিজের মনটাকে খুলে দেয় এই গোপন মহাসমুদ্রের বুকে। অবিশ্যি সুন্দরম নামে একটি কাল্পনিক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তার মনে মাত্র মাস দুই আগে। এই কাল্পনিক পুরুষটিই তার সাম্প্রতিক জীবন-দেবতা। এঁর কাছে সে নিজের ইতিহাস বলা শুরু করেছে। এঁর কাছে তার সাম্প্রতিক মনের খবর জমা হচ্ছে।

তিরিশে জানুআরি, 'পঞ্চাশ।

সুন্দরম,

আজ কলেজে গেলাম না কেন জানো, ভীষণ গোলমাল হবার কথা আজ কলেজে। বৌবাজারে উদ্বাস্তু মেয়ে-পুরুষের এক মিছিলের ওপর কাল গুলি চালিয়েছে পুলিশ, আর তারই প্রতিবাদে আজ হাট-বাজার অফিস-কাছারি স্কুল-কলেজ সর্বত্র হরতাল। আজ আবার কতগুলো প্রাণ যাবে, কতগুলো সংসারে আগুন জ্ব'লে উঠবে কে জানে। জানিনে এ-সবের শেষ পরিণাম কী।

কিন্তু আমিই বা ঘরে ব'সে-ব'সে এ কী করছি। সমস্ত দেশটা ছন্নছাড়া হ'য়ে উচ্ছন্নে চলেছে দিনের পর দিন, কিন্তু আমি তার জন্যে কী করছি। আমার জন্মের ঋণ কি আমি শোধ করছি আমার দেশের কাছে, আমার সমাজের কাছে? জানি দুর্গেশ, তুমি বেঁচে থাকলে আমি এমন পঙ্গু, এমন অমানুষের মতো দিনগুলো [illegible] চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারতুম না। কিন্তু আজ যেন সে-শক্তিও আমার নেই সুন্দরম যে সব ছেড়েছুড়ে ফেলে দিয়ে, সমস্ত মায়ামমতা সাংসারিক পিছু-টান ঝেড়ে ফেলে আবার নেমে পড়ি পথে, আর যতটুকু পারি, যতটুকু আমার সাধ্য, সেটুকু পালন ক'রে পৃথিবীর কাছে আমার জন্মের ঋণটা শোধ ক'রে যাই।

পুষনের কাছে আজ কী লজ্জাই না পেলাম। সে আমাকে আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে আমি প্রতারণা করছি নিজের সঙ্গেই।

আচ্ছা বলতে পারো সুন্দরম, আমার জীবনভরা এত অভিশাপ কেন। দুর্গেশ আমাকে বলেছিলো, ভুল করছো বিনতা, এ-অভিশাপের জন্যে দায়ী তুমি নও, এ-পাপ সমাজের, [illegible] পেছনে দায়িত্ব ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক অবস্থার। বলেছিলে [illegible]ামন্ততন্ত্রের ভগ্নদশার মধ্যে তোমার জন্ম, সামন্ততন্ত্রের যে-পর্য[illegible] সব-চাইতে কলঙ্কময়, সব-চাইতে অভিশপ্ত, ঠিক সেই পর্যায়ের মধ্যে তোমার জন্ম— কী করবে, এ-অভিশাপের আগুনে তোমাকে যে পুড়তে হবেই। তবে যদি বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তোমার সত্য হয়, বাঁচতে যদি শিখতে পারো তুমি— বেঁচে যাবে তুমি। অনেক প্রায়শ্চিত্তের শেষে মস্ত বড়ো জীবন, প্রকাণ্ড উদার এক জীবন লাভ করবে।

দুর্গেশের কথা তোমাকে একদিন সব বলবো সুন্দরম। আজ তোমাকে শোনাই আমার সেই ছেলেবেলাকার কথা। সেই আশ্চর্য নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। ভদ্রসমাজে, বন্ধুবান্ধবকে তো সে-কাহিনী বলবার নয়। সে-কাহিনী শুনিয়েছিলাম একদিন দুর্গেশকে পার্বতীপুরে, আর এখন শোনাচ্ছি তোমাকে। এমনি ক'রে মনটা যদি তবু একটু হাল্কা হয়।

ভূতের বিভীষিকার মধ্যে কুচবেহারে আমার ছেলেবেলাকার অনেক কাহিনী তো বলেছি তোমাকে। সেই বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচালেন আমাকে কাকা। সীমাচলম থেকে এসেছিলেন বুঝি আমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতেই। ইংরেজি ছত্রিশ সাল সেটা। আমার বয়স তখন কত হবে— বছর দশেক। আমার তখনকার সেই আতঙ্কটাই স্পষ্ট মনে আছে, ঘটনাগুলো কেমন যেন সব আবছা আলগা হ'য়ে গেছে।

সে-বছর সমস্ত কুচবেহারময় একটা রাজকীয় উৎসবের হৈচৈ প'ড়ে

গিয়েছিলো। সে-উৎসব যে কিসের তখন তো অত বুঝিনি, এখন বুঝি আর কি! ইস্টার্ন স্টেট্‌স্‌ এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হবে কুচবেহার, বৃটিশরাজ-প্রতিনিধি হিসেবে আসবেন এক ইংরেজ প্রভু। পোলিটিক্যাল এজেন্ট।

তোমাকে তো বলেছি, সেই বছরই প্রথম বাবা মহারাজার শাসন-পরিষদে ঢুকতে পেরেছিলেন। মহারাজার চেলাচামুণ্ডাদের সঙ্গে মাকে আর দিদিকে নিয়ে অত শিকারে যাওয়া, প্রভুদের ভোগে অত পায়রা বিলিতি কুকুর আর মদের অর্ঘ্য কি বৃথাই যাবে! শাসন-পরিষদে ঢোকা উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে সেই ককটেল-পার্টির বিভীষিকার স্মৃতি আমরা তিন বোন তখনো ভুলতে পারিনি, বেশ মনে আছে। তোড়জোড় দেখে বুঝলাম এবার উৎসব হবে আরো সাংঘাতিক। তবে এবার শুধু আর আমাদের বাড়িতেই নয়, অনেক বাড়িতেই হবে। মহারাজার ফারমান জারী হয়েছিলো, আলোকসজ্জায় নাচে-গানে-উৎসবে রাজ্যের সর্বত্র সবাইকে মেতে উঠতে হবে এজেন্ট-সাহেবের অভ্যর্থনায়। উঃ, সে কী দাপাদাপি হুল্লোড়! এখনো হৃৎকম্প লাগে ভাবলে।

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন এসে হাজির সোনামামা। সোনা-মামা তখন চাকরি করতেন ডুয়ার্স চা-বাগানে। দু-মাসের ছুটি নিয়েছিলেন, যাচ্ছেন ঢাকায়। ঢাকা আমার মামাবাড়ি, তোমাকে বলেছি বোধ হয়। কুচবেহারে সোনামামা হাজির হলেন, আমাদের তিন বোনকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে, আর মা রাজি হ'লে মাকে আর দাদাকেও। আমার ছ'সাত বছর পর্যন্ত আমরা তিন বোন তো ঢাকায় মামার বাড়িতেই মানুষ। এক দাদা শুধু থাকতো মা-বাবার সঙ্গে। মা-বাবাকে আমি তো চিনলাম আমার সাত বছর বয়সে। বাবার এক কর্মচারী মা-র চিঠি নিয়ে হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির ঢাকায়, আমাদের তিন বোনকে যেতে হবে কুচবেহার। এবার থেকে নাকি আমাদের বাবা-মা'র কাছেই থাকতে

হবে। দিদিমা-দাদু আর মামা-মামিদের ছেড়ে যেতে আমরা নাকি এত কান্নাকাটি করেছিলাম যে বাধ্য হ'য়ে শেষপর্যন্ত দাদু-দিদিমা আর সোনামামাকেও আসিতে হয়েছিলো আমাদের কুচবেহারে পৌঁছে দিতে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, তাঁরা যেদিন এলেন কুচবেহারে তার পরের দিনই ফিরলেন ঢাকায়।

সে যা-ই হোক, সোনামামার হঠাৎ আবির্ভাবে আমরা সবাই বেশ নেচে উঠেছিলাম মনে-মনে, বেশ মনে আছে। তিন-চার বছর পরে এলেন সোনামামা, তাঁকে দেখে কী আশাটাই না হ'লো আমাদের মনে। আমরা বোনেরা আড়ালে বলাবলি করলাম, সোনামামার সঙ্গে চল আমরা পালিয়ে যাই ঢাকায়, আর আসবো না কখনো এখানে। কিন্তু কপা[illegible] যে আমাদের অশেষ দুঃখ লেখা ছিলো! অত সহজে কি মুক্তি মেলে!

বাবা তো দেখাই করলেন না সোনামামার সঙ্গে। আমা[illegible]র প্রকাণ্ড বাড়িটার যে-মহলে থাকতেন বাবা সেখানে যার-তার প্র[illegible]শের কোনো উপায়ই ছিলো না। বাবা তো তখন কুচবেহার-রাজ্যের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হ'য়ে বসেছেন। করতেন গাঁজা-আফিমের কারবার, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ওখানকার অশিক্ষিত আদিবাসী কোচদের খেপিয়ে-খেপিয়ে নির্বাচিত হলেন রাজ্যের আইনসভায়, আর এবার তো ঢুকে বসেছেন মহারাজার শাসন-পরিষদেই! সাধ্য কী এমন একটা জাঁদরেল লোকের সঙ্গে দেখা করতে পায় সোনামামার মতো একটা চা-বাগানেব কেরানি, ঢাকার একটা ইস্কুলমাস্টারের ছেলে! বেশ মনে আছে, মা-ও তখন বাড়ি ছিলেন না, মহারাজার এক শিকার-পার্টির সঙ্গে যেতে হয়েছিলো যেন কোথায়। মেজদি বললে, চল, আমরা এই ফাঁকে পালিয়ে যাই সোনামামার সঙ্গে। কিন্তু সোনামামা তাতে রাজি হলেন না। তাছাড়া বুড়ি-চপলার হাত এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াও

তো সম্ভব ছিলো না। ও তো ছিলো তখন বাবার প্রধানা দাসী! মা-কে পর্যন্ত ওকে তোয়াজ ক'রে চলতে দেখেছি তখন। দাদা তো এই বুড়ি-চপলার হাতেই মানুষ। সে যাক্ গে, সোনামামার সঙ্গে যাওয়া হ'লো না আমাদের।

মাঝখান থেকে হ'লো এই, আর-এক প্রস্থ প্রহার জুটলো কপালে। সোনামামাকে মা ঠিক কী ব'লে বিদায় করেছিলেন ভালো মনে পড়ছে না, তবে এটা বেশ মনে আছে, সোনামামার সঙ্গে মা-র বেশ ভালোরকম একটা কথা-কাটাকাটি হয়েছিলো। রাগারাগি ক'রে চ'লে গেলেন সোনামামা। তারপর, বেশ মনে আছে, দাদা গিয়ে লাগালো মা-র কাছে আমরা পালিয়ে যাবার মতলব করেছিলাম সোনামামার সঙ্গে। মা প্রথমেই এসে চুলের মুঠি ধরলেন মেজদির। দিদি যেন কেমন ছিলো, মা-বাবা যেমন-যেমন চাইতেন, ও মুখ বুজে তাই তামিল ক'রে যেত, মুখ ফুটে কথাটি বলতো না। কিন্তু মেজদি ছিলো অন্য ধাতের। বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না— মেজদি তেমন মেয়েই ছিলো না। চেঁচিয়ে চিৎকরিয়ে একাক্কার করতো। কাজেই মারধোরটা ওর ওপরই হ'তো একটু বেশি-রকম। অবিশ্যি তোমাকে তো বলেছি সুন্দর, আমাদের এক বোন মার খেতে থাকলে অন্য দু-জন পালিয়ে দূরে থাকতুম না, একেবারে কাছাকাছি থেকে অন্যজনের শাস্তির পরিমাণটা লাঘব করার চেষ্টা করতুম। না ক'রে পারতুম না যে।

এক, রাত্রিটাই ছিলো আমাদের সান্ত্বনা, আমাদের আশ্রয়। তিন বোনে একটা ঘরে জড়াজড়ি ক'রে শুতুম আমরা। চুপি-চুপি কাঁদতুম। কিন্তু কখনো-কখনো ধরা প'ড়ে গেলে আর রক্ষে ছিলো না। মা মাঝে-মাঝে ঢুকে পড়তেন আমাদের ঘরে— তোমাকে বলেছি বোধ হয় ঘরে খিল দিয়ে শোবার অধিকার ছিলো না আমাদের, মা যেন কী একটা

সন্দেহ করতেন— তাই। এমনও অনেক দিন হয়েছে, আমরা সত্যিই ঘুমিয়ে আছি, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘরে ঢুকে প'ড়ে মা আমাদের চুলের মুঠি ধ'রে টেনে-টেনে তুললেন। চামড়ার চাবুকটা দিয়ে আমাদের শাসন করতে-করতে চেঁচাতে লাগলেন : এত ঢং শিখলি কোথায় মড়া, কে শেখায় এত শয়তানি! অথচ কী যে আমাদের শয়তানি তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতুম না। তা সত্ত্বেও চাবুক মেরে-মেরে আমাদের সমস্ত শয়তানি ঘুচিয়ে দিতেন মা।

সে যা-ই হোক, সোনামামা চ'লে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই একটি ঘটনা ঘটলো যা এতদিনকার সমস্ত অত্যাচার-অনাচারকে ছাপিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সন্ধের সময় বাবার মহলে আমাদের তিন বোনের ডাক পড়লো। ভয়ে আতঙ্কে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কেঁপে উঠলুম আমরা। বাবা অন্দরমহলে এলে ঝি-চাকরের চাইতেও বোধ হয় আমাদের তিন বোনের আতঙ্ক হ'তো বেশি। অথচ বাবা কিন্তু আমাদের কোনোদিন মেরেছেন ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতেই গা শিরশির ক'রে উঠতো আমাদের। অবিশ্যি আমরা তাঁর দেখাই বা এমন কি পেতাম, হয়তো সপ্তাহে দু-বার-একবার। দিদিকে অবিশ্যি মাঝে-মাঝেই যেতে হ'তো মা-বাবার সঙ্গে এখানে-সেখানে, পার্টিতে, শিকারে। কিন্তু দিদির আতঙ্কও আমাদের চাইতে বেশি বৈ কম ছিলো না। আরো একটা কথা মনে পড়ে, আমার আতঙ্ক হ'তো সবচেয়ে বেশি যখন বাবা দু-এক সময় আবার আদর করতেন আমাদের! কথা নেই বার্তা নেই, হয়তো হঠাৎ জিগ্যেস ক'রে বসলেন কেমন-একটা বিশ্রি ভঙ্গি ক'রে : এই, এই খুকি, কী যেন তোমার নাম, অ্যাঁ!

উত্তর যোগাতো না আমার।

মেজদি হয়তো ব'লে উঠলো পাশ থেকে : ওর নাম বিনতা।

বিনতা! বটে! হয়তো হোহো ক'রে হেসে উঠলেন বাবা। ফের জিগ্যেস করলেন: তা বিনতা দেবী, তুমি ককটেল বানাতে শিখেছো?

ককটেল কথাটা জানতাম। দিদি শিখিয়েছিলো। দিদিকে প্রায়ই বানাতে হ'তো কিনা।

কিন্তু ভালো ককটেল বানাতে পারে না ব'লে মা ওকে মারধোর করতেন আড়ালে। অথচ দিদির বয়স তখন চোদ্দ-পনেরোর কম তো না। ককটেল কথাটা জানতাম, তবু কোনো উত্তর যোগাতো না আমার!

ফের হয়তো প্রশ্ন হ'লো বাবার: জানো না, অ্যাঁ! আচ্ছা বলো তো ডিক্যাণ্টার কাকে বলে?

বাবার এমনি সব অদ্ভুত ব্যবহার ছিলো আমাদের সঙ্গে।

সেই বাবা আজ ডাক দিয়েছেন দিদির সঙ্গে আমাকে আর মেজদিকেও।

গেলাম। না-গিয়ে উপায় কি।

বাবার সেই মস্ত ঘরখানায় আমার আর মেজদির সেই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ প্রবেশ। কিন্তু ঘরখানার অনেক-কিছুই আমরা জানতাম। দিদি বলতো কিনা রোজ।

মেজদি কিন্তু আমাকে ভরসা দিচ্ছিলো খুব। ওর নিজেরই চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছে অথচ আমাকে ক্রমাগত ভরসা দিয়ে চলেছে: আরে দূর্, এত ভয় খাচ্ছিস কেন তুই। কী করবে, আমি আছি তো, কোনো ভয় নেই তোর।

যা-ই হোক, সেই সাংঘাতিক ঘরখানার মধ্যে ঢুকে দেখি খুব জাঁদরেল একটি লোক ব'সে আছে সোফা ঠেসে। ঘরের মধ্যে বাবা ছাড়া ছিলো আর দাদা। দাদা তখন স্কুলে পড়তো শুনেছি, বয়স ষোলোর মতো হবে তখন। মদ-টদ সেই বয়সেই বেশ চলতো। আমাদের সঙ্গে ওর

কোনো সম্পর্কই ছিলো না। আমরা যেন জানতাম— ছোটোসাহেব (ঝি-চাকর, কর্মচারীরা ওকে ছোটোসাহেব ব'লে ডাকতো) নামক জানোয়ারটি থেকে সব সময় দূরে পালিয়ে থাকতে হবে। সে যাক, যা বলছিলাম—

ঘরে ঢুকতেই বাবা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন : ও-দুটো কে? অ্যাঁ! ঐ ভিখিরি দুটো কে?

পরে বুঝেছিলাম আমাদের যেরকম সাজসজ্জা ক'রে যাওয়া উচিত ছিলো সম্মানিত অতিথির সামনে, সেরকমটা আমরা করিনি। দিদি অবিশ্যি বার-বার ক'রে বলেছিলো। দিদি নিজে সাজসজ্জা করেওছিলো, কিন্তু মেজদির পরামর্শে আমরা দু-জন যেমন ছিলাম তেমনি গিয়েই হাজির হয়েছিলাম। আর সেইটেই আমাদের অপরাধ।

সেই সাংঘাতিক মোটা লোকটা জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে : বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়ে সব। কী তোমাদের নাম খুকিরা?

প্রশ্নের অপেক্ষা মাত্র। মেজদি ঝটপট উত্তর দিয়ে দিলে : দিদির নাম সুনীতি, আমার নাম অনীতা, ওর নাম বিনীতা। দিদির বয়স পনেরো, আমার তেরো, ওর দশ।

মজা পেয়ে হেসে উঠেছিলেন বাবার বন্ধু। কিন্তু তিনি তো জানলেন না সে-হাসির জন্যে কী মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে!

ঘরের মধ্যে কখন মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্যই করিনি। বললেন পাশ থেকে : চলো, ভেতরে চলো সব।

ভেতরের মহলে আসতেই মা রণচণ্ডী মূর্তি ধরলেন। মেজদির চুলের মুঠি ধ'রে আদেশ করলেন : চাবুকটা আন তো নীলু। দাদা এসেছিলো পিছু-পিছু। দাঁত বের ক'রে হাসতে-হাসতে ও এনে দিলে চাবুকটা। আমাদের কাছে কিন্তু সেটা ছিলো না-হাসির, না-কান্নার। আমাদের কর্তব্য ছিলো শুধু মেজদির সঙ্গে-সঙ্গে থাকা, থেকে শাস্তির অংশ গ্রহণ করা।

কিন্তু মা-র বোধ হয় বেশি দোষ নেই— নিমিত্তেরই ভাগী হয়েছিলেন মাত্র। কেননা হাজার হোক, মা তো! নিজের হাতে স্বেচ্ছায় তিনি মেয়েকে খুন ক'রে ফেলবেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না। বোধ হয়, মেজদিরই দিন ফুরিয়ে এসেছিলো। কয়েক ঘা চাবুক খেয়েই (তার চাইতে অনেক বেশি চাবুক খেতে মেজদি অভ্যস্ত ছিলো) হঠাৎ একটা আর্তনাদ ক'রে নেতিয়ে পড়লো মেজদি।

ডাক্তার ডাকা হয়নি। কেননা সময়মতো ঠিক বুঝেই ওঠা যায়নি ব্যাপারটা। আর যখন বোঝা গেল, তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে।

এমনি একটা অদ্ভুত ঘটনায় মা, দেখলাম, কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। এর পর থেকে তিনি আমাদের দিকে তাকাতেন কেমন যেন ঘোলা-ঘোলা চোখে। আমাকে, দিদিকে আর সেই চাবুকটাকে এড়িয়ে চলাই তারপর থেকে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হ'লো।

আমাদের সঙ্গে বাবার ব্যবহারও একটু বদলে গেল এ-ব্যাপারটায়। আমাদের দেখে এর পরে আর হেসে উঠতেন না তিনি, এইটেই বেশ মনে আছে। আর হ'লো এই, অন্দরমহলে তাঁর যাতায়াত আরো ক'মে গেল।

যতদূর মনে পড়ে মা-র অত্যাচার থেকে বাঁচলুম ব'লে আমরা, মানে আমি আর দিদি, কোনোরকম ভরসা পাইনি। মুক্তির নিশ্বাস ফেলিনি। মেজদি ম'রে গেল ব'লে কাঁদতুমও না, কেননা কান্নাটা আসতোই না আর। তবে এইটে বোধ হয় সব সময়ই মনে হ'তো আমাদের যে, পৃথিবীতে আমরা তিনজন ছিলাম, এখন দু-জন হয়েছি।

এই সময় এলেন কাকা।

আমাদের যে একজন কাকা আছেন, এর আগে আমরা জানতুম না। ঢাকা থেকে কুচবেহার এসে একবারের জন্যেও কোনোদিন কারো কাছে তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা শুনিনি।

বাবা আর কাকা যে সত্যিই সহোদর ভাই, এ-কথাটা ভাবতে আমার এখনো অবাক লাগে। একজন শয়তান, একজন দেবতা। হ্যাঁ, কাকাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই এ-কথা আমার মনে হয়েছিলো।

কিন্তু আজ এ-পর্যন্তই থাক সুন্দরম, কেমন? মেজদির কথা, দিদির কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আজ এতদিন পর আবার মনটা এমন খারাপ লাগছে কেন বলো তো। কত কথাই তোমাকে বলার আছে আমার! জানিনে আমার মতো হতভাগ্য মেয়ে বাংলাদেশে আর ক'টা আছে। কী সাংঘাতিক এই সমাজ, কী কুৎসিত নোংরা এই জীবন। না না, সুন্দরম, মাঝে-মাঝে যখন ভাবি, একটু চোখ খুলে দেখি সংসারের এই আবর্জনা, এই সংস্কার, এই ঈর্ষা, খাওয়া-খাওয়ি কামড়া-কামড়ি— তখন আর বাঁচবার ইচ্ছে থাকে না আমার। মৃত্যু, মৃত্যুই আমার পরম কাম্য। হ্যাঁ সুন্দরম, তুমি মিথ্যে, তুমি অলীক মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নও। মৃত্যু, শুধু মৃত্যুই সত্য।

থাক, থাক দুর্গেশ, তোমার ও-সব তত্ত্বকথা রেখে দাও। ও-সব বুলি আমি অনেক শুনেছি। না না, আমি তোমাদের অলীক জীবনবেদ মানিনে। মিথ্যে মিথ্যে, ভুয়ো সব।…

লিখতে-লিখতে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিলো বিনতা। কেমন ক'রে যেন মনের ভারসাম্যটাই তার নষ্ট হ'য়ে গেল। বিশ্রি একটা অবসাদে ভেঙে প'ড়ে কলমটা ঠেলে দিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

দুপুর কেটে গিয়ে তখন বিকেল নেমেছে।

অবসন্ন শিথিল দেহ-মনে উঠে পড়লো বিনতা।

একে মাঘের বিকেল, তার ওপর ধোঁয়াটে মেঘ জমেছে আকাশে। সবে এখন চারটে বেজেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে রাত পড়তে আর বাকি

নেই। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছে, আলনা থেকে স্কার্ফটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালো বিনতা। সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললো। কিন্তু কই, আলোর দীপ্তি ফুটলো না তো ঘরে! বিবর্ণ আলোর দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত মুহ্যমান হ'য়ে রইলো বিনতা, আর শেষে হঠাৎ যখন গা-মাথা গুলিয়ে উঠে বমি-বমি লাগলো তার, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ত্বরিত পায়ে স'রে এসে দরজাটা খুলে দিলো ঘরের।

দরজা খুলে বাইরে চোখ পড়তেই একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল সে। ঘরের বাইরে বারান্দার ওপর উবু হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছেন সারদা।

কী হয়েছে? এমন ক'রে ব'সে আছেন কেন মা? বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগলো বিনতার। ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে, মা-র মুখখানা দু-হাতে তুলে ধ'রে জিগ্যেস করে, কী হয়েছে মা, তুমি এমন ক'রে ব'সে আছো কেন এখানে, আমাকে ডাকোনি কেন, এমন ক'রে দরজার বাইরে—

না, এ-সব বলতে পারবে না বিনতা। বললে এখন অসহ্য ন্যাকামি শোনাবে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে মায়ের পিঠের ওপর আলগোছে একখানা হাত রেখে ব'সে পড়লো বিনতা, অপরিসীম উদ্বেগে বললো, 'কী হয়েছে মা?'

সারদা শুকনো গলায় বললেন, 'পীতুকে পাঠিয়েছিলাম আফিং আনতে। সেই বেলা দুটোর সময় গেছে, এখনো আসছে না যে— '

ধক্‌ ক'রে ওঠে বিনতার বুকের মধ্যে। একটু থমকে থেকে শেষে বললে, 'কেন, ওকে পাঠালে কেন, ভরতের কী হয়েছে?'

চুপ ক'রে রইলেন সারদা। মেয়ের কাছে একথা বলতে তাঁর বাধলো

যে, ভরতকে আফিম আনতে বলায় সে টেরি বাগাতে-বাগাতে পরিষ্কার জবাব করেছিলো যে তাকে এখন বড়দাদাবাবুর জন্যে হুইস্কির ধান্দায় যেতে হবে চৌরঙ্গি, আফিমের দোকানে গিয়ে এখন যদি তাকে লাইন লাগাতে হয় তাহ'লে হুইস্কি আনার নাকি আর সময় থাকবে না, আর তাহ'লে বড়দাদাবাবুর জুতো খেতে হবে তাকে, কাজেই কর্তাবাবুর আফিমটা আজ ছোড়দাদাবাবু এনে দিক।

মাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অতিষ্ঠ লাগলো বিনতার, বিরক্ত গলায় বললে, 'আর তাছাড়া আজ তো দোকানপাট সব বন্ধ, হরতাল, এর মধ্যে আফিং-এর দোকান খোলা থাকবে?'

'কর্তার আফিং যে আজ একটুও নেই ঘরে—' অস্ফুটে বলেন সারদা।

'তা আগে থাকতে সেটা খেয়াল থাকে না, কালও তো আনিয়ে রাখতে পারতে! প্রতিটি ব্যাপারে এ-বাড়িতে সব অদ্ভুত ব্যবস্থা! বাড়িতে চাকর রয়েছে, ঝি আছে, আফিং এনে দেবার আর লোক পাওয়া গেল না! গণ্ডগোলের ভয়ে স্কুলে পর্যন্ত— '

সহসা থমকে গেল বিনতা মায়ের মুখের দিকে নজর পড়তে। হঠাৎ উত্তেজনায় মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলো সে, এতক্ষণে খেয়াল হ'লো মাকে এমন কটু কথাগুলো শোনানোটা ঠিক হচ্ছে না। চুপ ক'রে গিয়ে গুম হ'য়ে ব'সে রইলো সে কতক্ষণ সদরের হাঁ-করা খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে শাদা একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো সদর-দরজার মুখে। দাঁড়িয়েই রইলো মূর্তিটি গলির দিকে মুখ ফিরিয়ে। ফ্যাঁসফ্যাঁস ক'রে কী যেন বললেন সারদা অস্ফুটে। বিনতা প্রতীক্ষায় রইলো একটু, আর শেষে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী বুড়ি-মা, খোঁজ-টোঁজ পেলে কিছু?'

জরা-জীর্ণ কুব্জদেহ বুড়ি-চপলা এবার সদর ছেড়ে এগিয়ে এলো সরু প্যাসেজটা পেরিয়ে রোয়াকের ওপর বিনতা ও সারদার কাছে। কোমর ভেঙে ব'সে প'ড়ে ককিয়ে উঠলো সে, আতঙ্কে ছাঁনি-পড়া অদৃশ্যপ্রায় চোখ দুটো তার ঠিকরে যেন বেরিয়ে যাবে, হাঁপাতে-হাঁপাতে বলতে লাগলো, 'কী অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখলাম রে মা···হায় কপাল, এ কী নরক দর্শন করালে মা···হে মা তারা···আঃ আঃ, ঘোর কলি মা, ঘোর কলি—' বুক চেপে ধ'রে হাঁপাতে থাকে বুড়ি-চপলা।

'কী হয়েছে সেইটে বলো না স্পষ্ট ক'রে।' ধমকেই উঠলো বিনতা।

'আরে মা-রে-মা, পষ্ট একেবারে পেত্যক্ষ দেখে এলাম গা মা, ছেলেটাকে থেঁৎলে-থেঁৎলে মারলে এই থান-ইট আর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে! সে কী দিশ্য মা— '

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো বুড়ি-চপলা, অস্পষ্ট ভাষায় আপন মনে আর্তনাদ করতে লাগলো কপাল চাপড়ে।

বুড়ির রকম দেখে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে সারদার আর বিনতার। বিনতা তো খানিক থমকে থেকে শেষে তীব্র কটু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'চুপ চুপ বুড়ি—'

থতমত খেয়ে চুপ হ'য়ে গেল বুড়ি-চপলা ঘাড় গুঁজে।

'পূষনের দেখা পেয়েছো? খোঁজ পেলে কিছু?'

'না রে মা—'

'তবে কী বলছিলে মাথামুণ্ডু! কে কাকে মারলে বুড়ি-মা?'

গুমরে-গুমরে ফের কান্না শুরু হ'লো বুড়ি-চপলার। সেই কান্নার মধ্যে বিড়বিড় ক'রে কী-সব বলতেও লাগলো, কিন্তু তার দুটি-একটি কথা ছাড়া বিনতা আর কিছুই বুঝলো না।

সারদা এতক্ষণ প্রায় নির্বাক ছিলেন, এক-সময় বুড়ি-চপলার কথার

মধ্যে ব'লে উঠলেন, 'একের দোষে অপরকে সাজা দিয়ে কী লাভ হবে—'

বিরক্তিতে সারা শরীর জ্ব'লে যাচ্ছিলো বিনতার। এবার সারদার দিকে ঘুরে ব'সে বললো, 'বলো তো মা কী হয়েছে, তুমি তো বেশ বুঝতে পারছো দেখছি বুড়ির কথা।'

'দাঙ্গা, মা দাঙ্গা লেগেছে আবার, তাই বলছে। বরিশালে হিন্দুদের ঘরবাড়ি নাকি সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলমানরা, আর সেই খবর এখানে আজ আসতেই দুপুর থেকে এখানেও হিন্দুরা মারছে মুসলমানদের, সেই কথা বলছে।' এক নিশ্বাসে কথা ক'টি ব'লে ফেললেন সারদা, আর-কিছু বলবার তিলমাত্র শক্তিও যেন তাঁর অবশিষ্ট রইলো না, তবু হাঁপানী রুগীর মতো চোখ খাড়া ক'রে বুক-খালি-করা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সারদা, 'পীতুর কোনো খোঁজ-টোজ নিবি না বিনু?'

এমনি সময় ঝড়ের মতো এসে উদয় হ'লো ভরত। ডাকাত পড়েছে যেন বাড়িতে এমনি ত্রাসের সঞ্চার ক'রে পরিত্রাহি গলায় চেঁচাতে-চেঁচাতে সদর থেকে সে এক-লাফেই কয়েক হাত পেরিয়ে একেবারে উঠোনের মধ্যে এসে পড়লো, হাতে তার কাগজেমোড়া হুইস্কির বোতল। উঠোনের ওপর এসে গিয়েও তার বিপদ যেন কাটেনি, তখনো সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ব'লে চলেছে, 'ব্বাপ্‌স্‌, জান মার ডালা শালা, শালা খুন নিকলা দিয়া, শালা ডাকু লুটেরা খুনী হ্যায়—' বলতে-বলতে সহসা হুঁস হ'লো তার বিনতাও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, আর সেইটে খেয়াল হ'তেই নিমেষের মধ্যে ভরত অন্য মানুষ। পলকের মধ্যে নিষ্প্রাণ নিরীহ একটি কাষ্ঠপুত্তলিকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভরতের অমনি হৈ-হল্লা ক'রে বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির হাওয়া উল্টে গেছে। বিনতা উঠে প'ড়ে ঝড়ের বেগে গিয়ে ঢুকলো

নিজের ঘরে, বিস্রস্ত শিথিল শাড়িটা আঁট ক'রে নিলো, চটিটা কোনোরকমে পায়ে গলিয়ে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

কানা গলিটা ছাড়িয়ে বিনতা বড়ো রাস্তায় পা দিতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা উন্মেষের সঙ্গে। কী করবে কোথায় যাবে, এই রাক্ষুসে কলকাতা শহরের কোথায় এখন পূষনের খোঁজ করতে যাবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিলো না বিনতা। ভয়ে তার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ উন্মেষকে সামনে পেয়ে গিয়ে তবু যেন একটা সহায় জুটে গেল তার। উন্মেষের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কোথায় চলেছেন এদিকে?'

'আরে আপনি যে, কী আশ্চর্য—' সস্মিত ভদ্রতায় উন্মেষও দাঁড়িয়ে গেল।

'এদিকে কোথায় চলেছেন? দেখুন, আমি ভয়ানক এক বিপদে পড়েছি— আপনি কি কোনো বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন কোথাও?'

বিনতার অবস্থা দেখে উন্মেষ অবাক। অত্যন্ত রাশভারী ধীর স্থির শক্ত প্রকৃতির মেয়ে ব'লেই জানে তাকে। খুব একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকলেও সতীর্থা বিনতাকে বাইরে থেকে যতটুকু দেখেছে জেনেছে সে, তার সঙ্গে এখনকার এই বিনতার যেন কোনো মিল খুঁজে পেলে না। এমনি বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত, কথা বলতে গলা কেঁপে যাচ্ছে, চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো, গায়ে স্কার্ফটা এমন গুটিসুটি জড়িয়েছে যে কেমন যেন আশ্চর্য অসহায় দেখতে লাগছে মেয়েটিকে। উন্মেষ বললে, 'কী হয়েছে বলুন তো?'

বিনতা বললে পূষনের কথা। বলতে-বলতে তার অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। শেষে বললে, 'আচ্ছা থানায় একটা খবর দেয়া উচিত— না? হাসপাতালগুলোতেও খবর নিতে হয়— তাছাড়া এখন আর কোথায় খুঁজি বলুন তো।'

কী বলবে, কেমন ক'রে কী সাহায্য করবে বিনতাকে, ভেবে পায় না উন্মেষ। বিপন্ন নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো সে।

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে সেখানে এসে হাজির ভরত। 'এই যে দিদি আপনে, পেয়েছেন কোনো তালাস ছোড়দাবাবুর?' অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে ভরতও।

'না, কিচ্ছু না—' ভরতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো বিনতা, 'কী করি বলো তো ভরত! আচ্ছা তুমি আফিং-এর দোকানটায় একটু খোঁজ নিয়ে আসবে? আমি এদিকে থানা আর হাসপাতালগুলো—'

বিড়বিড় ক'রে বকতে-বকতে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে ভরত হাতিবাগান বাজারের দিকে।

'থানাটা, থানাটা কোনদিকে যেন?···হ্যাঁ, ঐ রাস্তাতে হবে, চলুন—' প্রায় ছুটতে শুরু করে বিনতা।

হতভম্ব, অবাক উন্মেষও পাল্লা দিয়ে পাশে-পাশে রইলো বিনতার।

'আচ্ছা, আপনাকে যে ধ'রে নিয়ে চলেছি—' একসময় বিনতা কিন্তু খেয়াল ক'রে ব'লে ওঠে, 'আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো? তাহ'লে না হয়—'

'আরে না না— চলুন চলুন, ক্ষতি কিচ্ছু না— এমনি যাচ্ছিলাম এক বন্ধুর— ঐ যে, ঐ তো থানা।'

অনেক সঙিন বন্দুক এবং লালাসিক্ত কৌতূহলের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে থানার ছোটো দারোগা ছোটোবাবু পর্যন্ত পৌছতে বিনতা ধৈর্য্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। ছোটোবাবুর বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি মনে হয় না, কিন্তু লোকটির চোখের চাউনি, ঠোঁট আর থুত্‌নির চেহারা আর চওড়া চর্বিচর্চিত হলদে মুখখানায় মদমত্ত প্রভুত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে এরি মধ্যে। এঁরই সঙ্গে তাকে কথা বলতে

হবে, এঁর কাছেই নাকি ডায়েরি করতে হবে তার খবর। দুটি ভীষণ-দর্শন সেপাইকে নিয়ে লম্বা বেত-হাতে ছোটোবাবু জীর্ণ-শীর্ণ খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা-মুখ লুঙ্গি আর ফতুয়া-পরা এক প্রৌঢ় আসামীকে সায়েস্তা করতে ব্যস্ত ছিলেন। একটি কেরানির সাহায্যে বিনতা আর উন্মেষ ভিতরে হলঘরের পাশের ছোট্টো ঘরটির দোরগোড়ায় এসে যখন দাঁড়ালো, ছোটোবাবু তখন ক্রূর তির্যক দৃষ্টিতে বিনতা ও উন্মেষকে একবার চকিতে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে ইঙ্গিতে ওদের চেয়ারে বসতে ব'লে আবার আসামীর দিকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু ছোটোবাবুর রুচি আছে, তিনি আসামীটির ওপর এবার কিছুক্ষণ নীতিবাক্য বর্ষণ ক'রে সেপাইদের দিকে ইঙ্গিত করতেই একটি সেপাই আসামীটির ঘাড়ের কাছে ফতুয়াটা খামচি দিয়ে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে-টানতে হাজত-ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, এবার বলুন তো কী ব্যাপার আপনাদের—' ছোটোবাবুর কুৎকুতে চোখ-জোড়া কুমোরের চাকের মতো ঘুরে এলো এদিকে।

বিনতা কথাটা সংক্ষেপে বললো।

কিন্তু তা-ই কি হয়! ছোটোবাবুকে দু-কথায় কোনো ঘটনা বোঝানোর চেষ্টা ক'রে তাঁকে ঠকিয়ে বোকা বানানো যাবে না। সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা ক'রে-ক'রে যাচাই ক'রে নিয়ে ডায়েরিতে টুকে নিতে ছোটোবাবুর প্রায় আধ ঘণ্টাই লেগে গেল। তারপর 'এর জন্যে আর থানায় আসবার কী দরকার ছিলো। বোকা হাবা কি কচি খোকাটি তো আর নয় যে ছেলে-ধরায় ধ'রে নে যাবে—' ইত্যাদি ব'লে এমন একটি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন ছোটোবাবু যে বিনতা এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে রাগে-বিরক্তিতে জ্ব'লে উঠলো একেবারে, দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'তাহ'লে এতক্ষণ ধ'রে এত সব ধানাইপানাই করলেন কেন, যদি আপনাদের কিছু না-ই করার থাকে এ-বিষয়ে!'

আর-কেউ একথা মুখের ওপর ব'লে ছোটোবাবুর হাত থেকে পার পেতে পারতো কিনা সন্দেহ, বিনতা কিন্তু পেলো। কথাটা শুনে একবার ভ্রূকুটি করলেন ছোটোবাবু বিনতার দিকে, শ্যেনবঙ্কিম নিষ্পিষ্ট ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে আলগোছে বললেন, 'তা দুটো কথাবার্তা তো কইতেই হবে আমাদের এখানে এলেন যখন!' ব'লে সিগারেটে আগুন দিলেন ছোটোবাবু।

স্তম্ভিত হ'য়ে গেল বিনতা। উন্মেষ এতক্ষণ নির্বাক হ'য়ে শুনছিলো এদের কথাবার্তা আর বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠছিলো মনে-মনে। থানার ভেতরকার হাওয়া যে এত অস্বস্তিকর, এ-অভিজ্ঞতা তার এর আগে কখনো হয়নি। ছোটোবাবুর এই কথাটায় আর চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব হ'লো তার পক্ষে, বললে মৃদু কঠিন স্বরে, 'কী বললেন?'

কাঁধের একটা ভঙ্গি ক'রে উঠে পড়লেন ছোটোবাবু, ইংরিজিতে বললেন, 'আমাদের আরো কাজ আছে মশায়, আমরা ভ্যাগাবণ্ড নই। আপনাদের যদি আর কোনো কাজকম্ম না থাকে তাহ'লে যেতে পারেন—' ব'লেই গটগট ক'রে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আগুন জ্ব'লে যায় বিনতা ও উন্মেষের মনে। কিন্তু তারা কিছু বলবার ফুরসুৎ পাবার আগেই ছোটোবাবু নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেছেন ঘর থেকে। ক্রোধে অপমানে দু-জনেই থরথর কেঁপে উঠলো, কিন্তু খানিকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাই বলতে পারলো না কেউ।

'আসুন, চলুন তো ও-ঘরে, আমি ছাড়বো না ওকে, মগের মুলুক পেয়েছে নাকি ও—' উন্মেষ বললো।

বিনতার চোখের জ্বলন্ত অঙ্গার এবার যেন দপ্ করে নিভে গেল, হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেছে আসল কথাটা, পূষনের কথা। কী-এক অশুভ অমঙ্গলের আশঙ্কায় সমস্ত শরীর-মন তার এবার অবশ হ'য়ে যেতে

লাগলো। মৃদু শ্রান্ত গলায় বললে, 'থাক, চলুন, এদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে—'

দুঃসহ গ্লানি আর উত্তেজনা নিয়ে বেরিয়ে এলো দু জনে রাস্তায়।

তারপর, যে-জন্যে এত ঝামেলা পোয়াতে হ'লো তার তো কিছুই কিনারা হ'লো না! আচ্ছা, ইতিমধ্যে পূষন্ যদি ফিরে এসে থাকে বাড়িতে? যদি কেন, নিশ্চয়ই এসে গেছে এর মধ্যে। সাতটা বাজে, এখনো ও বাইরে-বাইরে করছে কী?

দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে-হাঁটতে উন্মেষ স্পষ্টই অনুভব করতে লাগলো বিনতার অস্থিরতা। থানার ঐ আবহাওয়া, ছোটো দারোগার ব্যবহার, বিনতার এই বিপদ—এ-সবের জন্যে উন্মেষ ঠিক তৈরি ছিলো না, ঘটনা-গুলি একটার পর একটা এসে প'ড়ে তার মনের মধ্যে এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করলো। কী করবে এখন সে, কী বলবে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ পাশে-পাশে চলতে লাগলো বিনতার।

'আচ্ছা উন্মেষবাবু, হাসপাতালগুলোতে খবর নেবার কী করা যায়, ফোন করলে হয় না? গিয়ে-গিয়ে যদি খবর নিতে হয়—'

'চলুন-না, এই দোকানটাতে দেখি ফোন আছে কিনা।'

'থাক, দরকার নেই, যা হবার হোক।'

ফোন করতে হ'লে পয়সা চাই। কিন্তু বিনতার সঙ্গে এখন একটা পয়সাও নেই। তাই ফোনের কথাটা তুলেও পয়সা নেই খেয়াল হ'তেই বিনতা ফোনের আশা ছাড়লো। উন্মেষ বললে পয়সা তার কাছে আছে এবং না-হয় বিনতা সেটা কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ফিরিয়ে দেবে, ফোন ক'রে খবর নেওয়াটাই সুবিধে হবে। এই নিয়ে খানিক কথা-টানাটানির পরে উন্মেষ প্রস্তাব করলো— তবে বিনতা তার সঙ্গে তাদের বাড়িতে চলুক, তাদের ফোন আছে। তাই ঠিক হ'লো শেষপর্যন্ত।

গ্রে স্ট্রীট দিয়ে চলছিলো দু-জনে। ট্রাম-বাস গাড়িঘোড়া মানুষজনে সরগরম ব্যস্ত উর্ধ্বশ্বাস কলকাতা। এর মধ্যে লোকজনের চলতি কথাবার্তা থেকে হঠাৎ কানে এলো উন্মেষের— রাত আটটা থেকে কারফিউর অর্ডার হ'য়ে গেছে কয়েকটা এলাকায়। খবরটা রাস্তায় এখন সকলেরই মুখে-মুখে উড়ছে। গ্রে স্ট্রীটের এ-দিকটা মুসলমানশূন্য ব'লে এদিকে কোনো গোলমাল নেই, গোলমালের খবরটা তাই দশগুণ হ'য়ে পৌচেছে এদিকে। হাওয়ায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আক্রোশ আর উত্তেজনা দাউদাউ জ্বলছে। কোন-কোন এলাকায় কারফিউ হবে সে-খবরটা সংগ্রহের চেষ্টা করলো উন্মেষ, কিন্তু বৃথা, একজনের খবরের সঙ্গে অন্যজনের মিল হয় না। চারদিকের উত্তেজনার আঁচে বিনতা ক্রমেই বেশি ভেঙে পড়তে থাকে। হঠাৎ শোনা গেল রেডিওর ঘোষণা। দাঙ্গা-সম্পর্কে সরকারি খবরাখবর আর কোন-কোন এলাকায় কারফিউ হবে তার বিবরণ। বিনতা আর উন্মেষের বাড়ির মধ্যবর্তী রাস্তাটা কারফিউর আওতায় পড়ছে না— বিনতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

উন্মেষের বাড়িতে যাবার আগে বিনতা বললে, 'চলুন, বাসাটা একবার দেখে যাই, যদি ফিরে থাকে এর মধ্যে—'

গলির মুখেই পাওয়া গেল ভরতকে। বিনতাকে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠে সে এগিয়ে এলো। অধীর অস্থির গলায় জানালো, সম্ভব-অসম্ভব সর্বত্র সে খুঁজে দেখে এসেছে কিন্তু ছোড়দাদাবাবুর কোনো সন্ধান মেলেনি। ইতিমধ্যে প্রশান্তবাবু এসেছিলেন, মা-র মুখে সব শুনে ব'লে গেছেন হাসপাতালগুলিতে তিনি সব খবর নিয়ে দেখবেন। আর কর্তাবাবু এদিকে আফিম আফিম ক'রে ভয়ানক অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।

'কী করি বলুন তো—' বিনতা বললে অস্থির গলায়, 'প্রশান্ত যখন হাসপাতালে খোঁজ নেবে তখন আমি আর খোঁজ নিয়ে কী করবো—'

উন্মেষ কিছু বললো না।

কী করা উচিত না-উচিত কিছুই ভেবে উঠতে পারে না বিনতা। কিছুক্ষণ এলোমেলো উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নেবার পর শেষে আবার উন্মেষের বাড়ি যাওয়াটাই তার ভালো মনে হ'লো। বললে, 'তাহ'লে ভেতরে আসুন, মাকে একটা কথা ব'লে যাই।'

'আপনি ব'লে আসুন-না, আমি এখানেই দাঁড়াই।'

'এখানেই দাঁড়াবেন? আচ্ছা—'

পাগলের মতো একরকম ছুটেই চ'লে যায় বিনতা সরু গলিটার ভেতরে। ভরতও যায় পেছন-পেছন।

খোলা সদর-দরজার চৌকাঠের ওপর মাথায় হাত দিয়ে সারদা অন্ধকারের মধ্যে একা ব'সে আছেন। বিনতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শীর্ণ শুকনো ঠোঁট দুটি তাঁর অন্ধকারের মধ্যে একটু কেঁপেই থেমে গেল, জিভের কোণে একটা কামড় পড়লো। আর বিনতা যখন তাঁকে একটি কথাও না ব'লে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তখন আর সারদার দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্যও অবশিষ্ট রইলো না, হাঁটু দুমড়ে মাথা ঘুরে ব'সে পড়লেন।

ভরত দাঁড়িয়ে ছিলো স্থির হ'য়ে বাইরে সারদার সামনে। বিনতার এমনি ব্যবহারে ভয়ানক রাগ হ'য়ে যায় তার। সে অবিশ্যি এই অদ্ভুত পরিবারের মানুষগুলোর রকম-সকমে আজকাল আর অবাক হয় না, এরা কে যে কী প্রকৃতির ভরত তা আজ আর বুঝবার চেষ্টাই করে না। কিন্তু তবু, বিনতার এমনি আচরণ ভয়ানক বিশ্রি লাগে ভরতের। সারদার সামনে হাঁটু মুড়ে ব'সে সে তখন আশ্বাস দিতে লাগলো, জোর গলায় তার এই বিশ্বাস বার-বার জানাতে লাগলো যে, ছোড়দাদাবাবুর কোনো বিপদ হয়নি, হ'তে পারে না। সারদা অনর্থক এত ভাবনা করছেন।

একটু পরেই বিনতা বেরিয়ে গেল। ঝড়ের মতোই গেল সে। সারদার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। যেতে-যেতে শুধু জানিয়ে দিলো, 'আমার ফিরতে দেরি হবে ভরত।'

বাসায় এসে মায়ের সঙ্গে হঠাৎ এমনি আচরণ সে ক'রে বসলো কেন, তা অবিশ্যি বিনতা নিজেও বলতে পারবে না।

'চলুন উন্মেষবাবু। আর খবর নিয়েই বা কী হবে— ছিলো একটা ভাই, তা-ও সহ্য হ'লো না, তাকেও খেলে। মাঝখান থেকে আপনার ভোগান্তি— আসুন ঐ ট্রামটা ধরি।'

হাতিবাগানের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে বাসে চেপে চ'লে এলো বাকি রাস্তাটা। সমস্ত রাস্তাটা বিনতা একেবারে গুম হ'য়ে রইলো। উন্মেষও চুপ। কিন্তু তাই ব'লে রাজধানীর হাওয়া চুপ হ'য়ে নেই, হাওয়ায় লেগেছে তোলপাড়, আশপাশে সর্বত্র মানুষের নিশ্বাসে বইছে আগুন। সে-আগুন শুধু দাঙ্গারই নয়। আজকে ছিলো সাধারণ হরতালের ডাক। সরকারি গোলা-বারুদ ব্যাটন-বেয়নেট সে-ডাককে বোবা ক'রে দেবার দায়িত্বে ত্রুটি রাখেনি। আজকের রক্তারক্তির প্রধান দৃশ্যটা দেখা গেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তারই ঢেউ এখন রাস্তায়-রাস্তায়, আকাশে-বাতাসে, মানুষের মনে। ট্রাম-বাস, ছোটো-বড়ো মিছিল আর জটলার মুখে সে-ঢেউ আটকে-আটকে যাচ্ছে।

বিডন স্ট্রীটের মোড়ে বাস থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হ'লো ওদের।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন নীরজা আর ঘূর্ণি। মা আর মেয়ে যে ওখানে উন্মেষেরই জন্যে প্রতীক্ষারত তা-ও বোঝা গেল। কেননা উন্মেষের মূর্তিটি গোচরে আসতেই ঘূর্ণি আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐ যে শ্রীমান!'

'ওমা, ও-মেয়েটা আবার কে সঙ্গে? কে গো মা, চেনো নাকি—'
বলতে-বলতে এক ছুটে ঘূর্ণি সিঁড়ির মুখে এসে থামলো।

উন্মেষ কিন্তু ঘূর্ণির কৌতূহল মেটায় না। শুধু বলে, 'ছোটোমামা কই রে রিণি?'

'কে জানে।'

'আসুন—' বিনতাকে নিয়ে উন্মেষ এসে ঢোকে আদিত্যপ্রসাদের বসবার ঘরে। টেলিফোনটা এ-ঘরেই। কেউ ছিলো না সেখানে।

'বসুন।' একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে উন্মেষ প্রকাণ্ড টেব্‌লটার ও-পাশে ঘুরে গিয়ে ফোন-গাইডটা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

উন্মেষের বাড়িতে পা দিয়ে পর্যন্ত কেমন-একটু অস্বস্তি বোধ করছিলো বিনতা। ঘূর্ণি হতভম্ব চোখে পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো ঘরের মধ্যে, একটা চেয়ারের পিঠ ধ'রে সে সমস্ত ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বোঝবার চেষ্টায় রইলো। বিনতা ঘূর্ণির দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললো, 'দিন তো ওটা আমার কাছে।'

দ্বিরুক্তি না ক'রে এগিয়ে দিলো উন্মেষ ফোন-গাইডটা বিনতার হাতে।

কিন্তু পাতার পর পাতা নামের পর নাম দেখে-দেখেও প্রয়োজনীয় নাম্বারটা বিনতা বের করতে পারছে না। উন্মেষ লক্ষ্য করে বিনতার হাতের পাতা কাঁপছে, মুখ-চোখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। উন্মেষ বললে, 'আমার কাছে দিন-না, কী খুঁজছেন বলুন তো?'

'সর্বেশ্বর চ্যাটার্জি দেখুন তো পান কিনা।'

গাইডটা টেনে নিয়ে উন্মেষ নামটা বের ক'রে ফেললে। বিনতা টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখলে তাড়াতাড়ি নাম আর ঠিকানাটা। হ্যাঁ, এইটেই সে চেয়েছে। বললো, 'ধরুন তো নাম্বারটা।'

হাঙ্গাম হ'লো না উন্মেষের কানেক্শন পেতে।

রিসিভারটা উন্মেষের হাত থেকে নিয়ে নেয় বিনতা, সাড়া দিয়ে বললো, 'হ্যালো, প্রশান্ত আছে? প্রশান্ত?'

ভাগ্য ভালো বিনতার, পাওয়া গেল প্রশান্তকে।

কিন্তু যেটুকু খবর মিললো প্রশান্তর কাছ থেকে সেটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ, বিনতার বোধগম্য হয় না। প্রশান্ত সব হাসপাতালেই খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু পূষনের কোনো খোঁজ মেলেনি কোথাও। আসল খবরটা দেবার পরে প্রশান্ত সালঙ্কার ব্যাখ্যা সহযোগে বলতে যাচ্ছিলো যে, কারফিউ হ'য়ে যাবে ব'লে খবরটা সে পৌঁছে দেবার জন্যে বিনতার বাড়িতে আর যেতে পারেনি— কিন্তু ততক্ষণে বিনতা নামিয়ে রেখেছে রিসিভার।

'তারপর?'

উত্তরে উন্মেষ কী বলবে ভেবে পায় না।

'উঠি আমি। শুধু-শুধু ভোগালাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না উন্মেষবাবু।' বিনতা অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়ে, আর সে-কাতরতা যেন উন্মেষের ওপর অপরিসীম কৃতজ্ঞতাতেই।

ফিরে এলো বিনতা বাড়িতে। উন্মেষ অবিশ্যি তাকে তার অবস্থা দেখে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো ফের, কিন্তু বিনতা রাজি হয়নি। তাকে বাসে উঠিয়ে দিয়েই তাই ফিরেছে উন্মেষ।

সদর-দরজা হাঁ-হ'য়েই আছে। দরজার মুখেই কি কাছে-পিঠে কোথাও ব'সে থাকবেন মা এই ধারণাই ছিলো বিনতার। ল্যাম্প-পোস্টের মিটমিটে ঘোলাটে আলো-মাখানো গলিটা ছাড়িয়ে সদর-দরজার মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো বিনতা। সব নিঃঝুম, অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। আস্তে-আস্তে ঢোকে ভেতরে।

দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দেয়। কিন্তু খিল লাগায় না। সরু প্যাসেজটা পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকার, চারদিক অন্ধকার। ঐ তো, ঐ তো উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন সারদা পূষনের ঘরের সামনে বারান্দাটার ওপর। তবে কি—?

মুখ ঢেকে কাঁপতে-কাঁপতে বিনতা উঠোনের ওপর ব'সে পড়ে।

ছমছমে প্রেতচক্ষু রাত এখানে নিশ্চল, স্থির। শুধু সরব হ'য়ে রইলো একতলার বাথরুমে জলের কলটা। চৌবাচ্চার নলটা কলের মুখে লাগানো নেই, একটানা আছাড় খেয়ে-খেয়ে সমস্ত জলটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক-সময় আরো-একটা শব্দে উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে বিনতা। ভারী জুতোর শব্দ। নেমে আসছে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। ভারী গলা-ও একটা। ডাক্তার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় বিনতা। এগিয়ে আসে ডাক্তারের দিকে। ভরত ব'লে উঠলো ডাক্তারের পেছন থেকে, 'এই যে দিদি, কখন আসলেন? তালাস পাইলেন কিছু?'

'কী, পেলেন না কোনো খবর!' আক্ষেপের শব্দ করেন ডাক্তার।

অর্থহীন আবোলতাবোল আশ্বাস দিতে-দিতে চ'লে যান ডাক্তার। ভরত গেল পেছন-পেছন সদর পর্যন্ত। বিনতা স্থাণু নিশ্চল হ'য়ে রইলো।

ফিরে এসে ভরত বিনতার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক কথা ব'লে যেতে লাগলো। কর্তাবাবু ইতিমধ্যে আফিমের অভাবে মরতে বসেছিলেন। দরদর ক'রে জল বেরুচ্ছিলো চোখ দিয়ে, মুহুর্মুহু হাই আর হিক্কা উঠছিলো, কথা বলার শক্তি আর ছিলো না। সোডা স্বর্ণসিঁদুর খেয়ে-খেয়ে কিছুতেই আর বেদনা মরে না। শেষে বুড়ি-চপলার পরামর্শে ভরত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে এনেছে। এ-বাড়ির পুরনো পরিচিত ডাক্তার। তিনি এসে এখন মর্ফিয়া ইনজেক্‌শন দিয়ে বেহুঁশ ক'রে রেখে গেলেন।

বুড়ি-চপলা আছে কর্তাবাবুর ঘরে। আর মা তো সেই তখন থেকে ওখানে ভির্মি খেয়ে প'ড়ে আছেন।

'আচ্ছা দিদি, আপনেরে একটা কথা কই—' চাপা-গলায় কথা বলতে-বলতে ভরতের গলার স্বর কেমন-একটু বদলে যায় এবার, 'হেতে আপনে রাগই করেন আর যা-ই করেন। আচ্ছা, মায় যে অমনি প'ড়ে আছে মুখ থুবড়িয়ে, আপনের কি একটু উচিত হচ্ছে না মায়েরে এট্টু সান্ত্বনা দেওন কি দুইডা ভরসার কথা কওন? আপনের নয় ভাই, কিন্তু ওনারও তো প্যাটের সন্তান?'

দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মাথাটা ঘুরে ওঠে বিনতার। সমস্ত দেহটা তার নিষ্প্রাণ পাথর হ'য়ে গেছে। কোনোরকমে টলতে-টলতে সে এগিয়ে যায় সারদার দিকে। গিয়ে ব'সে পড়ে মুখ গুঁজে দুই হাঁটুর মধ্যে।

হাঁ-হ'য়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে ভরত ব্যাপারটা। দেখতে-দেখতে অস্থির হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ ভয়ানক রাগ হ'য়ে যায় তার। এ কী ভূতের রাজ্যে সে এসে পড়েছে রে বাবা। ইচ্ছে হয় তার চিৎকার ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয় চিৎকার ক'রে এই ভূতুড়ে হাওয়াটা ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ ক'রে দেয়। কিন্তু তার বদলে মাথায় তার আর-একটা বুদ্ধি আসে সহসা— দৌড়ে চ'লে যায় ঊর্মিলাদের বাড়ি।

খবর পেয়ে ঊর্মিলা এলো, এলো ঊর্মিলার মেজদা সন্তোষ।

ভরত তাড়াতাড়ি বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলো, পূষনের ঘরের আলোটাও জ্বেলে দিয়ে সবাইকে নিয়ে ঢুকলো সেই ঘরের মধ্যে।

কিন্তু যত চেষ্টাই করুক ভরত, সারদা কিছুতেই মুখ তুলে বসলেন না। ঊর্মিলার টানাটানিতে পূষনের ঘরের মধ্যে উঠে এলেন অবিশ্যি, কিন্তু এসেই বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে পূষনের বালিশটার মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রইলেন— যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বিনতা

মেঝের ওপর প'ড়ে রইলো আঁচলে মুখ গুঁজে। উর্মিলা এমনিতেই ভীতু দুর্বল স্বভাবের মেয়ে, এমনি অবস্থার মধ্যে সেই মেয়ে কিন্তু অন্যরকম হ'য়ে গেল। সন্তোষকে বিদায় দিয়ে জানিয়ে দিলো, সে আজ এ-বাড়িতেই থাকবে রাত্রে। বিনতার গা ঘেঁষে ব্যাকুল হ'য়ে ব'সে রইলো উর্মিলা।

'পূষনের দাদা কোথায় ভরত?' বললে উর্মিলা এক-সময়।

প্রশ্নটা শুনে কতকক্ষণ গুম হ'য়ে থাকে ভরত। কালো গোল মুখখানা তার কঠিন হ'য়ে উঠে, শেষে বিতৃষ্ণার ভাঁজ পড়ে ঠোঁটে গালে, বলে, 'বাড়ি নাই, তেনার বাড়ি ফেরোনের প্রেহর এখনো তো হয় নাই!'

আবার নীরব ক্লান্তিকর অসহনীয় শূন্যতা।

'আচ্ছা ভরত, বিনতা খেয়েছে কিছু রাত্রে?'

'হয় খেয়েসে!' মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে ভরত, 'আইজ চুলায় আগুন পরসে নি যে খাইবে!'

আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে ভরত। খিদেয় পেট তার জ্ব'লে যাচ্ছে। জ্বলুক। আজকের মতো জ্বলুক। কালই সে এই পোড়া-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে। তার কি দায় রে বাবা। গায়ে খেটে খাব তো তোর এই ভূতের বেগার খেটে মরি কেন রে বাপু।

উঠোনে খানিকক্ষণ অস্থির পায়ে পাক খেয়ে ফিরে এসে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বারান্দার একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে ভরত ব'সে পড়লো পা ছড়িয়ে।

ব'সে-ব'সে সে ঘুমিয়ে পড়লো বারান্দার ওপরেই। উর্মিলাও যে কখন বিনতার পাশে কাৎ হ'য়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল তা দেখার আর কেউ রইলো না।

পূষনের ঘরের হলদে আলোটা শুধু জেগে রইলো সারা রাত।

* * চা র * *

বিনতাকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে আসতেই দোতলার সিঁড়ির মুখে ঘূর্ণি পাকড়াও করলো উন্মেষকে। খর রসনায় ঝলসে উঠে বললে, 'কী যে কোথায় ফষ্টিনষ্টি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছো, কপালে তোমার দুর্ভোগ আছে আজ! যাও এখন জ্যাঠামণির ঘরে, দেখাবে 'খন! সেই দুপুর থেকে না-হ'লেও তিরিশ চল্লিশ বার তো খোঁজ নিয়েছেন, উনিশ এলো, উনিশ এলো। বাড়িসুদ্ধু সবাই ভয়ে আধমরা হ'য়ে যাচ্ছে আর ওদিকে শ্রীমান প্রেম ক'রে বেড়াচ্ছেন! কে ও-মেয়েটা?'

কথা বললো না তো, যেন একটা ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন তীব্রদাহে সাঁ-সাঁ ক'রে ভাপ ছাড়লো। এত উত্তাপ যে জমেছে ঘূর্ণির মনে, তার সংগত কারণ নেই বলা যাবে না। একেই তো দিন-সাতেক আগে সেই স্ট্রাইকের ব্যাপারটা নিয়ে হুটপাট লাগলো জ্যাঠামণি আর এই গঙ্গারামটার সঙ্গে, সেদিন থেকেই যেন কী-এক ভোজবাজি লেগে গেছে এ-বাড়িতে। আবোলতাবোল উটকো-মুটকো কাণ্ডকারখানা শুরু হ'য়ে গেছে— তার ওপর আজ সক্কালবেলাই হ'লো আবার আর-এক প্রস্থ। কথা নেই বার্তা নেই, হুট ক'রে শ্রীমান ব'লে বসলেন, এ-বাড়িতে থাকা আর পোষাচ্ছে না আমার, মেসে-হোটেলে কি দিদির বাড়িতে আমি থাকবার ব্যবস্থা কচ্ছি! এই না-হ'লে আর ব্যাটাছেলে! শুনে 'থ' হ'য়ে গিয়েছে ঘূর্ণি, ঘেন্নায় সিঁটকে গিয়েছে তার চোখ মুখ নাক। আজ বারো বছর পর্যন্ত যে-মামামামির কাছে এত বড়োটি হ'লে, আজ এক-কথাতেই তোমার পোষাচ্ছে না আর তাদের সঙ্গে! মুখে একটু বাধলো না পর্যন্ত কথাটা উচ্চারণ করতে! তবু রক্ষে, উদোটা একেবারে জ্যাঠামণিকেই ব'লে বসেনি কথাটা, মাকে বলেছে। আর

মা-টাও তেমনি! শুনে মুখটা ব্যাজার ক'রে রইলো! দেখে-শুনে আপাদমস্তক জ্ব'লে যায় ঘূর্ণির, ঐ ব্যাজারপনা তার দু-চক্ষের বিষ। হাঁড়ির মতো মুখ দেখলেই পিত্তি জ্ব'লে যায় তার। ফুটন্ত কড়াইতে পাঁচ-ফোড়নের মতো ফুটতে-ফুটতে চিড়বিড় করেছে ঘূর্ণি নীরজার কাছে। গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন তিনি ভাঁড়ারে। ঘূর্ণি বলেছে, 'আচ্ছা মা, তোমাদের ঐ গাম্ভীর্য-টাম্ভীর্য একটু কমাতে পারো, বাঃবা, বাঃবা! আমি যদি তুমি কি জ্যাঠামণি হতুম-না, তবে দেখতে এর ওষুধ! আমার কাছে বাবা হাতুড়ে-দাওয়াই, সক্কলের সামনে কানটি ধ'রে ছেলেকে ওঠ-বোস করাতুম গুনে-গুনে চোদ্দ বার, মুখে ঝামা ঘ'ষে দিতুম, আর শেষে জ্যাঠামণির সামনে নাকে খত্ দেওয়াতুম যতক্ষণ-না বলবে ও, মেসে-হোটেলে যাবার কথা মুখে আনবো না আর, বাঁদরামো করবো না আর—'

অত উত্তেজনা উসকানি সত্ত্বেও এমনতর কর্তব্যকর্মে উৎসাহ দেখা যায়নি নীরজার। বরং আরো গম্ভীর হ'য়ে গেছেন তিনি, খিচমিচ ক'রে ধমকে উঠেছেন মেয়েকেই। ধমক খেয়ে সপ্তমে চ'ড়ে গিয়েছিলো ঘূর্ণির মেজাজ। তার ওপরে আবার থেকে-থেকে ঘৃতাহুতি পড়েছে আজকের প্রতিটি ব্যাপারে। সক্কলের সঙ্গে আজ খিটিমিটি করেছে সে। উঃ, কী দিনটাই তার যাচ্ছে আজ, কার মুখ দেখে যে—। তবু হয়তো সব ভোগান্তির শেষ হ'তো যদি উনিশদা সমস্ত দিনটা নিরুদ্দেশ থেকেও নিরীহ ভালো-মানুষটির মতো কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে ফিরে আসতো, এসে না-হয় মিথ্যে ক'রেই একটা-কিছু কৈফিয়ৎ দিতো।

আঃ, তাহ'লে তো এই বিশ্রি উৎপাতটা, এই বিদঘুটে দম-বন্ধ-করা আবহাওয়াটা কেটে যেতে পারতো— আবার ফিরে আসতো সেই হাসি, জ্যাঠামণির সেই দিলখোলা মেজাজ, আর গঙ্গারামটার সঙ্গে তার অষ্ট-

প্রহরের খুনসুটি। কিন্তু আজ ক'দিন পর্যন্ত সে-সব চুলোয় গেছে। কোত্থেকে এলো এক স্ট্রাইক— হ্যাঁ ঐ স্ট্রাইক, ঐ স্ট্রাইকই যত অনর্থের মূল। রাগে গা জ্বলে যায় ঘূর্ণির এই স্ট্রাইকের কথা ভেবে। আজও তো এত গণ্ডগোলের মূলে ঐ স্ট্রাইক-ই। তার সঙ্গে লেগে গেছে আবার দাঙ্গা। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। আর এরি মধ্যে কিনা ও সেই দুপুর বারোটায় বেরিয়ে গিয়ে—

তা'তে বাড়ির আর সকলের তো ভারি ব'য়েই গেছে— যত মাথাব্যথা হয়েছে তার, জ্যাঠামণির আর মা-র। বাড়ির আর-কেউ বোধ হয় এত-শত জানেই না, বা জানলেও কি ও-সবের তোয়াক্কা রাখে! যে যার মনে আছে। আর সে? কলেজ যাওয়ার তো কথাই ওঠেনি; গিটারের ক্লাশ ছিলো সন্ধ্যায়, পাড়াতেই স্কুল, সেখানেও যায়নি। ক্লাবের পিংপং-এ আজ তার সেমি-ফাইনালের খেলা ছিলো, আর সে কিনা বিকেল চারটেরও পরে খবর পাঠিয়েছে আজ খেলতে পারবে না। বরাত! বরাত শুক্লা কুঠারীর, হয়তো ওয়াক-ওভারই পেয়ে যাবে। ছাদের ওপরে আলো জ্বালিয়ে ব্যাডমিণ্টন চলছে— মিনতি, পরিতোষদা, মিল্টন, ওরা সবাই এসে হাতে-পায়ে ধ'রে সাধাসাধি করেছে তাকে: বাড়িতেই যখন আছো ফরচুনেট্‌লি, তখন চলো-না একটু ব্যাডমিণ্টনই খেলি! কিন্তু বৃথা গেছে সে আবেদন। আর, এমনকি, শান্তনুদা এসেছিলো সন্ধের সময়, তার সঙ্গে পর্যন্ত একটু মুখ খুলে কথা বলেনি ঘূর্ণি!

এত যে ক্ষতিস্বীকার, ওর জন্যে ভেবে-ভেবে এত যে যন্ত্রণা বরণ করছে সে— তার কী দাম দিলে ও! এত অবজ্ঞা, এত অহংকার! মেয়েটার সঙ্গে একটু পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দিলে না, একটা কথা পর্যন্ত বললে না! ভয়-ভাবনার একটা ছাপ পর্যন্ত মুখে নেই তোমার!

অথচ তোমারই জন্যে কিনা ভেবে-ভেবে আধমরা হয়েছেন তোমার ছোটোমামি, প'ড়ে-প'ড়ে কপাল ঠুকেছেন ঠাকুরঘরে! তোমারই জন্যে তোমার মেজোমামা সেই বিকেল থেকে অস্থির উদ্‌ভ্রান্তের মতো হ'য়ে পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে! আর তুমি? তুমি এদিকে কোথাকার *কে-একটা-কাকে জুটিয়ে নিয়ে প্রজাপতি হ'য়ে*— চমৎকার, চমৎকার!

সুতরাং, দোতলার সিঁড়ির মুখে একেবারে তোপের মুখে প'ড়ে গেল উন্মেষ।

'ব্বাপ রে বাপ! মেয়েটা ব'লে গেছে আর-একদিন এসে তোর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবে। নে, পথ ছাড় তো এখন—' ঘূর্ণিকে ঠেলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো উন্মেষ।

আর, তাইতে, কেউটের মাথায় পা পড়লো যেন। ঝিলিক লাগলো ঘূর্ণির চোখে, দু-হাতে ছোবল মেরে সাপ্টে ধরলো উন্মেষের একটা হাত, কিন্তু বিষ ঢালবার আর ফুরসত হ'লো না। সিঁড়ির মাথা থেকে নেমে আসছে হুড়হাড় দুরদার কলকণ্ঠ একটা সোরগোল। ব্যাডমিণ্টনের দলটা। ছেলে-মেয়েতে দশ-বারোজন। ঘূর্ণি আর উন্মেষকে নিচেয় দেখে নিম্নমুখী সোরগোলটা আরো এক পর্দা ফাটলো— যেন একটা ফুলঝুরি বাজি ঝুড়ি-ঝুড়ি মালায় ফেটে পড়তে-পড়তে সহসা আরো-একটি মালা ছড়ালো।

'হিয়ারিউআর মঁসিয়ে নাইনটিন, হোয়াটস্ দ্য রং উইদিউ?'

'রিনিদি রিনিদি, কী-মজা কী-মজা, আজ পঁচিশ টাকা হেরেছে মিণ্টনদা!'

'আজকের বাজির টাকায় রোববার দিন পিকনিক ডায়মণ্ডহারবার।'

'মোটমাট চল্লিশ টাকা উঠেছে আজ বাজিতে।'

'এই মল্লিকা, তোমার পাঁচটাকা কাল নিয়ে আসবে কিন্তু। তুমি

আগেকার পাঁচটাকা তো খুব দিলে! পাঁচ সিকে সাত সিকে খেলবে, তা-ও আবার বাকি!'

'কোথায় যে থাকো উনিশদা, তুমি যে দিন-দিন ডুমুরের ফুল—'

'জানো রিনি, মিনিটা-না, আমার কাছে একটা নিল একটা লাভ গেম—'

'এই মিথ্যুক এই মিথ্যুক, দাঁড়ান তো আপনাকে ছাখাচ্ছি মজা।'

'বাজি ধরার মুরোদ নেই তো কেনই বা বাজি ধরা বাওয়া!'

'আমিও তো তাই বলি মিলটনদা। আমি প্রোপোজ করছি, এখন থেকে ধারে বাজি খেলা ব্যান করা হোক।'

'আই সেকেণ্ড ইট ভেহেমেণ্ট্‌লি। ইস্কুলমাস্টারের মেয়ে হ'য়ে আমাদের সঙ্গে মিশবার শখ খেলবার শখ তো যা-না বাপু খেলে এক-হাত, আবার ঘোড়ারোগ কেন! কিছু বলাও ঠিক না সামনা-সামনি, কিন্তু যা-ই বলো বাপু, আমার তো—'

আদিত্যপ্রসাদকে এমনি সময় দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন। ফিটফাট বিলিতি পোশাকে ছ-ফুট লম্বা সুঠাম গৌর তনুখানি তাঁর অল-উল আভিজাত্যে মোড়া, তদুপরি সুরাসারের মোলায়েম একটি খোসবায়ে মেজাজটি শরিফ। কলরোলে টেনে নিলো তাঁকে ছেলে-মেয়েরা, কাকাবাবু কাকাবাবু ক'রে একেবারে উথলে উঠলো সবাই একসঙ্গে।

আর সেই ফাঁকে পালালো উন্মেষ। সোজা একেবারে তেতলায় নিজের ঘরে। ঘূর্ণিও আসছে পেছন-পেছন এটা অবিশ্যি টের পেলো, কিন্তু উপায় নেই— ওর কবল থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। ভাবতে-ভাবতে উন্মেষ তার ঘরের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালো, বললে সকাতরে, 'এখন একটু রেহাই দে আমাকে, দোহাই তোর।'

থমকে দাঁড়ায় ঘূর্ণি। বটে! এতটা! ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যাবার মতো চমকে উঠলো তার দু-চোখ। উন্মুখর ঠোঁট দুটিতে দুঃসহ নিষ্পিষ্টতা তীব্র রেখায় ছড়িয়ে গেল সমস্ত মুখখানায়। উন্মত্ত এক জলোচ্ছ্বাসের মতো ঘূর্ণি উন্মেষের সম্মুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল।

এত সহজে গ্রহণ ছেড়ে যাবে আশা করেনি উন্মেষ। গ্রহণ-মুক্তির কথাটাই মনে এলো তার। মনে হয় তার মেজোমামা, ছোটোমামি আর রিনি, এই তিনজনে মিলে তাকে গ্রাস করারই চক্রান্ত করছে সব-সময়। দরজায় খিল তুলে দিলো সে। সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললো। আলো জ্বালতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলো। তার বিছানায় শুয়ে আছে সরোজ।

সরোজ শিবপ্রসাদের সেজো ছেলে। বড়ো ছেলে মনোজ গেছে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে; মেজো বিরাজ আই. এস-সি. পড়তে-পড়তে গুটিকয়েক আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে ম্যাসাজ-ক্লিনিক সংক্রান্ত এমন একটি কুৎসিত মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলো যার মুখ চাপা দিতে শিবপ্রসাদকে হাজার দশেক টাকার ধাক্কায় প'ড়ে যেতে হয়েছিলো। পড়াশুনো অতঃপর তার ধাতে সয়নি আর. এখন সে চলচ্চিত্র-জ্যোতিষ্কমণ্ডলে তারকায়িত হবার স্বপ্নে গ্রহের ফেরে ঘূর্ণমান; আর এই সরোজ, সাতাশ বছর বয়স। কিছু-কিছু গোপন ব্যাধি জুটিয়েছে ইতিমধ্যেই। মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে সোনা-দানা এটা-ওটা জিনিসপত্র, যেমন, ঘড়িটা কলমটা ইত্যাদি উবে যায়। এমনকি সেদিন উন্মেষের ঘর থেকে নিত্যপ্রসাদের আড়াইশো টাকা দামের দু-খানা বই-ই উধাও। তার জন্যে শাস্তি-শাসন যদিও ঝি-চাকরদের কপালেই বরাদ্দ, ভেতরে-ভেতরে কিন্তু সরোজ সম্বন্ধে আরো সতর্ক হবার চেষ্টা করে সকলে।

'কি রে, একেবারে চড়কগাছ মেরে গেলি দেখছি—' আস্তে-ব্যস্তে উঠে

ব'সে বললে সরোজ। ঘোলা-ঘোলা খানিকটা হাসি গুলিয়ে ওঠে তার ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি ও গুটিগুটি ব্রণখচিত সুন্দর মুখখানায়। চুরোটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে সরোজ বললে, 'চোর ডাকাত তো আর নই!'

বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে নেবার চেষ্টা করে উন্মেষ, টেবলটার কাছে চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে যথাসম্ভব নির্বিকারভাবে তাকাবার চেষ্টা করলো সরোজের দিকে।

'তা শোন, যে-জন্যে ওয়েট করছিলাম তোর জন্যে। তুই-না ইংরিজি নিয়ে এম. এ. পড়িস? তোদের সঙ্গে বিনতা মুখুজ্যে ব'লে কোনো মেয়ে পড়ে?' গলাটা কেমন-একটু চাপা-চাপা শোনালো, কটা-কটা চোখ দুটো তার জুলজুল ক'রে উঠলো।

আর, কথাটা শোনামাত্র, উন্মেষ একেবারে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললো, 'তার মানে? তুমি কী ক'রে জানলে তার কথা? কোনো খবর-টবর জানো না কি তার সম্বন্ধে?'

উন্মেষের চমকানি দেখে সরোজ একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে যায়। বলে, 'খবর? কী খবর?'

'ওর ছোটো ভাইটার আজ দুপুর থেকে কোনো পাত্তা নেই। এই তো একটু আগেই আমাদের বাড়ি এসেছিলো ফোন করতে, কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় কিনা—'

ঠোঁট দুটি সরু, চোখ দুটি গোল ক'রে হতভম্ব হ'য়ে থাকে সরোজ খানিকক্ষণ, আর শেষে ঔৎসুক্যে ফেটে পড়লো, 'বলিস কী রে, অ্যাঁ··· তা খোঁজ-টোজ পেলি কিছু?'

'নাঃ। তুমি কী জানো বলো তো?'

'আরে আমি এ-সবের কী জানি! আমাকে বলে কিনা ইয়ে এক

ফ্রেণ্ড বলছিলো···মানে বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপার আর কি— তা তুই কি ওদের ভেতরের খবর-টবর রাখিস কিছু?'

'কী ভেতরের খবর?'

'এই ওদের ফ্যামিলি কেমন, মেয়েটার ক্যারেক্টার কেমন, ওদের টাকা-পয়সা কী-রকম-কী আছে-টাছে—'

মাথা নাড়ে উন্মেষ।

'অ্যাঁ? জানিসনে মানে? আরে মোটামুটি কিছু তো জানিস? ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কীরকম আছে-টাছে মনে হয় বল তো?'

'কী আশ্চর্য, ও-সব আমি কোত্থেকে জানবো!'

সরোজ কিন্তু নাছোড়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিনতার সম্বন্ধে নানান খবর সে বের করবার চেষ্টা করলো উন্মেষের পেট থেকে। উন্মেষ যথাসাধ্য বললে। কিন্তু দেখা গেল সরোজ তাতে মোটেই তৃপ্ত না, খুশি না। উন্মেষ আশ্চর্য হ'য়ে যায় সরোজের প্রশ্নের ধরন দেখে, বন্ধুর জন্যে কনের খবরাখবর নেওয়া ছাড়াও বিনতাদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত কোনো কৌতূহল আছে সরোজের— মনে হ'লো তার। ধাঁধায় প'ড়ে যায় উন্মেষ।

সরোজ চ'লে গেল। বিছানায় চিং হ'য়ে শুয়ে আজকের গোটা দিনের ব্যাপারগুলো মনের মধ্যে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো উন্মেষ। কিন্তু বৃথা, বৃথা! এক্ষুনি হয়তো মেজোমামা কি ছোটো-মামির তলব এসে যাবে, আর তারপর শুরু হবে কৈফিয়ৎ আর শাসনের পালা। স্নেহের দাবি! মনের মধ্যে তার এই আশঙ্কাটি এমনি বিশ্রি-ভাবে চেপে রইলো যে, সত্যিই যখন একটু পরেই বাচ্চা-চাকর ভোলা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো, উন্মেষ তড়াক ক'রে উঠে ব'সে একেবারে খিচিয়ে উঠলো, 'কী? কে ডাকছে? মেজোকর্তা না ছোটো মা?'

ভীত গলায় ভোলা বললে তাড়াতাড়ি, 'ছোটো মা।'

'কোথায় ?'

'তোমার ঘরে—' ব'লে উন্মেষের ভাবগতিক দেখে এক-পা এক-পা ক'রে পালিয়ে গেল সে।

কিন্তু তখুনি গেল না উন্মেষ। বিছানা থেকে নেমে পায়চারি শুরু ক'রে দেয় ঘরময়। প্রচণ্ড এক যুদ্ধের পাঁয়তারা কষে মনে-মনে এবং অবশেষে আজ একটা হেস্তনেস্ত বোঝাপড়া ক'রে ফেলবার জোরালো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেমে আসে দোতলায় ছোটোমামির ঘরে।

নীরজা ঘরে নেই। তাঁর ছোটো মেয়ে-তিনটি চুলোচুলি করছে ঘরের মধ্যে বিছানার দখল নিয়ে। সাত, নয়, এগারো, তিনটির বয়স। উন্মেষ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই তিনটিই ঝগড়া ভুলে সমস্বরে কলকল ক'রে উঠলো, একসঙ্গে সবাই ব্যাখ্যানা করতে লেগে গেল, মা মেজদি আর জ্যাঠামণি কে কতটা রেগেছে আজ সুন্দরদার ওপর।

'এই যে হনুমান!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছাখে উন্মেষ, বিভাবতী এসে দাঁড়িয়েছেন। চুলগুলি তাঁর মাথার ওপর চুড়ো ক'রে বাঁধা, বাঁ-গালে এক-পোঁটলা পান, কাঁধে ঝুলছে টার্কিশ তোয়ালেখানা, বাঁ-হাতটি কোমরে নিবদ্ধ, ডান-হাতের মুঠিতে দোক্তা, তর্জনীতে চুন। বিভাবতী বললেন, 'তোর আক্কেলটা কীর'ম বল তো, তোর জন্যে বাড়িসুদ্ধু লোক কি না-খেয়ে উপোস মেরে থাকবে ?'

নির্বাক তাকিয়ে থাকে উন্মেষ মাসিমার তাম্বুলতৃপ্ত মুখখানার দিকে।

রোষস্ফুরিত কণ্ঠে বেশ খানিকটা ব'কে দিলেন বিভাবতী উন্মেষকে। বকলেন সমস্ত দিন না-ব'লে-ক'য়ে ওর বাইরে-বাইরে টোটো ক'রে ঘোরার জন্যে, গুরুজনদের প্রতি আজকালকার ছেলেপিলেদের যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা না থাকার জন্যে, আর সে-সব তো দূরের কথা— এ-যুগের

ছেলেপিলেদের কাছে একটু কৃতজ্ঞতা, একটু কাণ্ডজ্ঞানেরও আর প্রত্যাশা রাখা যাচ্ছে না ব'লে। নয়তো কী ক'রে ও বাড়ি ছেড়ে গিয়ে হোটেলে-মেসে থাকবার কথা মুখে আনতে পারলো! ভালো পাস দিয়ে দু-পাঁচ টাকা বৃত্তি পা'স ব'লে কি ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করিস! বলতে-বলতে হঠাৎ সন্ত্রস্ত চাপা-গলায় উন্মেষের দিকে একটু ঝুঁকে' এসে বললেন, 'মেজদা বিকেলে কিচ্ছু খায়নি, রাত্তিরেও খাবে না ব'লে দিয়েছে তা জানিস? আর এদিকে তো তুই ফিরে এসে লোকটার সঙ্গে একটু দেখাও করিসনি শুনলাম, কী রে তুই, অ্যাঁ! হ্যাঁ রে অলবড্যে অলম্বুশ!'

কথাটি না ব'লে নেমে এলো উন্মেষ নিচতলায়। খাবার ঘরটা নিচেয়। সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ কানে আসে তার ছুটোছুটি চেঁচামেচির একটা শব্দ। দৌড়ে নেমে এলো বাকি সিঁড়ি ক'টা। হুলুস্থুল কুরুক্ষেত্র লেগে গেছে একেবারে। গোলমালটা সদর-দরজার ও-পিঠে, সম্ভবত রাস্তায়। সদর-দরজার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যাচ্ছে ঠাকুর, আর তার পিছু-পিছু রিনি মিনু ছোটোমামি বড়োমামি। উন্মেষ ছুটে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলো বামুন-ঝি তার ছেলে ভোলাকে চেপে ধ'রে ভাঁড়ার ঘরটার দিকে ছুটেছে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে। গোলমালটা বাড়ির বাইরে। সবাইকে ঠেলে সদরের বাইরে বেরিয়ে এলো উন্মেষ।

রাস্তার ওপর যা ঘটছে তখন, তা সত্যিই অতি বিচিত্র।

মারামারি গালাগালি হল্লা দাপাদাপি হুল্লোড়ে পাড়াটার চেহারা উল্টে গেছে একেবারে। কে যে কী বলছে, কেন চ্যাচাচ্ছে, তার মানে বোঝা কঠিন। সমস্ত দৃশ্যটা দেখে এবং এর-ওর সঙ্গে দুটো-একটা কথার মধ্য দিয়ে উন্মেষ বুঝে নিলো, মারামারিটাতে একপক্ষ তাদের বাড়ি, অন্যপক্ষ পঞ্চা পাগলা আর পাড়ার কয়েকটা ছেলে। আশপাশের বাড়িগুলির ছেলে-বুড়োদের অনেকেই রাস্তায় নেমে এসে ভিড় ক'রে

দাঁড়িয়েছে। বড়োমামা মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতের ছড়িটা আস্ফালন ক'রে ঠকঠক কাঁপছেন রাগে, বজ্রনির্ঘোষে গজঝম্প তালে রণক্ষেত্র পরিচালনা করছেন, কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে দুটি-একটি হুঙ্কার শুধু থেকে-থেকে বেরিয়ে আসছে। আর তাঁর বন্ধুশ্রেণীর দু-তিন জন তাঁকে শান্ত করতে বিষম ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

ব্যাপারটার একটা ছোটো ইতিহাস আছে। মাসখানেক ধ'রে প্রায়ই রাত দশটা সাড়ে-দশটার সময় মিত্রসদনের ফটকের সামনে একটি লোকের আবির্ভাব হচ্ছে। লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিত্রসদনের দিকে মুখ ক'রে গলা সপ্তমে চড়িয়ে গালাগালি টিটকিরি দিতে থাকে আদিত্যপ্রসাদকে। চুটকি দিয়ে-দিয়ে ব্যাখ্যানা করতে থাকে আদিত্য-প্রসাদ এবং রেলের আরো অনেক অফিসারের বিচিত্র সব অপকর্মের কাহিনী। পাড়ায় ওর নামকরণ হ'য়ে গেছে পঞ্চা পাগলা। আসলে ওর নাম পঞ্চানন মাইতি। বছর ত্রিশেক বয়স। রগচটা গোঁয়ার-গোবিন্দ। কেরানিগিরি করতো রেলের অফিসে কয়লাঘাটে, মাস পাঁচ-ছয় আগে সে প'ড়ে যায় আদিত্যপ্রসাদের কোপানলে। শেষপর্যন্ত চাকরিটা খুইয়েছে বেচারি।

আজও পঞ্চানন এসে হাজির দশটার সময়। এসে চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছিলো। অভ্যাসমতো খোট্টা দরওয়ান রামগোলামও বেরিয়ে এসেছিলো লাঠি বাগিয়ে। কিন্তু আজ পাড়ার কয়েকটি ছেলেও হঠাৎ এসে রুখে দাঁড়ালো পঞ্চাননের হ'য়ে।

ওদের রাগ কিন্তু নিত্যপ্রসাদের ওপরে। ধর্মঘট সম্বন্ধে নিত্যপ্রসাদের বিরক্তি চিরদিনকার, আর এই নিয়ে ঝগড়া মতান্তর মনান্তরের যে পুঞ্জীভূত ইতিহাস আছে তাঁর জীবনের পর্বে-পর্বে তা অতি বিচিত্র। পাড়ার ছেলেদের কাছেও তাঁর সে-বিরক্তি এমনি কটুভাবেই গিয়ে

পৌঁচেছে যে একদিন তাঁকে রাস্তায় ধ'রে আচ্ছা ক'রে কিছু দিয়ে দেওয়া যায় কি না একথাও ওরা ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছে ইদানীং।

এদিকে, রোজ রামগোলামের লাঠি খেয়ে-খেয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয় অসহায় পঞ্চাননকে। আর আজ এতগুলি ছেলে যখন হঠাৎ রামগোলামকে ধমকে উঠে এগিয়ে এসে ওর লাঠিটা কেড়ে নিলে, তখন আর পায় কে পঞ্চাননকে। দ্বিগুণ উৎসাহে গলা ছাড়লো সে এবং বাগে পেয়ে রাম-গোলামের পিঠে ঝেড়ে দিলো দমাদম কয়েকটা কিল। রামগোলামের চিৎকার শুনে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসে, মিত্রসদনের আরো দুটি ভৃত্য ভজা আর গোবিন্দও ছুটে এসেছে রামগোলামের সাহায্যে। গোলমালটা যখন বেশ পেকে উঠেছে এমনি সময় গাড়ি ক'রে এসে হাজির শিবপ্রসাদ, 'কলে' গিয়েছিলেন, গাড়ি থেকে নেমে ব্যাপারটা দেখে শিবপ্রসাদের মনের অভিজাত সিংহটি কেশর ফুলিয়ে সিংহনাদে ফেটে পড়লো। পাড়ার আরো তিন-চারটি অভিজাত তখন মাথা চাড়া দিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পেছনে, আর শিবপ্রসাদের কম্পাউণ্ডার পালোয়ান সীতাপতি কাঁহালী ভীমবিক্রমে জটলার মধ্যে লাফিয়ে প'ড়ে পঞ্চাননের কান চেপে ধ'রে এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এসে ফেললে তাকে মনিবের সামনে। পঞ্চানন বেকায়দায় প'ড়ে আর-কিছু উপায় না দেখে একগাদা থুথুই ছিটিয়ে দিলে শিবপ্রসাদের মুখে। ব্যস, অতঃপর তুমুল লেগে গেছে দু-পক্ষে।

উন্মেষ স্তম্ভিত হতবাক দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার ওপর।

খবর পেয়ে পুলিশের গাড়ি এসে গেল দুটো। উত্তেজনাটা সঙ্গে-সঙ্গে আরো কয়েক ডিগ্রি চ'ড়ে গেল। মেয়ে-বৌরা রেলিঙে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁটা হ'য়ে উঠলো। লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়লো ভারী-ভারী কয়েক জোড়া বুট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল চুলের মুঠি ধ'রে পঞ্চাননকে টেনে তোলা হচ্ছে গাড়িতে। পঞ্চানন কিন্তু তখনো চিৎকার গালিগালাজ অভিশাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণপণে। তার পক্ষে যারা কোমর বেঁধেছিলো তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ইতিমধ্যে স'রে পড়েছে, কিন্তু যারা পালায়নি তারা পুলিশের এমনি একতরফা নজরের প্রতিবাদ না ক'রে ছাড়লো না। আর পুলিশও ছাড়লো না তাদের, টেনে-হিঁচড়ে তুলতে লাগলো গাড়িতে, যে প্রতিবাদ করলো তাকেই। ওদের আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে এলো চারদিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে। একটি মাঝবয়সী বিধবা মহিলাকে পর্যন্ত দেখা গেল অস্থির হ'য়ে ছুটে এসে দাঁড়ালেন এই দঙ্গলের মধ্যে। দৃশ্যটা বড়ো চমৎকার দাঁড়ালো।

এর মধ্যে উন্মেষ এক কাণ্ড ক'রে বসলো। এমনিতেই মেজাজটা তার কিছুদিন ধ'রে অগ্নিপিণ্ড হ'য়েই আছে। যদিও অত্যন্ত চাপা-স্বভাব অত্যন্ত কলহবিমুখ প্রকৃতির জন্যে ওর ঐ মানসিক অগ্নির উদ্গীরণের স্বরূপটা খুব প্রাঞ্জল নয় সকলের কাছে, তবুও অনেকেরই ধারণা উন্মেষ রাগে না কখনো। কিন্তু এমনি চাপা রাগ যে কী চণ্ডাল তা কচিৎ কখনো বেরিয়ে পড়ে। পুলিশি চণ্ডলীলা দেখতে-দেখতে উন্মেষের মনের সেই চণ্ডালই ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো সহসা, কী করতে যাচ্ছে সে নিজেই বুঝি জানলো না ভালো ক'রে। যে-সার্জেণ্ট তার বন্ধু অখিলকে জামার কলার চেপে ধ'রে টেনে তুলবার জন্যে টানা-হেঁচড়া করছিলো, উন্মেষ উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে সমস্ত শক্তিতে তার স্পর্ধিত প্রতিরোধ জানালো।

আর, তার পরে আর কী-কী ঘটলো এবং কেমন ক'রে ঘটলো তার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

শিবপ্রসাদ এবং পাড়ার আরো-কয়েকটি মাতব্বরের সুপারিশ এবং

বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও, দঙ্গলটার মধ্যে অতর্কিত একটা কালবৈশাখীর মতো ফেটে-পড়া ঘূর্ণির দাপাদাপি বিত্যুৎবর্ষণ সত্ত্বেও পৃথক্ ফল ফললো না উন্মেষের ভাগ্যে। বন্দী হ'তেই হ'লো, তাঁকেও যেতে হ'লো থানায়।

এদিকে নিত্যপ্রসাদ গোলমালটা শুরু হবার আগে থেকেই ব'সে ছিলেন তেতলার ওপর তাঁর নিজের ঘরের ঝুল-বারান্দাটায়। সেখান থেকে রাস্তার সমস্ত দৃশ্য স্পষ্টই দেখেছেন তিনি আগাগোড়া, দেখতে-দেখতে অস্থির পাগল হ'য়ে গেছেন। কিন্তু কেন যে তা সত্ত্বেও দৌড়ে নিচে নেমে আসতে পারলেন না, তা কে বলবে। উন্মেষকে যখন পুলিশে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুললে, সমস্ত অন্তরাত্মা তাঁর থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলো, দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী শিথিল হ'য়ে গিয়েছিলো, প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু পারেননি। যন্ত্রণাকাতর বিকৃত মুখখানাকে দু-হাতে চেপে ধ'রে কাঁপতে-কাঁপতে ব'সে পড়েছিলেন মোড়াটার ওপর।

আদিত্যপ্রসাদ কিন্তু কিছুই এর টের পেলেন না, যদিও তিনিই এ-সব গোলমালের মূল হেতু। তিনি তখন পরম আরামে সুখশয্যায় লীন, হাল্কা নীল পাঁচ-পাওয়ারের একটি আলো সমস্ত ঘরখানায় ছড়িয়ে দিয়েছে স্বপ্নলোকের মদির কোন রহস্য, আর সেই রহস্যের নেশায় বুঁদ-হ'য়ে-যাওয়া তাঁর মনের মাঠটিতে রেসকোর্সের পক্ষীরাজেরা ছুটছে উল্কার বেগে। হা— আ— গুড হেভেন্‌স্! উইনে প্লেসে যাকে ঠিক যেমন-যেমন ধরেছেন তেমনি-তেমনিই হ'য়ে যাচ্ছে রে বাবা— কেয়াবাৎ! গেল-শনিবারটা কী আনলাকি ডে-ই গেছে তাঁর, আসছে শনিবার একেবারে ভোজবাজি দেখিয়ে দেবেন মাঠে। খুব রিলায়েব্‌ল কিছু টিপ্‌স্ স্থলুক-সন্ধান পেয়েছেন এবার। এবার ফোরকাস্টে টানবেন…

ট্রিব্‌ল টোটের খেল নিয়ে নেবেন···চিয়ার আপ বাক আপ ওরিয়েন্টাল সোল্‌!

সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধ'রে দক্ষিণমুখী ছুটে চলেছে পুলিশের গাড়ি দুটো। কন্‌কনে শীত। রাত গোটা এগারো। হা-ঘরে ফুটপাতের মানুষগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে নিঃসাড় ঘুমে। এখানে-ওখানে তাড়ির আড্ডা। আদিম উল্লাস আর জঞ্জাল-পোড়ানো আগুন। সেই আগুনে রাস্তার আবছা অন্ধকার আরও ভয়াবহ। পদাতিকেরা উধাও, কিন্তু লরি আর মোটরের তীব্রবেগ চক্রচারণায় গাঢ় হিম-জড়ানো নৈশ আস্তরণ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে।

একসঙ্গে একই কয়েদ-গাড়িতে সঙ্গী হিসেবে উন্মেষকে পাওয়া, এ যেন জীবন-ললিত ওদের কাছে প্রায় এক অসম্ভব ঘটনা। গাড়ির মধ্যেই তারা অভিনন্দন জানালো উন্মেষকে। বন্দী হয়েছে ওরা আটজন, কিন্তু কৃতিত্বটা যা-কিছু যেন উন্মেষেরই প্রাপ্য। রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে যার টিকিটিরও নাগাল পায়নি ওরা কোনোদিন সেই-ছেলে কিনা একেবারে পুলিশের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো? ওদের চোখে এটা খানিকটা বিপ্লবের সামিল। আর, তাছাড়া, যাদের বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ, এ যে তাদের বাড়িরই ছেলে। শুধু কি তাদের বাড়িরই, কে না জানে নিত্যপ্রসাদ আর উন্মেষকে আলাদা ক'রে ভাবাই যায় না। সেই উন্মেষ কেমন ক'রে এমন কাণ্ড ক'রে বসলো হঠাৎ!

এতক্ষণকার মারামারি ধস্তাধস্তিতে সারা শরীর ওদের ক্ষতবিক্ষত। নাকের কাছে উঁচিয়ে আছে সঙিন, এর পরে আরো কত কী লাঞ্ছনা আছে কপালে— কিন্তু ওদের মুখ-চোখ দেখে কে বলবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভয়-ভাবনা আছে ওদের। পুলিশি চোটটা দেখা গেল উন্মেষের ওপর

দিয়েই গেছে বেশি, বাধা দেওয়ার প্রতিশোধ সার্জেণ্ট মুখার্জি বেশ ভালোভাবেই নিয়েছে। অখিল তাড়াতাড়ি রুমাল বের ক'রে বেঁধে দিয়েছে ওর কপালটা, আর রুমাল ভিজে উঠেছে রক্তে।

পঞ্চাননকে মেরে-ধ'রে কিছুতেই চুপ করানো যায়নি, পুলিশের কবলে পড়বার পরে সে তার মেয়ে-বৌয়ের নাম ধ'রে-ধ'রে পরিত্রাহি চিৎকার করছিলো, একটি পুলিশ তেল-কালি-মাখা নোংরা একটা ন্যাকড়া দিয়ে পঞ্চাননের মুখটা ক'ষে বেঁধে দিলো। নেতিয়ে পড়লো সে তখন গাড়ির পাটাতনের ওপর। জীবন তাড়াতাড়ি পঞ্চাননের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে বসেছে।

বৌবাজারে প'ড়ে ডান-দিকে মোড় নিলো গাড়ি ছুটো।

হঠাৎ, সার্জেণ্ট দু-জনের মধ্যে এমনি কথাবার্তা শুরু হ'লো :

'একটা মজা করবে সরকার ?'

পাইপ-মুখে সরকার শ্লেষ্মাজড়িত গলায় ঘর্ঘর একটা শব্দ করলো।

'থানায় জমা দেবো না এগুলোকে। চলো, আউট অব লোকালিটি কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসি !'

সরকারের গলা ফের ঘর্ঘর ক'রে উঠলো, শক্ত ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকলো মুখার্জির দিকে, বললে গুড়গুড় অর্ধোচ্চারিত গলায়, 'উঁহুঃ, ও ক'রে কী হবে। ঘরের ইঁদুর পথ চিনে ঘরেই চ'লে যাবে। তার চেয়ে হাজত বেটার।'

কিন্তু মজার নেশাটা মুখার্জির দুর্বার হ'য়ে উঠেছে।

সুতরাং লালবাজার থানায় নয়, পুলিশের গাড়ি ছুটো এসে থামলো কিংসওয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ছাড়িয়ে গঙ্গার পাড়ে নেপিয়ার রোডের ওপর। হাঁ, ব্যস, খ্যাস, এক-রাতের জন্যে নির্বাসন-দণ্ড যদি দিতে হয় তো এইখেনে ! 'নামাও গিধ্ধরগুলোকে এখানে, জলদি !' নেকড়ে-চোখ মুখার্জির চাপা-গর্জন শোনা গেল।

যেমন ক'রে ওঠানো হয়েছিলো তেমনি ক'রেই টেনে-হিঁচড়ে ফের ওদের নামিয়ে দেয়া হ'লো গাড়ি থেকে। উন্মেষের কপালে শুধু অতিরিক্ত একটি ধাক্কা জুটলো। কুৎসিত একটা গালি সহযোগে গাড়ি থেকে উন্মেষের ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কাটা দিলো সার্জেণ্ট মুখার্জি। হুমড়ি খেয়ে পড়লো উন্মেষ রাস্তার ওপর। গিয়ার টানার শব্দ আর গিটকিরি-দেয়া-হাসির শব্দ ছমছমে শীতার্ত অন্ধকারকে যেন আমূল বিদ্ধ করলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি দুটো অদৃশ্য।

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা রাস্তার ওপর। বুঝতেই পারলো না ব্যাপারটা হ'লো কী। ছাড়া পেয়ে গেলাম আমরা, না কি পালাবো দৌড়ে? কিন্তু কোথায় পালাবো? এই এত রাত্রে, এখান থেকে কোনদিকে পালানো যাবে? কারফিউ কোন রাস্তায় আছে, কোথায় নেই তা-ই বা কে জানে। গাড়িঘোড়া তো এ-রাস্তায় এখন দুরাশা, তবে?

উন্মেষের পরনে পায়জামা আর গেঞ্জি ছাড়া আর-কিছুই ছিলো না। ললিত জোর ক'রে নিজের গায়ের কোটটা উন্মেষের গায়ে ঢুকিয়ে দিলো। উন্মেষের আপত্তিতে সে যুক্তি দেখালো যে তার গায়ে তো জাম্পারও আছে, সুতরাং কোটটা—

হাঁটতে-হাঁটতে পঞ্চানন হঠাৎ প'ড়ে গেল রাস্তার ওপর। সুস্থ চেতনায় থাকলে সে আর উঠতে পারতো কিনা সন্দেহ, কিন্তু টেনে-টুনে তুললে তাকে সবাই মিলে, পরিমলের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে-টলতে ফের চলতে লাগলো সে বিকারের ঘোরে। উন্মেষ আশ্রয় করেছিলো সমীরণকে, কপালের রক্তস্রাবটার জন্যেই নিঃসাড় নিস্তেজ লাগছিলো তায়।

অন্ধকার আর শীত। এই পরিবেশ, এই দুর্ভোগ, এই একত্র পথ-চলা আটটি মানুষকে পরস্পরের মধ্যে যেন আত্মীয় ক'রে ফেললো একেবারে।

আরো ভালো ক'রে সবাই সবাইকে চিনলো, স্পষ্ট ক'রে জানলো, অনুভব করলো।

চৌরঙ্গি পর্যন্ত এসে অবিশ্যি আর হাঁটতে হ'লো না। ট্যাক্সি পাওয়া গেল একটা। ফিরে এলো সবাই বিডন স্ট্রীটে। দে সরকারের পকেটে টাকা ছিলো, মিটিয়ে দিলো ভাড়া।

উন্মেষকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাবার পরে তোলপাড় লেগেছিলো মিত্রসদনে।

পুলিশের কে-এক বড়োকর্তা আছেন-না বড়োভাসুরের বন্ধু? তাঁকে ফোন ক'রে উনিশকে ছাড়িয়ে আনা যায় না? কথাটা পাড়লেন নীরজা ঘূর্ণিকে দিয়ে। কিন্তু শিবপ্রসাদ কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে ফেটে পড়লেন একেবারে। তাঁর মান-সম্মান প্রতিপত্তি সব চুলোয় গেল আজ কুলাঙ্গারটার জন্যে। লোকে তো বলবে ডাক্তার এস. পি. মিত্তিরের ভাগ্নেকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে! ছি ছি! কী ক'রে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কাল! দাঁত-মুখ খিচিয়ে এও বললেন তিনি, 'কেন, এখন আমার কাছে কেন, যার লাই পেয়ে-পেয়ে এমনি মাথায় উঠেছে তার কাছেই যা-না!'

পাশ থেকে নয়নতারাও তাঁর সোনার নাকচাবি-পরা-নাকটা বেঁকিয়ে ঠ্যাক্‌না মেরে বললেন, 'এ-ছেলে যে এ-বংশে চুনকালি দেবে এ আমি আগেই জানতাম।'

'আগেই জানতে তুমি জেঠিমা? আহা তা আগে বলোনি কেন গা! বললে তো আগেই আপদ বিদেয় করা যেত!' ফস্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেলে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘূর্ণি শিবপ্রসাদের ঘর থেকে।

আর যাবে কোথায়। শিবপ্রসাদ ও নয়নতারা দু-জনেই ফেটে পড়লেন

একেবারে পঞ্চম সোয়ারি তালে। বেশ-কিছুক্ষণ ধ'রে অতঃপর যে-বিষ চল্‌কে-চল্‌কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো ঘরখানার মধ্যে, তার ঝাঁজ যে কিছুই পৌছলো না নীরজার ঘরে এমন নয়। কিন্তু তার পাল্টা জবাব দিতে ছুটে এলেন না নীরজা নয়নতারার ঘরে, সুখসুপ্ত স্বামীর মুখখানার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে শেষপর্যন্ত উঠে এলেন তেতলায় নিত্যপ্রসাদের ঘরে। ঘূর্ণিও এলো পেছন-পেছন।

অন্ধকারের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিলেন নিত্যপ্রসাদ। দোরগোড়ায় মানুষের সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘূর্ণি ঘরে ঢুকে আলোটা জেলে দিলো। চমকে উঠলেন নীরজা নিত্যপ্রসাদের চেহারা দেখে, যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। চোখ দুটি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, সমস্ত মুখখানায় লেগেছে সর্বনেশে অকল্যাণের আবছায়া। তবে কি উনি খবরটা পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই ?

'উনিশকে যে ধ'রে নিয়ে গেল পুলিশে—'

'বেশ হয়েছে—' ফের পায়চারি শুরু ক'রে দিলেন নিত্যপ্রসাদ। উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলেন, 'এ আমি জানতাম। এর দরকার ছিলো। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম আমি। এতদিনে সেই সাপ খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এ-শিক্ষা পাবার আমার দরকার ছিলো। তুমি ভেবো না ছোটো-বৌ, আমিও এ-ই চেয়েছিলাম। আমার আর সহ্য হচ্ছিলো না। এই বেশ হয়েছে।'

ব'লে যেতে লাগলেন নিত্যপ্রসাদ। নীরজা নিশ্চেতন একটা জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তা শুনতে লাগলেন। আর ঘূর্ণি, শেষ ভরসা জ্যাঠামণি কিছু-একটা নিশ্চয়ই করবেন উনিশদাকে ছাড়িয়ে আনবার— বড়ো আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলো। কিন্তু এখন জ্যাঠামণির রকম-সকম দেখে দম ফেটে কান্না পেলো তার, দৌড়ে বেরিয়ে গেল

সে ঘর থেকে। সোজা গিয়ে ঢুকলো উন্মেষের ঘরে, উন্মেষের বিছানার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে দুর্বার কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

এত ঘুম! এতটা নিশ্চিন্ত! ঘুমের নিশ্বাসে স্তব্ধ নিথর মৃত্যুপুরী যেন একটা! রেলিঙ ধ'রে-ধ'রে ক্লান্ত অবসন্ন উন্মেষ উঠে এলো তেতলায়। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে পরিমল আর অখিলকে সে গেট থেকেই বিদায় করেছে। পা টিপে-টিপে এগিয়ে এলো উন্মেষ নিজের ঘরখানার দিকে। রিনি-মিনুদের শোবার ঘরটা, মেজোমামার ঘর—সব দরজাই বন্ধ। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। আশ্চর্য। ছোটোমামি আর রিনিও ঘুমোচ্ছে বেঘোরে! অথচ তখন পুলিশের হাতে পড়বার সময় কী কাণ্ডটাই না করলে রিনি, সেই রিনি-ও!

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালতেই অবিশ্যি মনের পাথর অনেকখানি নেমে গেল উন্মেষের। তার বিছানায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে রিনি। ঘরের কোণে একটা চেয়ারের মধ্যে ছোটোমামিও যে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছেন ঘুমে, সেটাও নজরে পড়লো একটু পরে। উন্মেষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ছোটোমামির কাছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন নীরজা। এ-ভাবে, এত সহজে উন্মেষকে ফিরে পাবেন এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। আনন্দে দুঃখে আশায় হতাশায় কী যে করবেন তিনি ভেবে পেলেন না। বিস্রস্ত বেশবাসে উন্মেষের দু-কাঁধ ধ'রে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শিউরে উঠলেন ওর কপালে বাঁধা রক্তাক্ত রুমালটা দেখে।

কিন্তু এই এত রাত্রে বড়োভাসুরঠাকুরকে কি ডেকে তোলা যাবে? একেই তো রেগে আছেন, তার উপর ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে এসেছে তখন

রুনিটা। এই রাত দুটোর সময় তাঁকে ডাকতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু না-ডাকলেও তো নয়, সমস্ত রাত ছেলেটা এমনি রক্তমাখা কপাল নিয়ে প'ড়ে থাকবে? এত রাত্রে বাইরের ডাক্তারও তো পাওয়া যাবে না। কিছু ঠিক করতে না পেরে শেষে ছুটে গিয়ে টেনে তুললেন মেয়েকে।

উন্মেষ ভেবেছিলো ঘুম ভেঙে উঠে রিনি হৈচৈ লাগিয়ে দেবে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলবে, এই রাত-দুপুরে এখন আর-এক হাঙ্গামার মধ্যে প'ড়ে যেতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও শেষে কিন্তু সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে বললে ঘূর্ণি, 'কী ক'রে ছাড়া পেলি?'

প্রমাদ গুনলো উন্মেষ। মান-ভাঙানোর চেষ্টায় ঘূর্ণির হাত দুটো টেনে নেবার চেষ্টা করলো নিজের হাতের মধ্যে। কিন্তু হাত ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়লো ঘূর্ণি খাট থেকে, মা-র দিকে তাকিয়ে মুখখানা আরো একটু শক্ত ক'রে শান্ত স্বরে বললে, 'জ্যাঠামণিকে খবর দেওয়া হয়েছে? না দিতে হবে?'

উন্মেষের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে উঠে পড়লেন নীরজা। খানিকটা আগে-আগে গিয়ে নিত্যপ্রসাদের ঘরে ঢুকবার মুখে পাশ কাটিয়ে ঘূর্ণি পেছনে পড়লো। দরজাটা হাঁ-হ'য়েই আছে, থমথমে অন্ধকার। সন্তর্পণে আলোটা জ্বাললেন নীরজা।

ইজিচেয়ারটায় প'ড়ে আছেন নিত্যপ্রসাদ। মাথাটা ঢ'লে পড়েছে একপাশে, পা-দুটি হাতলের ওপর তোলা, গায়ে জড়ানো আলোয়ান। নিত্যপ্রসাদকে দেখে উন্মেষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে জাগালো পায়ে হাত দিয়ে। চমকে উঠে বসলেন নিত্যপ্রসাদ। কিন্তু চমকটা কেটে যাবার পরে চোখে-মুখে যে-ভঙ্গি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর,

কথায় যে-কর্কশ টান লাগলো, তার ফলে উন্মেষের মনের অনুতাপ অনুশোচনার ঢেউগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল সব, দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ব'সে পড়লো একটা চেয়ারে।

নীরজার মনে আশা হয়েছিলো, ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে যাবার মতো এখন আবার উনিশকে ফিরে পেয়ে আচ্ছন্ন অস্বাভাবিক ভাবটা কেটে যাবে মেজোভাসঠাকুরের, আবার ফিরে আসবে সেই স্বচ্ছন্দ হাওয়া, হাসি, মন। কিন্তু হায় রে সংসার! একটা সোফার মধ্যে ব'সে জ'মে পাথর হ'য়ে গেলেন তিনি, একবার চেষ্টা করলেন নিজেই কিছু ব'লে ফেলে হাওয়াটা সহজ ক'রে ফেলবেন, কিন্তু বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলেন না।

আর ঘূর্ণি, এই রাত-দুপুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জ্যাঠামণির বইয়ের শেল্‌ফ্‌টাই গোছাতে লেগে গেল।

পুলিশের হাতে বন্দী হবার পর থেকে কেমন ক'রে উন্মেষ ছাড়া পেলো, এত রাত্রে ফিরলোই বা কি উপায়ে, ইত্যাদি সংবাদগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং মামুলিভাবে শেষ হ'য়ে যাবার পরে নিত্যপ্রসাদ শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজেছিলেন। দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ক'রে একবার বেজে উঠতেই শব্দটা যেন তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের ওপর হাতুড়ির ঘা মারলো। উঠে প'ড়ে ঘড়িটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ক'টা বাজলো?'

চেয়ারের পিঠ থেকে মাথা তুললো না উন্মেষ।

উঠলেন নীরজা। নিত্যপ্রসাদের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনি এবার শুয়ে পড়ুন বিছানায় এসে।'

'তোমরা যাও, তার পরে যা করতে হয় আমি করছি।'

উন্মেষের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নীরজা। ঘূর্ণি একবার ভাবলো জ্যাঠামণিকে চেয়ার থেকে খাটে নিয়ে আসবে কি না, কিন্তু

শেষপর্যন্ত তার সাহসে কুললো না। সে-ও বেরিয়ে এলো, তেতলায় শোবার ঘরে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝুপ্ ক'রে শুয়ে পড়লো নিজের খাটটার ওপর।

এর পরে আর বড়োভাসুরকে ডেকে তোলার কথা ভাবতে পারলেন না নীরজা। থাকো আজ এমনি ক'রেই, মরো কপাল টাটিয়ে, যেমন কর্ম তার তেমনি তো ফল পাবে।

উন্মেষকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথার কাছে বসলেন নীরজা, বললেন ঝুঁকে প'ড়ে, 'যন্ত্রণা হচ্ছে কপালে, হ্যাঁ রে?'

ক্লিষ্ট হাসির একটা রেখা ফুটলো উন্মেষের ঠোঁটে, ছোটোমামির একটা হাত মুঠির মধ্যে ধ'রে বললে, 'ছোটোমামি, তুমি না থাকলে আমি কী করতাম!'

'গোল্লায় যেতিস। আমি যাই— তুই একা থাকতে পারবি তো?'

'না।' আরো শক্ত ক'রে ধরলো উন্মেষ নীরজার হাতখানা।

'তবে ঘুমো, আর কথা বলিসনে। আমি আছি। নে, চোখ বোজ।'

'তুমি কি সারা রাত জেগে ব'সে থাকবে?'

উন্মেষের চোখের ওপর হাতচাপা দিলেন নীরজা।

ঘুমিয়ে পড়তে বিশেষ দেরি হ'লো না উন্মেষের। আস্তে-আস্তে উঠলেন এক-সময় নীরজা। আলনা থেকে উন্মেষের আলোয়ানটা টেনে নিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ক্লান্ত মন্থর পায়ে উন্মেষের ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকলেন গিয়ে ঠাকুরঘরে।

** পাঁচ **

শিবপ্রসাদের মেজো ছেলে বিরাজের গলা-রেয়াজের প্রচণ্ড নিনাদে ঘুম ভেঙে গেল নীরজার। শুধু একটি মাদুরের ওপর আলোয়ানখানি গায়ে জড়িয়ে সারা-রাত কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিলেন তিনি ঠাকুরঘরের মেঝেয়। এই কৃচ্ছ্রসাধনে, এই দুঃখযাপনে ঠাকুরের অনুগ্রহে এ-বাড়ির ওপরে ঘনিয়ে-আসা দুষ্টগ্রহের কোপ যদি কেটে যায়! উঠে দাঁড়ালেন নীরজা, তারপর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন ঠাকুরকে, ইষ্টনাম জপতে-জপতে হাড়কাঁপানো শীতে ঝাঁকুনি খেতে-খেতে এসে দাঁড়ালেন উন্মেষের ঘরের দরজায়। ভাবলেন, মেজোভাসুরকে আগে একবার দেখে আসবেন নাকি উঁকি দিয়ে, কিন্তু শেষে উন্মেষের ঘরে এসেই ঢুকলেন। আর ঢুকেই চমকে উঠলেন। আলো জ্বেলে উন্মেষ কী লিখছে ব'সে-ব'সে টেব্‌লে!

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন নীরজা উন্মেষের পাশে।

'উনিশ!'

মাথা তুললো উন্মেষ। হাসলো একটু ছোটোমামির দিকে তাকিয়ে।

'কী লিখছিস? সারা-রাত ব'সে-ব'সে এই কচ্ছিস নাকি, অ্যাঁ—'

কিছু বলে না উন্মেষ। মিটিমিটি হাসতেই থাকে।

'কী ছেলে রে বাবা—' বকতে-বকতে উন্মেষের গায়ে-পিঠে হাত দেন নীরজা। আর-এক দফা চমক লাগে তাঁর, 'জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে রে, অ্যাঁ···হ্যাঁ রে—'

অস্থির হ'য়ে পড়েন তিনি। জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে লেপ-চাপা দেন উন্মেষকে। কী করবেন ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে গিয়ে মেয়েকেই টেনে তুললেন ঘুম থেকে। 'তোর বড়োজ্যাঠাকে—' উৎকণ্ঠায় গলা জড়িয়ে যায় নীরজার, 'ত্যাখ তো রুনি, খবরটা যদি দিতে পারিস—'

ঘূর্ণি ব'সেই থাকে আবিষ্টের মতো। তাড়া দিলেন নীরজা। শেষে ঘূর্ণি বললে, 'বাইরের কোনো ডাক্তারকে ডাকলে হয় না?'

গুম হ'য়ে রইলেন নীরজা। বাইরের ডাক্তারের কথা কি তাঁর মনে আসেনি! কিন্তু বড়োভাসুরকে না জানিয়ে বাইরের ডাক্তার আনলে কথাটা তো উঠবেই তাঁর কানে। তখন যদি হিতে বিপরীত হয়!

কিন্তু ঘূর্ণি কিছুতেই যেতে রাজী হয় না শিবপ্রসাদের কাছে।

নীরজা নেমে এলেন দোতলায়। এসে দাঁড়ালেন ননদ বিভাবতী তাঁর ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে-ঘরে আছেন সেই ঘরের দরজায়। কিন্তু দরজা বন্ধ। অনেক টোকা দিলেন, চাপা-গলায় ডাকলেনও অনেকক্ষণ, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিভাবতীর ঘুমটা একটু গাঢ়, সাতটি ছেলে-মেয়ের মা হবার পরেও, এই আটত্রিশ বছর বয়সেও।

অস্থিরতা বাড়লো নীরজার। কী করবেন ঠিক করতে না পেরে পা বাড়ান নিজের ঘরের দিকে। আর তখন, যাঁর সাক্ষাতের জন্যে এত উদ্বেগ, সেই শিবপ্রসাদ একেবারে মুখোমুখি প'ড়ে গেলেন প্যাসেজটার মধ্যে। বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন শিবপ্রসাদ, নীরজাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে তিনিও থামলেন।

মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি একটু টেনে দিয়ে মেঝেয় চোখ রেখে নিচু-গলায় বললেন নীরজা, 'উনিশের বড্ড জ্বর এসে গেছে—'

'তার মানে? ওকে তো পুলিশে—'

'ও—' তাড়াতাড়ি বললেন নীরজা, 'ও কাল রাত্রেই ছাড়া পেয়ে গেছে···অনেক রাত্রে ফিরেছে, কপালে রক্ত দেখলাম, জ্বরও এসে গেছে ভয়ানক।'

কয়েক মুহূর্ত থমকে রইলেন শিবপ্রসাদ। তারপর কিছু না-ব'লেই খড়ম খটখট করতে-করতে চ'লে গেলেন বাথরুমের দিকে।

কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ফিরে এলেন নীরজা উন্মেষের ঘরে।

'এই যে রুনি, এসেছিস? এই বিপদের সময় অমন গোমড়ামুখ হ'য়ে থাকিসনে তো। হয়েছে কী তোর? সব্বাইকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা, এক-একটি যেন এক-এক অবতার।'

'আমার অপরাধটা কি জানো ছোটোমামি, কাল রাত্তিরে সেই যে বিনতা ব'লে মেয়েটি এসেছিলো তার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিইনি ব'লে—' উন্মেষ হঠাৎ উঠে ব'সে এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে ঘূর্ণির আর অন্য হাতে টিপে ধরে ওর নিচের ঠোঁটটা, বলে, 'নে, হয়েছে, আর মা-কালী হ'য়ে থাকতে হবে না।'

এক-ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ঘূর্ণি।

কিন্তু—

দেড়ঘণ্টা পরে, শিবপ্রসাদ যখন তাঁর চেম্বার্সে বেরুবার পোশাক প'রে উন্মেষের ঘরে এসে পা দিলেন, তখন পাড়ার এম. বি. ডাক্তার বি. হাজরা উন্মেষের প্রেসক্রিপ্‌শন লিখে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। শিবপ্রসাদকে দেখে ডাক্তার হাজরা দাঁড়িয়ে পড়লেন বিনীত ভঙ্গিতে। শিবপ্রসাদের ভারী গোল মুখখানা আরো গোল, আরো থমথমে হ'য়ে গেল।

এবং—

ঘুম থেকে উঠে আদিত্যপ্রসাদ যখন উন্মেষের ব্যাপারটা শুনলেন বিভাবতীর মুখে সবিস্তারে, রেগে টং হলেন তিনি। আবার ভয়ে-ভাবনায় বিচলিতও কম হলেন না। রাগলেন, কেননা পঞ্চাননের পক্ষ নিয়ে উন্মেষের মারামারি করার মানে তো তাঁরই বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ; আর ভয় পেলেন, কেননা, এত দুঃসাহস তোমার যে একেবারে পুলিশ অফিসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে? আস্কারা পেয়ে-পেয়ে ওজন ভুলে গেছো

নিজের, কেমন না? বাহাদুর হয়েছো! সাপের পাঁচ-পা দেখার পরিণাম বুঝবে, দাঁড়াও!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে মেঘ না চাইতে জলের মতো ইন্সপেক্টরির বালুচড়া থেকে উৎরতে পেরেছেন আদিত্যপ্রসাদ গেজেটেড অফিসরের তখ্‌তে। এখন শুধু অপেক্ষায় আছেন কবে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের মতো শুরু হ'য়ে যাবে তৃতীয় মহাযুদ্ধটি— আর সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে তখ্‌ৎ-ই-তাউস! ডিস্ট্রিক্ট অফিসার! কিন্তু এখন? এখন যদি রিপোর্ট যায় তাঁর নামে অ্যাডমিনস্ট্রেশনের কাছে— তবে কে সামলাবে? এক-গুদাম বারুদেই যেন আগুন লেগে গেল, হাঁকলেন আদিত্যপ্রসাদ, 'অ্যাই! অ্যাই ভজা, তোর ছোটো-মা কোথায়? ঠাকুরঘরে?'

'আইজ্ঞা সোন্দরদাদাবাবুর ঘরে—'

'নিকুচি করেছে সোন্দরদ্যাদাবাবুর! রাস্‌কেল, ব্লাডি ফুল কোথাকার! চাবুকে পিঠের ছাল তুলে দিতে হয়—' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে এসে হাজির হলেন আদিত্যপ্রসাদ উন্মেষের ঘরে।

উন্মেষের ঘরে তখন ছোটোখাটো একটি জনতা। বাড়ির বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলি সব তো এসে জুটেছেই, বয়স্কাদের মধ্যেও এক নয়নতারা আর নীরজা ছাড়া আর-সবাই আছে। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে ব'সে আছে অখিল। আর এত লোকের কৌতূহলের পাত্রটি আপাদমস্তক গা ঢাকা দিয়ে আছে লেপের তলায়।

'কী ব্যাপার, বিপ্লব করতে গিয়ে ভাল্লুক-জ্বর এসে গেল নাকি! অ্যাঃ!'

সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে সবাই। কেউ রা শব্দ করলে না। বিম্বাবতী এক পাশ থেকে চোখের ইশারায় আদিত্যপ্রসাদের দৃষ্টি অখিলের ওপর এনে দিলেন। দু-পা এগিয়ে এসে আদিত্যপ্রসাদ অখিলের সামনে পিঠ

চিতিয়ে দাঁড়ালেন। কোমরে হাত রেখে বললেন, 'কী হে, কী ঠাউরেছো বলো দেখি—'

চোখ-মুখ রিরি ক'রে ওঠে অখিলের। আদিত্যপ্রসাদকে সম্মান দেখানোর জন্যে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো সে কিন্তু তাঁর রকম-সকম দেখে গরম হ'য়ে গেল তার মেজাজ, ব'সে থেকেই বললে শক্ত হ'য়ে, 'কী সম্বন্ধে বলুন দেখি!'

'কী সম্বন্ধে জানো না বদ্‌ ছোকরা কোথাকার!'

তড়াক ক'রে উঠে বসলো উন্মেষ।

'কী, মারবি নাকি! অ্যাঃ! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিতে হয় সব ধ'রে-ধ'রে—'

উত্তেজনার তাপে টগবগ ফুটতে-ফুটতে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যান আদিত্য-প্রসাদ ঘর থেকে।

আর নিত্যপ্রসাদ, উন্মেষের সর্দিটি হ'লে পর্যন্ত উদ্বেগে ঘুম হয় না যাঁর, সেই মানুষ নীরজার মুখে সব শুনেও উন্মেষের ঘরে ছুটে এলেন না, গোঁজ হ'য়ে ব'সেই রইলেন ইজিচেয়ারটায়। নীরজা বোঝানোর চেষ্টা করলেন তাঁকে, তিনি ভুল করছেন। উনিশ সম্বন্ধে যা ভয় করছেন তিনি আসলে সে কিন্তু সেরকম কিছুই হ'য়ে যায়নি। সমস্ত উদ্বেগটাই তাঁর মনগড়া, কল্পনামাত্র, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়, নিত্যপ্রসাদের মুখের অন্ধকার কাটলো না। বরং নীরজার সালিশীতে আরও বিরক্ত আরও বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি। যেন আরো নিশ্চিত হ'য়ে গেলেন যে, উন্মেষ এখন সেই জাতের ছেলেদের দলে গিয়েই ভিড়েছে যারা স্কুল-কলেজে ঢোকে কেবল স্ট্রাইক করবার জন্যে, যারা মানী লোককে মান্য করবার শিক্ষাটাও পায়নি, যারা রাজনীতির নামে অরাজকতায় মশগুল হওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে না। ব্যাপারটা যতই

তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন, উন্মেষের ইদানীংকার কথাবার্তা আর আচরণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে যতই চেষ্টা করেন— তীব্র শীতের একটা খিচ-ধরা কাঁপুনি লাগে তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বিশ্রি এক শিথিলতার সংক্রমণে লোপ পেয়ে যেতে থাকে তাঁর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি। স্মৃতির কুঠরিগুলিতে তাঁর সমস্ত অতীত, তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বছরের সমস্ত ঘটনা যেন ঝিকিয়ে উঠতে থাকে, প্রাক্তন চিন্তায় অধীর অস্থির হ'য়ে পড়েন ক্রমশ— স্মৃতিভ্রংশ ঘটতে থাকে নিত্যপ্রসাদের। জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বই আর উন্মেষ এই দুই অবলম্বন ছিলো তাঁর— অথবা ঐ-দুটিকে মিলিয়ে এক অবলম্বন। এই একমাত্র সম্পদকে, এই একটিমাত্র স্বপ্নকে তিনি এতকাল ধ'রে ছেনি দিয়ে কেটে-কেটে বাটালি দিয়ে খুদে-খুদে তিলোত্তমা-সাধনায় তিল-তিল ক'রে সৌন্দর্য ও সংযমের ষড়ৈশ্বর্য কারুকলায় যে-মূর্তিটি গ'ড়ে তুলতে নিবিষ্ট ছিলেন, প্রায় সুসম্পূর্ণ ক'রে এনেছিলেন তাঁর জীবনের মহত্তম যে-সৃষ্টি— আজ চোখের পলকে ভোজবাজির মতো ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সে-মূর্তি, বুঝি-বা মুহূর্তের কোনো পদস্খলনে স্রষ্টার ভূমিকা থেকে খারিজ হ'য়ে গেলেন তিনি, জীবিতের তালিকা থেকে নাম কাটা গেল তাঁর। এতদিনে তা'হলে দেহটা তাঁর স্থূল কুৎসিত মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হ'লো, আর আত্মাহীন এই বীভৎস মাংসপিণ্ডটা পুড়িয়ে ফেললে পৃথিবীতে তো আর কোনো চিহ্নই তাঁর থাকলো না! ঘরময় উন্মত্তের মতো পায়চারি করতে থাকেন নিত্যপ্রসাদ।

ঘরে ঢুকলো ঘূর্ণি। সন্তর্পণে। এক হাতে এক-বাটি দুধ, আর-এক হাতে রেকাবভরা ফল-মিষ্টি। কাল বিকেল থেকে কিছু খাননি নিত্যপ্রসাদ, সকালে তাই নীরজা বেশি ক'রে খাবার পাঠিয়েছেন, জোর-জবরদস্তি ক'রে সমস্তটা খাইয়ে দিতে ব'লে দিয়েছেন মেয়েকে।

থমকে দাঁড়ান নিত্যপ্রসাদ। স্থির গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঘূর্ণির দিকে।

বুক দুড়দুড় ক'রে ওঠে ঘূর্ণির। কোনোরকমে চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। এগিয়ে গিয়ে খাবারগুলো বেঁটে তেপায়াটার ওপর নামিয়ে রেখে সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘূর্ণি ডাকলো, 'জ্যাঠামণি—'

নিশ্চল পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিত্যপ্রসাদ। কোনো সাড়া দিলেন না ঘূর্ণির ডাকে, কিন্তু তাকিয়ে রইলেন ওর দিকেই অর্থহীন দৃষ্টিতে।

এগিয়ে এলো ঘূর্ণি। আদুরে আব্দারে ভঙ্গিতে টানতে-টানতে নিয়ে এলো তাঁকে ইজিচেয়ারে, নিজেও ব'সে পড়লো সে জ্যাঠামণির পায়ের তলে কোল ঘেঁষে, বলতে লাগলো, 'কাল রাত্তির থেকে কিছু খাওনি তুমি, খিদে লাগে না তোমার? আর ভালো কথা, জ্যাঠামণি, আজ রেডিওতে টক্ আছে তোমার, মনে আছে তো? ঠিক ভুলে ব'সে আছো! যা ভেবেছি তাই। মহাত্মার মৃত্যুদিবস আজ, রাত আটটা পনেরোতে মহাত্মা সম্বন্ধে তোমার টক্— মিনিটাও যেতে চাচ্ছে তোমার সঙ্গে, জানলে জ্যাঠামণি, বলছে রেডিওতে কীরকম ক'রে সব হয়-টয় ও ভ্যাখেনি কিছু, দেখবার ভীষণ শখ!'

কিন্তু ঘূর্ণির বাক্যস্রোত স্তব্ধ হ'লো, ভয়ে তার মুখ আরও শুকিয়ে গেল জ্যাঠামণির খাওয়া দেখে। ব'সে প'ড়েই বিনা বাক্যব্যয়ে নিত্যপ্রসাদ খেতে আরম্ভ করেছেন, যেন উদগ্র ক্ষুধার টানেই গোগ্রাসে গিলে ফেললেন সব দেখতে-দেখতে, একটি শাঁখআলুর টুকরোও প'ড়ে রইলো 'না রেকাবে এবং এ-সব শেষ ক'রে এক-চুমুকে চোঁচোঁ ক'রে টেনে নিলেন দুধটা। গোঁফে লাগলো দুধ, খানিকটা প'ড়েও গেল ঠোঁটের পাশ বেয়ে। ঘূর্ণি এতটা সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি

মুখটা মুছিয়ে দিলো আঁচল দিয়ে, তারপর পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো তাঁর দিকে তাকিয়ে।

'জল!' ক্ষুধা-পরিতৃপ্ত নির্বোধ একটি বালকের মতো নিত্যপ্রসাদ এবার জল চাইলেন।

দৌড়ে পালালো ঘূর্ণি। ছুটে একেবারে ঠাকুরঘরে। কিন্তু নীরজা সেখানে নেই দেখে উন্মেষের ঘরে এলো। নীরজা ছাড়া এখন আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই সেখানে। উন্মেষ শুয়ে আছে, আর নীরজা মেজার-গ্লাসে ওষুধ ঢালছেন টেব্‌লের পাশে দাঁড়িয়ে। ঘূর্ণি ঘরে ঢুকেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো, বললে, 'জ্যাঠামণি কেমন করছেন মা—'

নীরজা চমকে উঠলেন, হাত থেকে তাঁর ওষুধের শিশিটা প'ড়ে গিয়ে ভেঙে গেল, ব্যাকুল হ'য়ে ছুটলেন তিনি নিত্যপ্রসাদের ঘরে। উন্মেষও লেপটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক ক'রে উঠে পড়লো যাবার জন্যে।

'ও.কি মা, ওকি—'

সামলালো ঘূর্ণি নীরজাকে, বললে, 'তুমিও কি খেপে গেলে নাকি—কথা না-শুনেই ছুটছো অমনি!'

সন্ধের সময় নিত্যপ্রসাদের রেডিওতে বক্তৃতা দিতে যাবার তোড়জোড় শুরু হ'লো। তিরিশে জানুআরি, গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ-দিবস। রেডিওতে তাই আজ বিশেষ অনুষ্ঠান। নিত্যপ্রসাদ ভাষণ দেবেন গান্ধীজী সম্বন্ধে। রেডিও, সভাসমিতি বা কোনো পার্টিতে যেতে হ'লে ঘূর্ণি নিত্যপ্রসাদের নিত্যসঙ্গিনী। আজ অবিশ্যি ঘূর্ণির সুপারিশে মিনুও যাবে সঙ্গে।

কিন্তু নিত্যপ্রসাদ চ'টে উঠলেন গাড়িটা নিয়ে শিবপ্রসাদ বেরিয়ে গেছেন শুনে। এমনি কারণে নিত্যপ্রসাদ রাগ করতে পারেন, আর

সে-রাগ এমনি কটুভাবে প্রকাশ করতে পারেন, এ কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। কিন্তু আজ যেন নিত্যপ্রসাদ সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ডেকে পাঠালেন নীরজাকে। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমার কত টাকা জমা আছে ছোটো-বৌ?'

অবাক তাকিয়ে রইলেন নীরজা নিত্যপ্রসাদের মুখের দিকে।

'হিসেব করা নেই, কেমন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি কিছু হিসেব চাচ্ছিনে। কিন্তু টাকা তো জীবনে আমি কম উপার্জন করিনি, হাজার দশ বারো টাকাও আমার হবে না? আচ্ছা ডাকো তো বীরেন্দ্রকে।'

বীরেন্দ্র দত্ত এ-বাড়ির এক আশ্রিত যুবক। বিষয়-আশয় কাজ-কারবার সম্পর্কে নাকি ভারি সাফ মাথা বীরেনের— এ-বাড়িতে ছেলে-বুড়োর কাছে তার এমনি একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু সে-খ্যাতি যে নিত্যপ্রসাদের কানেও পৌঁচেছে— বীরেন অন্তত তা ভাবতে পারেনি কখনো। নিত্যপ্রসাদ তাকে ডাকছেন শুনে ভারি আশ্চর্য হ'লো সে। হন্তদন্ত ছুটে এলো।

'হ্যাঁ হে বীরেন্দ্র, একটা মোটরকার কিনতে কত লাগে?'

এদিকে, উন্মেষের ঘরে তখন দস্তুরমতো আড্ডা জ'মে উঠেছে। বন্ধু-বান্ধবীরা অনেকেই এসেছে তাকে দেখতে। কাল রাত্রের দুর্ভোগের মধ্যে যারা তার সঙ্গী ছিলো, তাদের মধ্যে অখিল আর পঞ্চানন ছাড়া আর সবাই উপস্থিত। আর এসেছে রুচিরা।

চা-বিস্কুট চলছে এমন সময় ঘূর্ণি এসে ঢুকলো একটা ঘূর্ণি হাওয়ার মতোই। একেই চেহারাটি তার সম্মোহিনী, তার ওপর জমকালো সাজ-সজ্জায় বিদ্যুল্লতা রূপসীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। সবাই ন'ড়ে-চ'ড়ে

বসলো। ঘূর্ণি উন্মেষের বুকে-পিঠে হাত দিয়ে জ্বর কতটা আছে আন্দাজ করলো, তারপর লেপটা ওর গায়ের ওপর টেনেটুনে ঠিকঠাক ক'রে দিতে-দিতে উপদেশ দিলো ব্যস্ত গলায়, 'বেশি বকবক ক'রে জ্বরটা বাড়িয়ো না যেন, আমি যাচ্ছি জ্যাঠামণির সঙ্গে, ফিরে আসতে-আসতে তো সেই দশটা বেজে যাবে। তুমি তো ততক্ষণে ঘুমিয়ে যাবে, না? আচ্ছা ঠিক আছে। আর শোনো, তুমি তো জ্যাঠামণির রেডিও-টক্ শুনতে চাও, না?'

'তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে তো পাকা মেয়ে।' ঠেলে দেয় উন্মেষ ঘূর্ণিকে।

দুরন্ত ছেলেকে সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবার মতো একটা ভঙ্গি করলো ঘূর্ণি, উঠে প'ড়ে বললে, 'মাকে ব'লে রেখেছি, সময়মতো মা এসে নিয়ে যাবে'খন তোমাকে আমার ঘরে।'

সোয়া-আটটায় নিত্যপ্রসাদের ভাষণ। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা হৈহৈ ক'রে আটটার আগেই এসে হাজির হ'লো ঘূর্ণিদের শোবার ঘরে, রেডিওটার পাশে। নীরজা উন্মেষকে ধ'রে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। নিজেও বসলেন। বড়োদের মধ্যে আর এলেন বিভাবতী।

বড়ো দুর্ভাবনায় আছেন নীরজা, কি-জানি কী কেলেঙ্কারি ক'রে বসেন আজ মেজোভাসঠাকুর। যা তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে তাঁর, বক্তৃতা পড়তে গিয়ে না— মনে-মনে ইষ্টনাম জপতে থাকেন তিনি। উন্মেষেরও ঠিক এই ভাবনাটাই হ'লো। তাছাড়া, একটু আগেই ঘোষণা পাওয়া গেছে রেডিওতে, আজও কয়েকটা এলাকায় দাঙ্গা হয়েছে। সেই-সব এলাকায় আজও কারফিউ হ'য়ে যাবে আটটা থেকে। দাঙ্গারি খবরের পরে রামধুন হচ্ছে রেডিওতে, আর তা শুনতে-শুনতে ভয়টা তার আরও চারিয়ে গেল, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মনে হ'তে লাগলো তার,

সমস্ত দেশটা যেন একটা শ্মশানভূমি, আর সেই শ্মশান থেকে ছমছমে ভয়-ধরানো স্বরে ভেসে আসছে এই রামধুন।

আটটা পনেরো। নিত্যপ্রসাদ বলবেন সেই ঘোষণা পাওয়া গেল। বড়োদের দেখাদেখি ছোটোরাও নিশ্বাস রোধ ক'রে রইলো। নিত্যপ্রসাদ বলতে আরম্ভ করলেন। ধক্ ক'রে উঠলো নীরজার বুকের মধ্যে— স্বাভাবিক হচ্ছে না তো নিত্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর! অত্যন্ত ভারী অত্যন্ত বিকৃত শোনাচ্ছে! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো নীরজার। অসহায়ের মতো চোখ মুছতে লাগলেন তিনি। লজ্জায় দুঃখে মনে-মনে তিনি আরো অবসন্ন হ'য়ে যেতে লাগলেন।

এমনি সময় একটি ঘটনা ঘটলো, যা এর আগে হয়তো এ-বাড়িতে ঘটা অসম্ভবই ছিলো।

ঘটনাটার উৎপত্তি দোতলায়। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনো নিয়ে কোনোদিনই মাথা ঘামান না শিবপ্রসাদ। কিন্তু আজ খানিক আগে বাড়ি ফিরেই, গাড়ির ব্যাপার নিয়ে নিত্যপ্রসাদ যে-কটূক্তি করেছেন তাঁকে উদ্দেশ ক'রে সেগুলি স্ত্রী নয়নতারার মুখে সালঙ্কার টিপ্পনী সহযোগে শুনতে-শুনতে খেপে একেবারে অগ্নিশর্মা হলেন তিনি। লক্ষ্য করলেন ঘরের এক কোণে ব'সে-ব'সে তাঁর দুই মেয়ে চিনু ও গিনু ব্যাগাটেলি খেলতে ব্যস্ত। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন শিবপ্রসাদ, 'এই! এই! পড়াশুনো নেই তোদের?'

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো মেয়ে দুটি। চিনু বললে, 'আজ ছুটি দিয়েছে মাস্টার— মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন, আর রেডিওতে বড়োকাকা টক্ দেবে কিনা, তাই—'

'অঃ! তাই! তা আরগুলো সব কোথায়? মন্টি ঝন্টি গেছে কোন চুলোয়?'

'ওরা ওপরে গেছে বড়োকাকার টক্ শুনতে রেডিওতে।'

'ঝন্টে! এত লায়েক হ'য়ে গেছে এখুনি! যা, ডেকে নিয়ে আয় এক্ষুনি! কান ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসবি, যা—'

নিত্যপ্রসাদের ভাষণ চলছে। থমথমে হাওয়া। স্থির, তটস্থ সবাই। আর, তারই মধ্যে গিনু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ঘরের দোরগোড়া থেকে, 'মন্টি ঝন্টি, বাপি তোদের ডাকছে এক্ষুনি, শিগগির চ'লে আয়—'

হিস্‌হিস্ শব্দ উঠলো ঘরখানার মধ্যে। সকলের ঠোঁটেই আঙুল চাপা পড়লো। কিন্তু গিনুর তাতে বোধের উদয় হ'লো না। এগিয়ে এসে সে বাচ্চাদের ভিড়ের মধ্যে থেকে টান মারলো ঝন্টির কান ধ'রে।

ঝন্টি হাউমাউ ক'রে উঠলো, আর-আর বাচ্চারা সোরগোল বাধিয়ে দিলে, আর উন্মেষ ঠাস ক'রে এক চড় মেরে বসলো গিনুর গালে। চিনু দৌড়ে নেমে গেল দোতলায়। খবর পেয়ে একটু পরেই শিবপ্রসাদ যখন স্বয়ং এসে হাজির হলেন, ততক্ষণে ঘরটা আবার শান্ত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু তাঁকে দেখেই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো আবার, গিনু ব'সে ছিলো মুখ ঢেকে মেঝের ওপর, তাঁকে দেখেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মুহূর্তমাত্র থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবপ্রসাদ চৌকাঠের ওপর, ইচ্ছে হ'লো তাঁর লাথি মেরে চুরমার ক'রে দেন রেডিওটা, কিন্তু তা করার বদলে এগিয়ে এসে টেনে তুললেন ঝন্টি-মন্টিকে কানে ধ'রে, আর তারপর উন্মেষের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বেরিয়ে গেলেন ওদের নিয়ে।

হতভম্ব, স্তম্ভিত সবাই। গিনু কাঁদতে থাকে উঁ-উঁ ক'রে। আর তারই মধ্যে তখনো নিত্যপ্রসাদের গলা শোনা যায় : 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি, একটা গৃহযুদ্ধই আজ আমাদের দেশে আসন্ন। দেখতে পাচ্ছি, ব'য়ে যাচ্ছে সমস্ত দেশের বুকের ওপর দিয়ে বর্বর একটা তাণ্ডবলীলা, একটা নিষ্ঠুর রক্তের স্রোত। কেননা, চোরাকারবার যে শুধু আজ হাটে-

বাজারেই হচ্ছে তাই নয়, তার চাইতেও বড়ো চোরাকারবার চলছে আজ আমাদের মনে! মনের একেবারে অন্দরমহলে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়ায় আজ আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিপর্যস্ত, আর মানুষের মনের মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়ায় আজকের সভ্যতা, আজকের মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিধ্বস্ত হ'তে চলেছে। আজ তাই স্মরণ করি সেই মহামানবকে, একা যিনি রক্ষা করতে পারতেন এই দুর্ভাগা দেশকে, এই হতভাগ্য জাতিকে—'

* * ছ য় * *

বিদ্বেষের বাষ্প মিত্রসদনের কক্ষে-কক্ষে কেমন ক'রে পুঞ্জ-পুঞ্জ জমা হচ্ছিলো দিনের পর দিন কে জানে, কিন্তু ঝড় যখন উঠলো তখন তা অতর্কিতে উত্তর আকাশ কালো ক'রে উড়িয়ে-পুড়িয়ে সব ছারখার ক'রে দেবার জন্যে সর্বনেশে এক কালবৈশাখীর মতোই এসে হাজির হ'লো। দেশময় জ্বলছে অশান্তির আগুন। নীরজা বলেন, 'ঐ যে বলে না— জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা, এ হয়েছে তাই। নইলে সুখের সংসার আমার, কিছুর মধ্যে কিছু না, আমার ঘরে এমন আগুন লাগবে কেন!' ঘূর্ণি তার উত্তরে শুধু মুখ মচকায় আর বলে, 'লাগবে না! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় যে তোমাদের!'

কিন্তু নয়নতারা ছড়া কাটেন অন্যরকম। বিলম্বিত দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে দাসীর কোলে পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে-শুয়ে পান চিবোতে-চিবোতে বলেন, 'বুঝলে ঠাকুরঝি, শাস্তরেই বলেছে— ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গোরু টেঁকে ব'সে!' 'যা বলেছো—' বিভাবতীও কম যান না কিছু, সুরে সুর মিলিয়ে বলেন তৎক্ষণাৎ, 'বলেই তো— যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। তা সে যতই না দুধকলা দিয়ে পোষো তারে। তোমার মনে আছে বৌঠান— মেজদা যখন নিয়ে এলো উনিশকে নিজের কাছে রাখবার জন্যে, পইপই ক'রে মানা করেছিলাম আমি দিদিকে— দিস্‌নে দিদি দিস্‌নে, ছেলে কিন্তু তোর মানুষ হবে না, মানুষ হবে না, এই ব'লে রাখলাম। এখন বোঝো!'

আদিত্যপ্রসাদের সমস্যা অন্যরকম। তিনি নীরজাকে বলেন, 'এক মিনিট দাঁড়ানোর সময় হবে? না, দাঁড়াতে গেলে তোমা বিহনে তেতলার বিন্দেবনটি আঁ-ধা-র হ'য়ে যাবে? তবে থাক, যাও যাও, তাড়াতাড়ি যাও!'

শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে যান নীরজা, ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত, শেষে বলেন ঠাণ্ডা গলায়, 'মুখে যে কিছুই আর আটকায় না দেখছি!'

'শাক দিয়ে মাছ কদ্দিন আর লুকিয়ে রাখা যায় গো সতীসাধ্বী—' দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠেন আদিত্যপ্রসাদ, খপ্ ক'রে চেপে ধরেন নীরজার একটা হাত, ভেংচি কেটে বিকৃত মুখে বলেন, 'তুমি ভাবো তুমিই একা বুদ্ধিমান, আর সবাই বোকা, না?'

তাল-মান-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যায় নীরজার, ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, ঠোঁট দুটি তাঁর থরথর কেঁপে-কেঁপে ওঠে, বলবার মতো কিছুই ভেবে পান না তিনি।

এর মধ্যে শিবপ্রসাদকে একদিন দেখা গেল নিত্যপ্রসাদের ঘরে। এমনি অভাবনীয় ঘটনায় নিত্যপ্রসাদও বিস্মিত হ'য়ে যান। ভ্রূ-কুঞ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকেন শিবপ্রসাদের দিকে। নিত্যপ্রসাদের ইজিচেয়ারের নিকটতম সোফাটিতে ধীরেসুস্থে বসলেন শিবপ্রসাদ, তারপর বললেন, 'উনিশ সম্পর্কে কী করবে ভাবছো?'

কথাটার প্রতিক্রিয়ায় নিত্যপ্রসাদের মুখে বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায় : প্রথমে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিভে গিয়ে বিমর্ষ ও বিমলিন হ'লো মুখখানা। ক্রোধ, বিরক্তি, খেদ, হতাশা এবং সর্বশেষে অবোধ একটা উত্তেজনা। প্রায় মিনিট দুয়েক পরে, ততক্ষণ শিবপ্রসাদ অর্ধনিমীলিতচক্ষে নিদিধ্যাসন করলেন, জবাব দিতে পারলেন নিত্যপ্রসাদ, 'চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক, আমার কী! সমস্ত পৃথিবীটাই জাহান্নমে যাচ্ছে, কে ঠেকাবে! আউট অব কণ্ট্রোল! আউট অব কণ্ট্রোল, বুঝলে!' বলতে-বলতে উঠে পড়েন চেয়ার থেকে, এক-চক্কর পাক খান, শেষে ছিটকে এসে বসেন আবার চেয়ারেই।

একটু বাদে আবার বললেন শিবপ্রসাদ, শান্ত মৃদু তাঁর গলা, 'মন্মথকে আসতে লিখে দেয়া যাক, সে এসে ওর অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করুক!' একটু পরে আবার বললেন, 'কে লিখবে চিঠি?'

চোখ বুজে ঘাড় গুঁজে গুম হ'য়ে রইলেন কিছুক্ষণ নিত্যপ্রসাদ, কিন্তু এর পর চোখ খুলে ঘাড়টা বেঁকিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন শিবপ্রসাদের দিকে। চমকে উঠলেন শিবপ্রসাদ। অসহ্য ঘৃণায় ফেটে পড়ছে নিত্যপ্রসাদের দুই চোখ। কিন্তু সে-জন্যে তো চমকালেন না তিনি, ডাক্তারের তীক্ষ্ণ চোখ তাঁর। তিনি চমকালেন অন্য কারণে। এ কিসের বিকার নিত্যর চোখে? তবে কি— ধক্ ক'রে উঠলো তাঁর বুকের মধ্যে, মনে প'ড়ে গেল তাঁর বাবার কথা। শেষ বয়সে টাকার নেশায় শেয়ার-মার্কেট আর ঘোড়দৌড়ের মাঠের উন্মত্ত তোড়ের মধ্যে প'ড়ে এবং একটার পর একটা মার খেয়ে-খেয়ে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন রায়সাহেব ত্রিপুরাশঙ্কর। মারাও গিয়েছিলেন তিনি রয়্যাল এক্সচেঞ্জের কুম্ভীপাকের মধ্যে হার্টফেল ক'রে। আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে শিবপ্রসাদ চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। কিন্তু যেতে-যেতে শুনলেন, চেঁচিয়ে বলছেন নিত্যপ্রসাদ, 'পালাচ্ছো কেন, ভয় নেই ভয় নেই! আমার পাপ আমিই বিদেয় করবো, কোনো চিন্তা নেই তোমাদের!'

খড়ের চালে আগুনের মতো কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। কথাটা হচ্ছে এই যে, নিত্যপ্রসাদ পাগল হ'য়ে গেছেন।

নিত্যপ্রসাদের রেডিও-বক্তৃতার পরে বারো দিন কেটে গেছে। সেদিন আপিস-কাছারি সব ছুটি। হঠাৎ রুচিরা এসে ঢুকলো উন্মেষের ঘরে। স্কটিশের থার্ড ইয়ার ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী সে, পড়াশুনোর

সূত্রেই উন্মেষের সঙ্গে তার পরিচয়। আর সে-পরিচয়কে রঙিন ক'রে তুলতেই রুচিরার অশেষ আগ্রহ।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রুচিরা যে উন্মেষের ঘরে আর কেউ নেই। এমনকি ঘূর্ণিও না। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলে সে নির্ভীক চিত্তে।

খাটের ওপর উপুড় হ'য়ে ডুবে ছিলো উন্মেষ একগাদা বই-খাতার সমুদ্রে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে। হাসি-হাসি ক'রে তুলতে চেষ্টা করে মুখখানা। উন্মেষের সৌজন্যের এই জড়তায় একটু ধাক্কা খায় রুচিরা। আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলা চলতে থাকে তার সুঠাম টসটসে মুখখানায়, চোখ দুটি এই মেঘমেদুর এই বিদ্যুদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। দেখে চমক লাগে উন্মেষের।

'বাঃ, দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি— বোসো।'

উঃ, এত ভদ্র কেন উন্মেষ! কবে ও আর অভদ্র হ'তে শিখবে? বুকের মধ্যে দোলা লাগে রুচিরার। চোখকান বুজে ব'লে ফ্যালে, 'তোমাকে দেখলে কী মনে হয় আমার বলবো? না, যাক গে, তা ব'লে আর কাজ নেই। কিন্তু বলো দেখি কেমন বলতে পারো কেন এসেছি আজ, দেখি ঘটে বুদ্ধি কেমন আছে।'

জটিল কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যেটুকু দ্বিধা প্রকাশ পাওয়া-শোভন তা বজায় রেখে উন্মেষ বললে, 'মনে হচ্ছে তুমি এসেছো আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করতে—'

হেসে ফেললো রুচিরা। ইচ্ছে হ'লো তার হেসে ফেটে প'ড়ে গড়িয়ে পড়ে উন্মেষের গায়ের ওপর, কিন্তু দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে, একটি মোক্ষম কটাক্ষ হেনে উঠে গেল রুচিরা খাট থেকে, আর হাল্কা গলায় বললো, 'ভারি ইয়ে হয়েছে তোমার, ফাজিল কোথাকার—'

এমনি চললো ঘণ্টাখানেক। অবিশ্যি এক ঘণ্টা রুচিরার কাছে মুহূর্ত-

মাত্র মনে হ'লো। অবশেষে এক-সময় রুচিরা তার বাঁ-হাতের কব্জিটা উন্মেষের নাকের কাছে উঁচিয়ে ধরলো, 'দেখুন তো মশাই ক'টা বাজে ?'

উন্মেষ মিটিমিটি চোখে আস্তে বললো, 'বারোটা ! একদম বেজে গেছে—'

'বারোটা বেজেছে তোমার।'

এর পর রুচিরা মরিয়া হ'য়ে ওঠে একেবারে, খপ্ ক'রে দু-হাতে সে জড়িয়ে ধরলো উন্মেষের একটা হাত, 'চারটে বেজে গেছে, আর যদি দেরি করো তবে ছ'টার শো-টা মাঠেই মারা যাবে।'

নিউ এম্পায়ারে আজ ছ-টার শো-এর দু-খানি টিকিট নিয়েই এসেছে রুচিরা।

উন্মেষের মন-মেজাজ এর জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলো না, কিন্তু তবুও তার পরিত্রাণ কোথায় !

মিনিট দশেক বাকি ছ-টা বাজবার।

নিউ এম্পায়ারের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে উন্মেষের হাতে একটা চিমটি কেটে চোখের ইশারায় একজনকে দেখিয়ে বললে রুচিরা, 'তোমার সরোজদা না ?'

দাঁড়িয়ে পড়লো উন্মেষ সিঁড়ির ওপর। গাড়িবারান্দাটার বাইরে কয়েকটি লম্বা-চওড়া জোয়ান অবাঙালির সঙ্গে কথা বলছে সরোজ। হাবভাবে পোশাকে সকলেই ছিমছাম কেতাদুরস্ত। সরোজেরও পরনে ট্রাউজার্স কার্ডিগান, চোখে গগল্‌স্। মনে হ'লো, সরোজেরও চোখ পড়েছে ওদের দিকে— কেননা হঠাৎ সরোজ স'রে গেল অন্য দিকে, ওদের দৃষ্টির আড়ালে।

'ধরা প'ড়ে গেলে তো!' হাত ধরলো রুচিরা উন্মেষের, টেনে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

হাত ছাড়িয়ে নিলো উন্মেষ। বললে, 'রুচি, তোমার রুচিটা এরকম বেখাপ্পা কেন?'

রুচিরা ঘাড় বেঁকালো, 'তার মানে?'

'তার মানে রাজ্যে কি আর বই ছিলো না দেখবার মতো, বেছে-বেছে একেবারে সব-চাইতে যেটি রদ্দি—'

চকিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল উন্মেষ— বিনতা দাঁড়িয়ে আছে!

'কে!' উন্মেষের কনুইতে চাপ দিয়ে কানে-কানে জিগ্যেস করলো রুচিরা।

অ্যাডভান্স বুকিং-কাউন্টারের কাছে নিশ্চল নির্জীব দাঁড়িয়ে আছে বিনতা একা। তারও দৃষ্টি পড়েছে উন্মেষের ওপর, কিন্তু তবু একচুলও ন'ড়ে উঠলো না সে, হাতখানাও উঠে এলো না একটু। উন্মেষের স্মিত হাসির উত্তরে তার চোখে-মুখেও কোনো উত্তর ফুটলো না। অথচ উন্মেষকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে সে যে বিচলিত হ'য়ে পড়লো সেটা কিন্তু উন্মেষ বা রুচিরা কারুরই চোখ এড়ালো না।

এ-অবস্থায় বিনতার সঙ্গে এগিয়ে আলাপ করা ভদ্রতা না অভদ্রতা হবে, বুঝে উঠতে পারে না উন্মেষ। দ্বিধায় দো-মনা হ'য়ে সে এগিয়েই এলো বিনতার দিকে। রুচিরা কিন্তু অধৈর্য হ'য়ে ওঠে, বললো উন্মেষের কানে-কানে, 'দেরি হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু, এখুনি শুরু হ'য়ে যাবে ছবি—'

'কী, ওয়েট করছেন বুঝি কারো জন্যে?' সস্মিতমুখে বললো উন্মেষ।

আর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেল বিনতার, এগিয়ে এসে সে উন্মেষের একটা হাত চেপে ধ'রে বললো স্খলিত

গলায়, 'ভয়ানক বিপদে পড়েছি আমি উন্মেষবাবু। সেদিন হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল আপনার সঙ্গে রাস্তায়, আবার আজ এখানে। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, আজ যদি একটু—'

'কী হয়েছে বলুন তো খুলে—'

বিহ্বল চোখে এদিক-ওদিক কেবল তাকাচ্ছে বিনতা। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। কিছু-একটা বলতে চেষ্টাও করে, কিন্তু ভেতরের অস্থিরতাটা তার এমনি ফেটে পড়েছে হঠাৎ যে আর কিছু বলতে পারে না, অসহায়ের মতো এদিক-সেদিক তাকায় কেবল।

'চলুন, বাইরে চলুন।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উন্মেষ নিজেই ধরে বিনতার একটা হাত।

'না না না, বাইরে যাবার উপায় নেই, এখানেই দাঁড়াতে হবে। ক'টা বাজে বলতে পারেন—'

রুচিরা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো, এবার কব্জি উল্‌টিয়ে উন্মেষকে বললে, 'আর এক মিনিট বাকি ছবি শুরু হবার। আপনি ঢুকবেন না ভেতরে?'

'ওঃ, আপনারা তো ছবি দেখবেন, না? ঈশ্‌, খেয়ালই ছিলো না আমার— হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে বিনতা, 'আচ্ছা আপনারা যান।' রুচিরার দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বিনতা।

কিন্তু নড়ে না উন্মেষ, বলে, 'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কেন আপনার? ব্যাপারটা কি বলুন তো খুলে।...কী, হয়েছে কী, বলুন না... ভালো কথা, আপনার ভাইয়ের খবর কী, খবর ভালো তো তার?'

উত্তরে শুধু মাথা নাড়ে বিনতা। পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আবার অ্যাডভান্স বুকিং-কাউন্টারটার পাশে। উন্মেষও এগিয়ে যায়। কী এমন হয়েছে, কী হ'তে পারে বিনতার— বারে বারে জিগ্যেস করে সে।

'আপনারা যান। আপনারা থাকলে বরং আমার অসুবিধেই হবে, তাহ'লে আসবে না ওরা—' বিনতা এর বেশি আর-কিছুই বলে না।

রুচিরা তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব। ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে তার। হাত ধ'রে টানতে থাকে উন্মেষকে। কিন্তু উন্মেষ আর এগুতে চায় না। মনে হয় তার, এ-অবস্থায় বিনতাকে একা ছেড়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবাক হ'য়ে যায় সে— দশ-বারো দিনের মধ্যে কারো চেহারা এমনি বিশ্রি বদলে যেতে পারে? আশ্চর্য, গাল ভেঙে চোয়াল বেরিয়ে পড়েছে বিনতার, চশমার কাঁচ দুটো কীরকম ঝাপসা ময়লা-জমা, রুক্ষ এলোমেলো চুল কোনোরকমে টেনে জড়িয়ে বাঁধা, আর গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শাদা একটা চাদরে গুটিসুটি ক'রে সর্বাঙ্গ ঢাকা। দেখে মনে হয় কতকাল যেন ঘুমোয়নি সে, কত না অশান্তির ঝড় ব'য়ে গেছে তার ওপর দিয়ে।

'রুচি, তুমি এক কাজ করো-না, আমাকে একটা টিকিট দিয়ে তুমি ভেতরে গিয়ে বোসো, আমি যাচ্ছি একটু পরে—'

কিন্তু রুচিরা একথার কোনো জবাবই দেয় না। রাগ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে লবিতে ভিড় পাতলা হ'য়ে গেছে। কেননা ছ'টা বেজে পাঁচ এখন, শো শুরু হ'য়ে গেছে।

'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিছিমিছি—' বিনতার গলায় উষ্মা প্রকাশ পায় এবার, 'বলছি-না, আপনারা থাকলে আমার অসুবিধেই হবে!'

'আপনার ভাইয়ের খবরটা বলুন একটু, তারপর যাচ্ছি—'

'আমিও যে সেই খবরের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে! যান, আপনারা যান, ওরা হয়তো আসতে পারছে না আপনাদের জন্যেই।' উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে বিনতা।

উন্মেষ ঘুরে দাঁড়াতেই থমকে গেল— দরজা ঠেলে ঢুকছিলো সরোজ। কিন্তু ভেতরে এক পা বাড়িয়েই উন্মেষকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেল বাইরে।

'একি, তোমাকে দেখে পালাচ্ছে কেন সরোজদা, উনিশদা?'

মুহূর্তের মধ্যে মাথায় অনেক-কিছু খেলে যায় উন্মেষের— 'রুচি তুমি দাঁড়াও একটু এখানে, আমি আসছি—' ব'লে একরকম ছুটেই সে বেরিয়ে যায় বাইরে।

কিন্তু কোথায় সরোজ! বাইরে বেরিয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি ক'রে উন্মেষ সরোজকে খোঁজে। যাদের সঙ্গে তখন সরোজকে কথা বলতে দেখেছিলো তাদের মধ্যেকার একটি লোককে সে দেখেই চিনলো। এদিকে মুখ ক'রে ও-পাশের ফুটে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লোকটা পাইপ টানছে। লোকটাকে মনে হয় পাঞ্জাবী, ছ-ফুট লম্বা, পাগড়ি বাঁধা, সিল্কের জালে দাড়ি আটকানো, চোখে গগল্‌স্। কিন্তু ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী। হতাশ হ'য়ে ফিরে আসে উন্মেষ।

'আচ্ছা শুনুন,' উন্মেষ প্রবল একটা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বললো, 'কিছু মনে করবেন না, রিসেণ্ট্‌লি আপনার বিয়ের কোনো সম্বন্ধ-টম্বন্ধ এসেছে কি?'

অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো বিনতা উন্মেষের দিকে। এ আবার বলছেন কি উন্মেষবাবু!

বিব্রত হ'লো উন্মেষ। কিন্তু ফের বললে, 'কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয়, বিয়ের ব্যাপার নিয়েই যদি আপনার কোনো বিপদ—'

'কী যা-তা বলছেন আপনি—'

আর কথা হাতড়ে পায় না উন্মেষ।

'বলুন তো, কী বলতে চাচ্ছেন—'

'তাহ'লে ব'লেই ফেলি, শুনুন। একটু আগে একজনকে দেখলেন-না আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল বাইরে! ঐ যে মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি! ও হচ্ছে আমার মামাতো ভাই। আপনার ভাই যেদিন হারিয়ে গিয়েছিলো, যেদিন আপনি আমাদের বাড়ি গেলেন, সেদিন ও আমাকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিগ্যেস করছিলো। বলছিলো যে ওর কোন বন্ধুর সঙ্গে নাকি আপনার বিয়ের—'

আনুপূর্বিক বললো উন্মেষ সেদিনকার কথাবার্তাগুলো। বলতে-বলতে সরোজের মতিগতি-প্রকৃতিরও কিছুটা আভাস না দিয়ে পারলো না।

সবটা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে বিনতা বললো, 'ও! তাহ'লে আপনার ভাইটিও একটি পাণ্ডা এর মধ্যে! ভগবান!'

'কিসের মধ্যে?'

'কিসের মধ্যে! তাহ'লে দেখুন আপনি—' ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বিনতা টেনে বের করে একটা চিঠি, 'নিন, দেখুন প[illegible]!' খাম থেকে চিঠিটা বের ক'রে দেয় উন্মেষের হাতে।

দামী রাইটিং-প্যাডের ঠাসা চারপৃষ্ঠা চিঠি। মেয়েলি ছাঁদের হাতের লেখা। অসংখ্য বানান ভুল। 'প্রিয় বিনতা দেবী' ব'লে চিঠিটার পাঠ। ইতি-তে এক রাখালচন্দ্র সোম। আগাগোড়া চিঠিটার মোটমাট বক্তব্য এই যে, পূষন্‌কে এখনো হত্যা করা হয়নি, কিন্তু বারোই ফেব্রুয়ারি বিষ্যুদবার সন্ধে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় নিউ এম্পায়ার সিনেমার অ্যাডভান্স বুকিং-কাউন্টারের পাশে যদি বিনতা স্বয়ং পাঁচটি হাজার নগদ টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে তবে যেন পূষনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা তার পরের দিন সকালবেলা পূষনের লাশ হেদুয়ার জলের মধ্যে সন্ধান করে। নগদ টাকা পাঁচ হাজার আনা সম্ভব না হ'লে ঐ-দামের গয়নাগাঁটি দিলেও চলতে পারে। কিন্তু গয়না যদি মেকি হয়, কি এ-ব্যাপারে

যদি কোনোরকম ওপর-চালাকি করার চেষ্টা হয়, অথবা যদি পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামা করা হয় তবে পূষনের হিতাহিতের জন্যে পত্রলেখক আর দায়ী থাকবে না। আর যদি বুদ্ধিমতীর মতো পত্রলেখকের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করে বিনতা, তবে বিষ্যুদবার রাত্তির ন'টার মধ্যেই পূষন্‌কে বহাল তবিয়তে বাড়িতেই ফিরে পাবে তারা। চিঠির শেষে গোটা-গোটা কাঁপা-কাঁপা অন্যরকম হস্তাক্ষর, লেখা আছে : 'দিদি, আমাকে বাঁচাও। তোমার পূষন্‌।'

'নিচের এ-লেখাটা কার? পূষনের?' স্তম্ভিত গলায় উন্মেষ ব'লে উঠলো।

চিঠিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় বিনতা। রুচিরার হাতটা টেনে ঘড়িটা দেখে নিয়ে অনুনয়ের সুরে বললে, 'আর না, এবার আপনারা যান-তো, যান, যান শিগগির—' উন্মেষকে ঠেলে দেয় বিনতা।

রুচিরাও উন্মেষের হাত ধ'রে পালাবার জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু উন্মেষ তবু দাঁড়িয়ে থাকে জেদ্ ক'রে।

'কেন বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন বলুন তো। আমার একেবারে সর্বনাশ না ক'রে কি আশ মিটবে না আপনাদের!' জ্ব'লে ওঠে বিনতার চোখ দুটো।

'বেশ, যাচ্ছি, যা ভালো বোঝেন করুন, আপনি হয়তো টাকা নিয়েই এসেছেন···আচ্ছা যাক— আমরা বাইরে ওদিককার রাস্তায় মোড়ের মাথায় ওয়েট করবো সাতটা পর্যন্ত। যদি দরকার মনে করেন—' বলতে-বলতে রুচিরাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল উন্মেষ।

•

দরকার হ'লো না সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার। বড়ো রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ছিলো উন্মেষ,

মিনিট পনেরো পরেই দূর থেকে বিনতাকে আসতে দেখে ছুটে এগিয়ে গেল।

'কী খবর ?'

মুখখানা শাদা রক্তশূন্য হ'য়ে গেছে বিনতার। উন্মেষদের আসতে দেখে দু-হাত বাড়িয়ে টলতে-টলতে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো রুচিরাকে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'একটা গাড়ি ডাকুন, আমি আর পারছি না—'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলো উন্মেষ। উঠে বসলো তিনজনে। ছুটলো ট্যাক্সি।

বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাই বলতে পারলো না বিনতা। চোখ বুজে নেতিয়ে প'ড়ে রইলো গাড়ির জানালায় মাথা রেখে। রুচিরাও নিস্পন্দ পাথরের মতো বিনতাকে আলগোছে ধ'রে ব'সে থাকে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধ'রে হুহু ক'রে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি।

'আমি তো ওঁকে পৌঁছে দেবো, ফিরতে অনেক দেরি— তুমি কী করবে ? যাবে আমাদের সঙ্গে, না নেমে যাবে ?' উন্মেষ বললো।

শুনে গা জ্ব'লে যায় রুচিরার। কিন্তু তবু বলে, 'চলো না, কত আর দেরি হবে।'

ট্যাক্সি গ্রে স্ট্রীটে এসে পড়তেই বিনতা চমক ভেঙে উঠে বসলো, অস্থির উত্তেজনায় ব'লে উঠলো, 'এতক্ষণ কথাটা খেয়ালই তো হয়নি আমার, আপনার ভাই যখন আছে এর ভেতরে, আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় পূষন্‌কে বাঁচাতে পারেন !'

'ওরা এসেছিলো টাকা নিতে ? কী হ'লো না-হ'লো সেটা বলুন।'

'টাকা নিয়ে গেছে। টাকা আর গয়নাগাঁটি যা দিলাম তা পাঁচ হাজারের অনেক বেশিই হবে। কিন্তু ওদের কি বিশ্বাস করা যায় ?'

'পূষন্‌কে কবে ফেরত দেবে কি কী করবে কিছু বললে না ?'

আবার নিঃঝুম অবসন্ন হ'য়ে যায় বিনতা। দু-হাতের মধ্যে মুখ চেপে গুম হ'য়ে ব'সে থাকে। গাড়ি ছুটতে থাকে গ্রে স্ট্রীট ধ'রে।

'কোন গলিটা ভুলে গেছি— একটু বলবেন তো।'

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দেয় উন্মেষ। কেননা দেখা গেল বিনতার কাছে একটি পয়সাও নেই আর।

পূষনের উদ্ধার-সম্পর্কিত চিঠির আগেও একটু ইতিহাস ছিলো। পূষন্‌ নিখোঁজ হবার ন'দিন পরে ঐ-চিঠিটা আসে। আশ্চর্যের বিষয় চিঠিটার কথা বিনতা কাউকেই জানায়নি। শোকে পাগলের মতো হ'য়ে গেছে সে এই ক'দিনে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব এ-সম্বন্ধে তাদের যা করণীয় তা করছিলো। সব-চাইতে এ-ব্যাপারে পরিশ্রম করছে প্রশান্ত। কিন্তু চিঠিটার কথা বিনতা প্রশান্তর কাছেও লুকিয়েছে। সম্ভব হ'লে সারদার কাছেও লুকোতো, কিন্তু তাঁর কাছে লুকোলে পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয় না তার পক্ষে। লোহার সিন্দুক থেকে সেকেলে ভারী-ভারী যে সোনার গয়নাগুলো মেয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন সারদা তারই দাম পাঁচ হাজারের বেশি হ'য়ে যেত, কিন্তু গুণ্ডাদের মনস্তুষ্টির জন্যে এক হাজার টাকা নগদও তুলে নিয়েছে বিনতা ব্যাঙ্ক থেকে— সারদার নামে গচ্ছিত টাকা থেকে। বিনতার নামে শ্যামসুন্দর কোনো টাকা জমা রাখেননি কোনোদিন। সারদার কিন্তু ভালো লাগেনি এটা এভাবে কারো পরামর্শ না নিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে করবার। কিন্তু বিনতা যখন ব'লে বসলো হঠাৎ, 'ছাখো মা, এক মেয়েকে তো নিজে হাতে খুন করেছো, আর-এক মেয়েকে মারলে আত্মহত্যা করিয়ে, একেও কি তুমি—' চুপ ক'রে গিয়েছিলেন তখন সারদা।

কিন্তু আজ বিকেলে গয়নাগাঁটি আর টাকা নিয়ে বিনতা একা-একা বেরিয়ে যাবার পরে সারদার পক্ষে আর চুপ ক'রে থাকা সম্ভব হয়নি। কথাটা বললেন তিনি বুড়ি-চপলার কাছে। বুড়ি-চপলা বললে ভরতকে। ভরত ছুটে গেল উর্মিলার কাছে। উর্মিলা ছুটে এলো তার মেজদা সন্তোষকে নিয়ে। কিন্তু সারদা বলতে পারলেন না কোন সিনেমায় গেছে বিনতা। স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় রইলো না আর তখন। কিছু পরে এলো প্রশান্ত। পাড়া-পড়শীও দু-চারজন এসে জমলো সারদাকে ঘিরে। অন্য কিছুই তখন আর করণীয় না থাকায় অগত্যা ব'সে-ব'সে আকাশ-পাতাল জল্পনা-কল্পনা, দেশময় গুণ্ডাবাজি সম্পর্কে বিক্ষোভ, আর মনে-মনে হরিনাম জপ চলতে থাকলো।

উন্মেষ আর রুচিরাকে নিয়ে বিনতা বাড়ির ভেতরে পা দিতেই এতগুলি মানুষ একসঙ্গে ছেঁকে ধরলো তাদের।

বিনতা কিন্তু হতাশ করলো সবাইকেই। না দেখতে দিলে কাউকে চিঠিটা, না বিশেষ কিছু বললে কাউকে। উন্মেষকে শুধু ছাড়তে চায় না সে। উন্মেষ যত বলে তার অন্য কোনো কাজ নেই আজ, সে ন'টা পর্যন্ত দেখে তবেই বাড়ি ফিরবে— বিনতার কানে কিন্তু সে-আশ্বাস পৌঁছয় না। থেকে-থেকে বিনতা তাই ব'লে ওঠে, 'উন্মেষবাবু, এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, আপনি যদি চ'লে যান—'

রুচিরা ছাড়া আর-কেউ কিছু বুঝতে পারে না এ-সব কথাবার্তার অর্থ। উঠোন আর বারান্দাটার ওপর কেউ দাঁড়িয়ে কেউ ব'সে-ব'সে হাঁ-ক'রে তাকিয়ে থাকে। এর-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বিনতা ব'সে আছে বারান্দার ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে। সারদাকে

ঘিরে আর-একটা ভিড় পূষনের ঘরের মধ্যে। আর, পূষনের আজ রাত ন'টার মধ্যেই ফিরবার কথা আছে শুনে ভরত মিনিটে-মিনিটে দৌড়ে-দৌড়ে যেতে লাগ্‌লো গলির মাথায় আর ফিরে-ফিরে এসে সকলের সামনে মাথা নেড়ে যেতে থাকে হতাশভাবে।

বারান্দার, প্যাসেজের, সদর-দরজার তিনটে আলোই জ্বালিয়ে রাখা হ'লো।

প্রায় দুটি ঘণ্টা এতগুলি মানুষের এমনি অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেই কাটলো।

তারপর, ন'টা বাজতে তখন মিনিট দশেক আর বাকি, হঠাৎ গলির মুখ থেকে ভরতের বাঁজখাই চিৎকার শুনে চমকে উঠলো সবাই।

পূষন্‌কে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দের আতিশয্যে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ভরত ভেতরে এসে ঢুকলো।

* * সা ত * *

পূষন্‌কে নিয়ে এই রাহাজানিটার পেছনে তার ভাইও জড়িত আছে এই লজ্জায় বিনতাদের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে সারাটা রাস্তা উন্মেষ রুচিরার সঙ্গে কথাই বলতে পারলো না ভালো ক'রে। উন্মেষের এই স্তব্ধ নিশ্চুপতার অর্থ রুচিরা কিন্তু অন্যরকম করলো, ঈর্ষায় বুকের মধ্যে জ্ব'লে যাচ্ছে তার, রাগ ক'রে নিজেও সে অন্য দিকে মুখ ক'রে রইলো। অন্য দিন হ'লে সে উন্মেষকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতো কিনা সন্দেহ, আজ কিন্তু সে নিজে থেকেই, উন্মেষের চোখের দিকে না তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বললে, 'তুমি আর আসবে কি করতে, অনেক রাত হ'য়ে গেল তো— সাড়ে নটা, আমি একাই যেতে পারবো।'

আশ্চর্য, উন্মেষ এতে আপত্তি করা দূরে থাক, একটু উশখুশ পর্যন্ত করলো না। অনায়াসে উত্তর দিলো, 'পারবে? তাহ'লে যাও।'

হন্‌হন ক'রে চ'লে গেল রুচিরা।

দোতলার সিঁড়ির মুখে সরোজের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল উন্মেষের। নামছিলো সে। পাশ কাটিয়ে যাবার বদলে সরোজের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উন্মেষ দাঁড়িয়ে গেল। সরোজ কিন্তু একা নয়, পাশে দুরন্তরকম কায়দাদুরস্ত রঙচঙে একটি মেয়ে। ভুরু ঠোঁট গাল নখ ইত্যাদির কোনো রঙটাই আসল নয়, তদুপরি পরনে স্ল্যাক্‌স্। কে এটি!

কিন্তু সে-প্রশ্ন মনেই রেখে উন্মেষ বললো, 'কোথায় চললে? তোমার সঙ্গে যে খুব জরুরি একটা দরকার ছিলো!'

'আমার সঙ্গে! কী দরকার?' চোখে গগল্‌স্ নেই, স্বচ্ছকাঁচ পাঁসনে এখন, আর তারই নিচে চোখ দুটি সরোজের সতর্ক হ'য়ে উঠলো।

'সেটা কি এখানেই বলা ঠিক হবে!'

'যা বলবি সেটা বলাটাই আদৌ ঠিক হবে কিনা—' সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে বাঁ-চোখ খাটো ক'রে কথাটা শেষ করলো সরোজ, 'সেটা ভালো ক'রে ভেবে নিয়েছিস তো! শেষে পস্তাসনি আবার!'

বটে! পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে যায় উন্মেষের। লাগসই কোনো জবাব হাতড়ে পায় না সে। কয়েক মুহূর্ত তাই স্তম্ভিত নির্বাক থেকে কঠিন গলায় বললো, 'গয়নাগুলো কি করলে? ভাগ-বাঁটোয়ারা হ'য়ে গেছে?'

সাপের জিভের মতো লকলক ক'রে ওঠে সরোজের চোখ দুটো। কথা বলতে যেন একটু দম নিতে হ'লো তার, হাত বাড়িয়ে পাশে-দাঁড়ানো মেয়েটির কানের ইহুদি-প্যাটার্নের ছোট্টো হীরের দুলটা একটু নাড়াচাড়া করলো (উত্তরে মেয়েটি চোখ পাকালো, চিমটি কেটে হাত সরিয়ে দিলো), একটা হাত মেয়েটির কাঁধের ওপর রেখে এক পায়ের গোড়ালি তুলে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে সরোজ, 'কেন? সে-খোঁজে তোর দরকার কী? তোরও ভাগ চাই নাকি?' ব'লেই স্বর বদলে ফেললো সরোজ, তীব্র কটু গলায় শাসিয়ে উঠলো, 'গ্যাখ্ উনিশ, তুই ভালো ছেলে, ভালো ছেলে হ'য়েই থাক। আগুন নিয়ে খেলা করতে যাসনি, সাবধান!' মেয়েটির একটা হাত টেনে নিয়ে উন্মেষকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে-যেতে মাঝ-সিঁড়িতে আবার একটু আটকে গেল সরোজ— নিচে থেকে উঠে আসছেন তার বাবা, শিবপ্রসাদ।

এমন সুযোগটা ছাড়লে না উন্মেষ, পেছন থেকে এবার শিবপ্রসাদকে শুনিয়ে সে উঁচু-গলায় ব'লে উঠলো, 'কিন্তু এরকম চুরি-ছ্যাঁচড়ামি ক'রে আর কদ্দিন কাটবে!'

'শাট আপ্ বাগার!' এবারে ফেটে পড়লো সরোজ।

'মুখ ঠিক রেখে কথা বলো সরোজদা—' গলা তুললো না উন্মেষ, আর সেইজন্যেই বোধ হয় শক্ত শোনালো তার ধমকটা।

'তুই মুখ ঠিক রাখ রাস্কেল।'

সরোজের চিৎকারে চারদিক থেকে ঝি-চাকর গিনু মিনু ঘূর্ণি ছুটে এসে দাঁড়িয়ে গেল সিঁড়ির ওপরে-নিচে। উন্মেষ রুখে উঠে নেমে যাচ্ছিলো সরোজের দিকে, ওপর থেকে ছুটে এসে ঘূর্ণি টেনে সামলালো তাকে, ধমকে উঠলো চাপা-গলায়, 'কী হচ্ছে উনিশদা!'

শিবপ্রসাদ এতক্ষণ স্থির ছিলেন, এইবার হাতের ছড়িটা সিঁড়ির রেলিঙের ওপরই সজোরে ঠুকলেন একবার, আগুন হ'য়ে সরোজের দিকে ফিরে বললেন, 'আই ওয়াণ্ট টু টেক আপ উইদ্ ইউ ফার্স্ট, বলো কী হয়েছে।'

সরোজ ইতিমধ্যে মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে আলগা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সমানে জবাব করলো সে, 'হ্যাট্'স্ বেস্ট নোন্ টু হিম!'

'ওয়েল!' উন্মেষের দিকে ফিরলেন শিবপ্রসাদ।

উন্মেষ শিবপ্রসাদের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে চুপ ক'রেই রইলো।

'কী হয়েছে, বলো, চুপ ক'রে রইলে কেন—' ছড়িটা ঠুকলেন সিঁড়িতে।

'এই এক-হাট লোকের মধ্যে কী হয়েছে সেটা বললে খুব ভালো শোনাবে কি!' উত্তেজনায় উন্মেষেরও গা-হাত-পা কাঁপছিলো, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত সংযত ব্যঙ্গে কথা ক'টি বললো সে, আর ব'লেই ঘূর্ণির হাত ছাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে তেতলায় উঠে যেতে-যেতে একটু থেমে ফের বললে, 'কী হয়েছে সেটা তো নিশ্চয়ই বলা দরকার!'

কিন্তু কথাটা শেষ হ'তে পারলো না উন্মেষের— হঠাৎ শিবপ্রসাদ

'তোরা এখানে কী করতে এসেছিস শুয়ারকা বাচ্চা!' ব'লে ফেটে পড়লেন একেবারে এবং তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে হাতের ছড়িটা দিয়ে দু-ঘা ঝেড়ে দিলেন ঝি-চাকরদের জটলা-পাকানো ভিড়ের ওপর।

হুড়োহুড়ি ক'রে ছুটে পালালো সব। সরোজও তার সঙ্গিনীটিকে নিয়ে স'রে পড়লো এই ফাঁকে। ঘূর্ণির হ্যাঁচকা টানে উন্মেষ উঠে গেল তেতলায় তার নিজের ঘরে।

রোষস্ফুরিতাধর শিবপ্রসাদ ছড়িটা বাগিয়ে ধ'রে কাঁপতে লাগলেন।

কথাটা জানাজানি হ'তে বাকি থাকলো না। উন্মেষ বললো শুধু ঘূর্ণির কাছে। তারপর কথাটা কানে হাঁটতে শুরু করলো। এক নিত্যপ্রসাদ ছাড়া আর সকলের কাছেই তা পৌঁছে গেল অনতি-বিলম্বে।

কিন্তু তাতে সরোজের ভারি ব'য়েই গেল। পরের দিন দুপুরবেলা নিজের ছোট্টো ঘরখানার মধ্যে শিস দিতে-দিতে সে তার ফোটোর অ্যালবামে সদ্য-তোলা ছবিগুলো জুড়ছিলো। ছবিগুলির শিল্পী সে নিজেই, আর শিল্পবস্তু হচ্ছে তার নবতমা, কালকের সেই স্ল্যাক্স্-পরা রঙচঙে মেয়েটি, নাম ডেজি চ্যাটার্জি। পেছন থেকে গুঁড়ি মেরে এসে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো গিনু, 'নতুন তুললে বুঝি সেজদা, দেখি-দেখি—' ছবি দেখা শেষ হ'লে গিনু বললে, 'কিন্তু এদিকে যে তোমার কেচ্ছায় কান পাতা যায় না সেজদা!'

শিস থামিয়ে সেজদা বললেন অপাঙ্গে, 'কেঁও?'

'বড়োকাকার পোঁ-ধরাটি যে কী-সব ব'লে বেড়াচ্ছেন তোমার নামে ইনিয়ে-বিনিয়ে সক্কলের কাছে! সত্যি নাকি এ-সব সেজদা?'

'কী বলেছে বল তো—' টান হ'য়ে বসলো সরোজ।

গিন্নুর রিপোর্টের সঙ্গে অবিশ্যি ব্যাপারটার পুরোপুরি মিল হ'লো না, কিন্তু সে-ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত হবার বদলে সব শুনে নিয়ে ফের ছবিতে মনোনিবেশ ক'রে স্বগতোক্তি করলো সরোজ, 'সব খবরই তো নিয়ে এসেছে ছোঁড়া, এদিকে ছেলেটার নিজের দাদাই যে এর মূলে ছিলো সে-খবরটা কি ও পেয়েছে!'

না-পেলেও অতঃপর পেতে আর বিশেষ দেরি হ'লো না। তেমনি কানে হাঁটতে-হাঁটতেই কথাটা উন্মেষের কানে এসে পৌঁছলো সেদিনই রাত দশটায়। উন্মেষের ঘরে ব'সে নীরজা তার বিবেকের গোড়ায় জল ঢালছিলেন তখন, ঘূর্ণি ছুটে এসে সংবাদটি পরিবেশন করলো।

শুনে নীরজার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। উন্মেষ তাজ্জব ব'নে গেল।

'কী যেন ছেলেটার নাম? হ্যাঁ পূষন্। তা পূষনের দাদার কথা তো তুই কিছু বলিসনি উনিশদা!'

নিরুত্তর উন্মেষ ভাবতে থাকে। মনে পড়লো তার, কাল বিনতাদের বাড়িতে পূষনের পথ চেয়ে জল্পনা-কল্পনার সময় কারা যেন ফিসফিস করছিলো বিনতার দাদার সম্বন্ধে।

* * আট * *

ব্যাপারটা বড়ো বিশ্রিভাবে চেপে রইলো উন্মেষের মনের মধ্যে। মেজো-মামার পাগলামি, বাড়িসুদ্ধ লোকের খ্যাপামি, ছোটোমামির নিরন্তর গঞ্জনা আর রিণির উপদেশ— এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তার মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা, রাগ, বৈরাগ্য আর বিরক্তির অনুক্ষণ স্নায়ুযুদ্ধ, 'পরমাণু বোমা ব্যবহার করলে পৃথিবীতে আবার প্রত্ন-প্রস্তর যুগ ফিরে আসবে' —আইনস্টাইনের এই উক্তির সপক্ষে না বিপক্ষে বলবে সে রোটারি ক্লাবের আগামী বিতর্ক-সভায় তাই নিয়ে মস্তিষ্কযন্ত্রণা, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে নেমে আসার জন্যে অখিল-সমীরণ ওদের আহ্বান, রুচিরার প্রেম, কফিহাউসের হাতছানি— সব-কিছু ছাপিয়ে তার মনে আজ রোববার এখন এই বেলা চারটের সময় এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে জাগলো যে, এক্ষুনি বিনতার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। এদিকে, ঘণ্টা দুই আগে ঘূর্ণি নোটিশ জারি ক'রে গেছে যে, পাঁচটার সময় তাকে ওর সঙ্গে নিউ মার্কেট যেতে হবে। সুতরাং, যঃ পলায়তি— আশ্চর্য কৌশলে সে ঘূর্ণির চোখ এড়িয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

'এই যে ভরত, দিদিমণি আছে বাড়িতে? কোথায়, ঘরে? এই যে মাসিমা, একি, জ্বর নাকি আপনার, অ্যাঁ, শরীরটা তো বিশেষ— একটু সাবধানে থাকা দরকার, সিজন্ চেঞ্জের সময় কিনা, টিকে নিয়ে নিয়েছেন তো, নেননি? এই মরেছে! হ্যাল্লো কমরেড, কী হচ্ছে ঘরের মধ্যে ব'সে-ব'সে, কবিতা? অ্যাঁঃ! শুনো শুনো, ইধার আও, আরে আও না, অ্যাঁই! আপনার এ-ছেলেটি তো বিখ্যাত হ'য়ে গেল মাসিমা এরি

মধ্যে। জানেন তো, ওর একটা কবিতা বেরিয়েছে খুব মস্ত একটা পত্রিকায়? বলেনি বুঝি, অ্যাঁ? এই, এই কবি, আরে শুনেই, যাও না ছাই একটু এদিকে। ঈশ্, ভারি যে ব্যস্ত, এরি মধ্যে এত পায়া ভারী হ'য়ে গেল!'

'ব্যাপার কী, এত চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছো কেন?'

'কবিকে সংবর্ধনা জানাচ্ছিলাম।'

'ও, তাই বলো, আমি ভাবলাম বুঝি গোরু খ্যাদাচ্ছো।'

হোহো ক'রে হেসে উঠলো প্রশান্ত। সে-হাসির শব্দ দোতলায় পক্ষাঘাতে পঙ্গু রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দরের কানে পর্যন্ত পৌঁছলো, চমকে ওঠেন তিনি।

সারদা স'রে গেলেন। বিনতা বললে, 'আজ যে একেবারে রাজ-পুত্তুর সেজে এসেছো দেখছি, ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার?' সুযোগটা ছাড়ে না প্রশান্ত, ঝট্ ক'রে গলাটা ঘন নিবিড় হ'য়ে যায় তার, বাঁ-হাতটা শার্কস্কিনের ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকিয়ে বলে, 'আজকে রাজকন্যাকে জয় করতে আমি বদ্ধপরিকর। উচ্চৈঃশ্রবাকেও নিয়ে এসেছি, চলো বিনতা, অনেক দূরে যাবো আজ।'

উচ্চ-শব্দে চলে ব'লে প্রশান্ত তার মোটর-বাইকের নাম রেখেছে আদর ক'রে উচ্চৈঃশ্রবা।

কথাটা শুনে বিনতার মুখখানা নিমেষে যেন বৈষয়িক হ'য়ে উঠলো, বললো, 'আর যদি না পারো জয় করতে?'

'না পারি? তাহ'লে···কৌপীন প'রে ভিকিরি সেজে ফের আসতে হবে আর কি!'

'ঈশ্!'

'না ঈশ্ না, আজ আর আমি কোনো কথা শুনবো না বিনা।'

'ও আবার কী !

'কী ?'

'ঝিনা !'

তুখোড় ছেলে প্রশান্ত এবার একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল, লাগসই কোনো জবাব আর খুঁজে না পেয়ে পরাজিতের মতো মুখ হ'য়ে গেল তার।

আহা রে বাছা ! মনে-মনে হাসলো বিনতা। বললো, 'এসো, ঘরে এসো।'

'এই ছাখো বিনতা—' ব'লে এতক্ষণে প্রশান্ত বাঁ-হাতটা তোলে পকেট থেকে, চোখের সামনে তুলে ধরে একটি মাংস-রঙ গোলাপ ফুল, বলে, 'বলো তো কী নাম হ'তে পারে এর ?'

'জানিনে।' বিনতা এগিয়ে এসে পরম আগ্রহে ফুলটি নিয়ে বললো, 'কী সুন্দর !'

'এটির নাম হচ্ছে কাপ্তেন ক্রিষ্টি !'

'কাপ্তেন প্রশান্ত হ'লেই বা দোষ কী !'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমার ফেয়ারি কুইন যখন প্রসন্ন, তখন ওর নাম কাপ্তেন প্রশান্ত হওয়াটাই বিধাতার ইচ্ছে।'

'তাই নাকি ! খুব সেয়ানা হয়েছো তো। এ-সব কথা কোথায় শেখো বলো তো প্রশান্ত— আরে, এই যে, পঙ্গপাল সব এসে চড়াও হলেন। এরা সব খুদে-খুদে এক-একটি বিপ্লবী, জানলে প্রশান্ত, এক-একটি আস্ত হনুমান !'

কলরব ক'রে প্রতিবাদ তুললো ছেলেরা, সংখ্যায় গুটি-সাতেক, পূষনের সঙ্গী-সাথী সব। হাতে ওদের বিপ্লবের সব কাগজপত্র, পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি। ওদের কিশোর বাহিনীর আসন্ন বার্ষিক সম্মেলন নিয়ে

ভয়ানক ব্যস্ত সবাই। বিনতাকে এরা সবাই দিদি ডাকে, বিনতাদি নয়। ওদের মধ্যে একজন বললো, 'তুমি আমাদের যা-তা বলবে কেন। এই বলছো বিপ্লবী, আবার বলছো হনুমান? উইড্ডু করো, করো উইড্রু—।'

'আহা থাক থাক—' পরম ফাজিল সুমন্ত বরাভয়ের মুদ্রায় হাত তুললো, 'দিদির ওটা শ্লিপ অব টাঙ্ বৈ তো নয়, হিউম্যান বলতে গিয়ে হনুমান ব'লে বসেছেন। তা অমন হয়।' ব'লেই নিরাপদ দূরত্বে দৌড়লো সে, গিয়ে উঠলো পূষনের ঘরে।

'ব্যস, আর কোনো ভয় নেই তোর—' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিলো পূষন্, এবার সুমন্তকে এক হাতে জড়িয়ে নিয়ে বীরদর্পে কথাটা বললে সে গলাটা মোটা ক'রে, 'যদ্যপি মোর দেহে থাকে প্রাণ, কার সাধ্য দেখি তোর স্পর্শে কেশাগ্র!' আর-আর ছেলেরা হৈচৈ ক'রে হেসে উঠলো।

'শুনছো, শুনছো বাঁদরগুলোর কথাবার্তা—' নৈরাশ্যে, হতাশায় হাল ছেড়ে দেবার মতো একটা ভঙ্গি করে বিনতা, যদিও মুখখানায় তার ছড়িয়ে পড়লো আশ্চর্যরকম কোমল উজ্জ্বল একটা রঙ, বর্ষাকালের পড়ন্ত-বেলায় রোদের যেমন একটা রঙ, একটা আভা দেখা যায় কোনো-কোনো দিন।

'দিদি—' ভরত এসে দাঁড়ালো, 'উমেশবাবু আসছে।'

'উমেশবাবু? সে আবার কে? আমাকে ডাকছে?'

'তয় আর ক্যারে ডাকবে। অ্যাঁ? আরে কি আশ্চয্য, উমেশবাবু উমেশবাবু। ঐ যে সুন্দরপানা চশমাপরা—? আহা, ঐ যে ছোড়দাবাবুর তালাসের জইন্য এত করলে!'

'উন্মেষ!' গালে হাত ঠেকে যায় বিনতার, 'উন্মেষবাবু এসেছে?

সত্যি ?' বলতে-বলতে এগুলো বিনতা সদরের দিকে, যেতে-যেতে বললে চেঁচিয়ে, 'প্রশান্ত, তুমি বোসো আমার ঘরে, আসছি আমি।'

''কার মুখ দেখে উঠেছি আজ··· সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু—'

'বিশ্বাস হচ্ছে না মানে ?' যেন জলে পড়লো উন্মেষ।

হেসে ফ্যালে বিনতা, আরো-হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে বলে, 'উমেশবাবু! আপনি উমেশবাবু ?' মুখখানা সিঁদুরে হ'য়ে ওঠে বিনতার চাপা-হাসির দমকে।

বিনতা যে এমনি হাসতে পারে, এমনি ছেলেমানুষ হ'য়ে উঠতে পারে, জানা ছিলো না উন্মেষের। কিন্তু হাসির কারণটা সে আয়ত্ত করতে পারে না, চুপচাপ তাকিয়ে থাকে বিনতার মুখের দিকে।

'সত্যি, কী মনে ক'রে এলেন বলুন তো ? আর যে এ-মুখো হবেন সত্যি ভাবতে পারিনি।'

'কেন ?' অন্ধকার নামলো উন্মেষের মুখে। বিনতা তাকে এমন ক'রে টিটকিরি দিতে পারলো! ঘরে-ঘরে আজকাল এমনি কুৎসিত কতরকম ব্যাপারই তো চলছে, কিন্তু তাই ব'লে একের দোষে অন্যকে বিদ্রূপ করাটা কি ঠিক ?

বিনতাও অবাক হ'য়ে যায় উন্মেষের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোনো খারাপ কথা কি ব'লে ফেললাম আমি! অবাক কাণ্ড, কী বা বললাম আর কী বা ভাবছে এ, কে জানে। অদ্ভুত ছেলে! আগাগোড়া অদ্ভুত। কেবল ফার্স্ট হ'তেই শিখেছে। আর কোনো মানে বোঝা যায় না।

'সেই মেয়েটিকে নিয়ে এলেন না কেন ? বাঃ, আমরা যে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম, আসুন, ভেতরে আসুন। সেদিন ওর সঙ্গে ভালো ক'রে কথাই বলতে পারলাম না, তাই চটেছে, না ? আমি কি আর আমাতে ছিলাম, বাব্বা! কি যেন ওর নামটা ?'

'রুচিরা। ভেতরে আমি আর যাবো না— এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একটু দেখা ক'রে যাই। জরুরি একটা কাজ আছে, আর-একদিন আসা যাবে, যাই—' বলতে-বলতে হাত দু-খানা তার নমস্কারের ভঙ্গিতে উঠলো একটু, চলতে শুরু করলো পেছন ফিরে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে রইলো বিনতা।

'এই, এই উন্মেষবাবু!'

দাঁড়ালো উন্মেষ, মুখ ফেরালো।

কয়েক পা এগিয়ে গেল বিনতা, বললে, 'এর মানে?'

'কী?'

'আশ্চর্য মানুষ তো আপনি!'

উন্মেষ চুপ।

'সত্যি কাজ আছে?'

নিরুত্তর সে।

'থাক কাজ। একদিন ক্ষতি হোক কাজের। আসুন।'

'আর-একদিন বরং—'

লাল হ'য়ে ওঠে বিনতার মুখ, সম্ভবত রাগে, একটু অপমানিতও বুঝি বা বোধ করে। কিন্তু তবু বললে, 'আপনার কোনো কাজ নেই, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

কথাটা যেন সূচ ফুটিয়ে দিলো উন্মেষের দু-চোখের কোণে, কিন্তু বলবার তার কী আছে, কথাটা তো মিথ্যেই।

এবার অনুতপ্ত হ'লো বিনতা, বললে, 'আসুন-না একটু বসবেন—'

ইজিচেয়ারটায় প্রশান্ত এতই গভীর অভিনিবেশে মস্ত মোটা এক-খানা বইতে নিমগ্ন যে তার পক্ষে খেয়াল করা সম্ভব হ'লো না দুটো জ্যান্ত প্রাণী ঘরে এসে ঢুকলো।

বেতের চেয়ারটা উন্মেষকে এগিয়ে দিয়ে বিনতা বললে, 'তুমি বইখানা পড়ছো, না বইখানাই পড়ছে তোমাকে প্রশান্ত?' এসে বসলো বিনতা ইজিচেয়ারটার চওড়া হাতলের ওপর, কেড়ে নিলো বইটা, বললে, 'জানো প্রশান্ত, উন্মেষবাবু জীবনে কখনো সেকেণ্ড হননি। ওঁর সামনে মোটা বইয়ের দেমাক চলবে না।'

'কিছু মনে করবেন না, জানতুম না আমি—' করজোড়ে পোশাকি এক-চিলতে হাসি ছিটিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে প্রশান্ত।

এ-ধরনের কথাবার্তা আর এমনি ভঙ্গি দেখে উন্মেষ হতভম্ব হ'লো। ভাবলো, এই যদি শিষ্টাচার তবে অশিষ্টাচার অপরাধ কেন।

বিনতা মাঝখান থেকে পড়লো ফাঁপরে, সে কী ছাই বুঝেছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এমনি সাপ বেরিয়ে আসবে! সামলে নেবার জন্যে তখন সে উন্মেষকে বললে তাড়াতাড়ি, 'আপনিও যেন প্রশান্তর সামনে ক্রিকেট টেনিস বিলিয়ার্ড, হ্যাঁ আর কী-কী যেন? হ্যাঁ হান্টিং রোইং রাইডিং—'

কানে যেন তালা লেগে গেছে উন্মেষের— হাত তুলে থামালো সে বিনতাকে। বললো, 'ঐ যথেষ্ট, আর দরকার হবে না, বাকিটা অনুমান ক'রে নিতে পারবো। যদিও আমার সম্বন্ধে বা ওঁর সম্বন্ধে এ-জাতীয় পরিচয়-দানের কোনো দরকার ছিলো না।'

'কেননা—' বিনতার মুখের অবস্থা দেখেও একটু মায়া লাগলো না উন্মেষের, 'যে-পরিচয় দিলেন আমাদের, তার পরে আর আমাদের কারুরই কোনো বিষয়েই মুখ খোলার সংসাহস হবে না। এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনি একাই তাহ'লে কথা বলতে থাকুন!'

কথাগুলো যেন, বিনতার মনে হ'লো, ঘরের সমস্ত হাওয়া টেনে নিলো। পূষনের ঘর থেকে শুনতে পেলো সে হৈচৈ হাসির শব্দ, পাশের বাড়ির রেডিও থেকে ঠুংরি।

'কেননা, তুমি হচ্ছো গিয়ে নির্গুণ পরমব্রহ্ম'— বলতে-বলতে হেসে ওঠে প্রশান্ত, 'কোনো গুণ নেই তোমার, কাজেই তুমিই একা মজাসে এখন কথা ব'লে যাও।'

উন্মেষও হাসলো এবার মুচকি-মুচকি।

কিন্তু বিনতার মুখে বেলা-শেষের সমস্ত অন্ধকার এসে জমা হ'লো, যদিও সন্ধে হ'তে বাকি আছে এখনো। হঠাৎ এই সময় মনে পড়লো তার দুর্গেশের কথা। সেই নিষ্করুণ পাথরের মতো মুখখানা, অথচ কী মায়া-মাখানো, কী মমতাময়! কী আশ্চর্য দীপ্তি ছিলো সেই মুখে। এদের মধ্যে কি তার ছিটেফোঁটাও আছে! কিন্তু শুধুই কি উন্মেষ, প্রশান্তর কাছেও কি আজ এই একটি অসতর্ক পদস্খলনে সে ছোটো হ'য়ে গেল না!

হাতের সেই মস্ত মোটা বইটা প্রশান্তর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো সে, কারো দিকে না-তাকিয়ে মৃদুস্বরে এই বলতে-বলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, 'আমারও গুণ একটা আছে, কফি বানাতে জানি আমি, বোসো একটু তোমরা, আসছি—'

মিনিট পাঁচেক পরে পূষন্‌কে নিয়ে ফিরে আসে বিনতা। ড্রয়ার খুলে একটা টাকা বের ক'রে দিয়ে বললে, 'সেই বিস্কুট কিন্তু। অন্য কিছু আনবি না। যাবি আর আসবি। আচ্ছা দাঁড়া দাঁড়া, হ্যাঁ উন্মেষবাবু, আপনি ডিম খান তো?'

'শুরু করলেন কি আপনি!' অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠ প্রতিবাদই করলো অবিশ্যি উন্মেষ, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'লো অত্যন্ত উত্যক্ত বোধ করছে সে।

প্রশান্ত কিন্তু হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে, 'এই মাটি করেছে! আপত্তি-টাপত্তি চলবে না উন্মেষবাবু। নো ডেমক্রেসি হিয়ার। বিনতার দরবারে অমোঘ

অটোক্রেসি। উনি যা বলবেন ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে তাই ক'রে যেতে হবে। টুঁ শব্দটি—'

'তুমি থামো তো। যা পূষন্‌, যা বললাম কর। দেরি করবিনে।' ব'লে বিনতা খাটটায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো।

প্রশান্ত ইজিচেয়ারে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে স্থির তাকিয়ে রইলো বিনতার দিকে।

উন্মেষও তাকিয়ে থাকে সেই মুখখানারই দিকে অবাক চোখে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি রাগ করলো বিনতা? আশ্চর্য তো! না কি, ওকে নিয়ে তারা যে ঠাট্টা-রসিকতা করলো তাইতেই ওর এই মূর্তি! এমনি অনেক ভাবনাই উড়ে এলো উন্মেষের মনের মধ্যে। সেই ভাবনার মধ্যে এটাও তার মনে হ'লো যে এই বিশ্রি নিস্তব্ধতাটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, একটা-কিছু প্রসঙ্গের মধ্যে ঘরটাকে মুখর ক'রে না তুলতে পারলে এখানে আর নিশ্বাস নেওয়াই যাবে না। সুতরাং এক-সময় হঠাৎ সে ব'লে ফেললো, 'আমি যখন এলাম তখন দেখলাম আপনাকে একরকম, আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই একেবারে অন্য মূর্তি। আমিই নিশ্চয় দায়ী এর জন্যে?'

'কী যেন তোমাদের সেই—' পিঠ তুলে বাঙ্ময় হ'লো প্রশান্ত, 'দশমহাবিদ্যা! মাত্র দু-মূর্তি তো—থাক থাক, এই চুপ করলাম—' আবার চিৎ হ'লো প্রশান্ত সভয়ে।

উন্মেষের দিকে তাকিয়ে বললো বিনতা, '"আপনি" "বাবু" ছেড়ে দিয়ে আমরা কি সহজ হ'য়ে কথা বলতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারি—' হাসলো উন্মেষ, 'একসঙ্গে যখন পড়ি, নিশ্চয়ই পারা উচিত।'

'প্রশান্ত যদিও আমাদের সঙ্গে ঠিক পড়ে না, মেডিকেল কলেজের

ফাইনাল ইয়ার ওর। সুতরাং ওকেও আপনি বাবু থেকে খারিজ ক'রে দেবার পারমিশন দিলাম আমি তোমাকে।'

'কিন্তু সে-পারমিশনই কি যথেষ্ট?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, মিলিয়ন টাইমস্—' উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশান্ত, প্রায় সমস্ত গ্রে স্ট্রীটটাকেই চমকে দিয়ে ছিটকে এসে করমর্দন করলো উন্মেষের এবং ঘোষণা করলো, 'নাউ উই আর ফ্রেণ্ডলি, উন্মেষ! ডু ইউ স্মোক?'

নয়

দিন পনেরো পরে। ফাল্গুনের প্রসন্ন বিকেল। প্রশান্ত এসে ঢুকলো বিনতার ঘরে দরজা ঠেলে। খাটের ওপর উপুড় হ'য়ে ডায়েরি লিখছিলো বিনতা। বিস্রস্ত বেশবাস, নিতান্তই অগোছালো অবস্থা, প্রশান্তকে ঢুকতে দেখেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো, কাপড়-চোপড় সামলে নিলো। প্রশান্ত স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে, চেয়ারে নয়, একেবারে খাটের ওপর ব'সে প'ড়ে ঝুঁকে পড়লো বিনতার লেখাটার ওপর। খপ্ ক'রে টেনে নেয় বিনতা খাতাটা, সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিরক্তি, মাইনাস পাঁচ পাওয়ার চশমার ঝাপসা ময়লা-জমা কাঁচ দুটোর নিচে চোখ দুটি তার বড়ো বেশি ক্লান্ত দেখায়।

'আজকে দুপুরে গেছি চাঙওয়াতে, দেখি, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খুব জমাচ্ছে দুটো আপ-কান্ট্রি সোসাইটি গার্লকে নিয়ে—'

খাট থেকে নেমে প'ড়ে মৃদুস্বরে বিনতা বললে, 'তুমি তাহ'লে হেরে গেলে বলো!'

'হেরে গেলাম! হেরে গেলাম মানে?' মুখ থেকে চুরুটটা তার আর-একটু হ'লে প'ড়ে যাচ্ছিলো।

'তোমার সঙ্গে নিশ্চয় কোনো গার্ল-টার্ল ছিলো না। থাকলেও নিশ্চয় দুটি নয়, একটি। আর তা-ও নির্ঘাৎ আপ-কান্ট্রি নয়, নিছক বাঙালিনী। কী বলো!' বলতে-বলতে দেরাজ-বন্দী করলো বিনতা ডায়েরিটা।

কিছুক্ষণ গুম হ'য়ে রইলো প্রশান্ত। ব'সে-ব'সে বিনতার টেব্‌ল গোছানো, চশমা মোছা, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো দেখলো। শেষে বললে, 'আমার সম্বন্ধে তোমার এরকম ধারণা আগে তো কই ছিলো না, আজকালই দেখছি এ-সবের আমদানি হয়েছে। ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে দেবে?'

'দাঁড়াও, মুখটা ধুয়ে আসি একটু, উত্তরটাও ভেবে নেবো ততক্ষণে। লক্ষ্মী ছেলেটি হ'য়ে ব'সে থাকো তুমি, কেমন?' প্রশান্তর ক্ষতস্থানটিতে একটু মলমের প্রলেপ লাগালো বিনতা মুখে রহস্যরঙিন একটু হাসি ফুটিয়ে।

আর এটুকুতেই বেশ রঙ লেগে যায় প্রশান্তর মনে। বললে চোখ নাচিয়ে, 'বলো তো তোমার জন্যে কী এনেছি আজ?'

আগ্রহ কি ঔৎসুক্য কিছুই দেখা গেল না বিনতার তরফ থেকে। শুধু বললে, 'ফুল? কী ফুল?'

'তুমি দেখছি অন্তর্যামী হ'য়ে উঠলে বিনতা—' বলতে-বলতে প্রশান্ত উঠে দাঁড়ালো, বাঁ-হাতটা শিশু-হরিণ-রঙ গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকিয়ে পরম প্রশান্তিতে বললে, 'বলো দেখি কী ফুল, দেখি কেমন বলতে পারো।'

'পারবো না। আমি সত্যিই অন্তর্যামী নই। নাও, বের করো। বের ক'রে ফ্যালো, লক্ষ্মীটি, দেখছো না আমার একটু তাড়া আছে। কই?'

প্রশান্ত তখন এক-মুখ উজ্জ্বল হাসি নিয়ে যা বের করলো পকেট থেকে সে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটি চন্দ্রমল্লিকা।

'বাঃ, ভারি সুন্দর তো।' এগিয়ে এসে বিনতা স্মিতমুখে নিলো ফুলটা, নিয়ে টেব্‌লের ওপরে জলপাত্রে-রাখা এন্টিগোননের নিচে রাখলো সেটি, 'ফুলটি মনে হচ্ছে তোমারি মতো দারুণ অভিজাত। কোত্থেকে পেলে বলো তো? কিনে? না কোনো সায়েবসুবোর বাগানে গিছলে? আচ্ছা, তুমি বোসো, আমি এই যাবো আর আসবো—' বলতে-বলতে বিনতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাগে, অভিমানে, কেশর ফুলে ওঠে প্রশান্তর মনের অভিজাত সিংহটির। এত উদাসীন! এত অবহেলা! ইচ্ছে হ'লো তার উঠে গিয়ে

ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে ফেলে দেয় চন্দ্রমল্লিকাটা। সহজে পাও ব'লে বুঝি ভাবো. সব-জিনিসই এতই সহজলভ্য, কেমন? আচ্ছা! দাম যেদিন নেবো, সেদিন যেন চোখে জল না আসে! দামী সার্জের শার্টটা খুললো সে গা থেকে, ঝুলিয়ে রাখলো খাটের বাজুতে অযত্নভরে (এই আশায় যে বিনতা এসে সযত্নে ওটি হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখবে ব্র্যাকেটে), গায়ে থাকলো রেশমী গেঞ্জির ওপর ঘি-রঙ জাম্পার, দড়াম ক'রে পড়লো গিয়ে খাটের ওপর চিৎ হ'য়ে। মড়মড় ক'রে উঠলো খাটটা।

মিনিট কুড়ি পরে গা ধুয়ে ফিরে এলো বিনতা। প্রশান্তকে চোখ বুজে চিৎ হ'য়ে পড়ে থাকতে দেখে কিছুই বললে না, চিরুনি নিয়ে ব'সে গেল আয়নায়।

কিছুক্ষণ পরে পূষন্ এসে হাজির। বিনতাকে বেশবাসে মনোযোগী দেখে বললে, 'বেরুচ্ছো দিদি? ভাবলুম তোমাকে নিয়ে যাবো একটু মিটিংএ— আচ্ছা যাক গে—' স্বর বদলে গেল পূষনের, মুখে ফুটে উঠলো মিষ্টি একটা ভঙ্গি, বললে, 'দিদি, লক্ষ্মী দিদি, রাগ করবে না তো? তোমার পারমিশন না নিয়েই একটা ব্যাপারে নাম লিখিয়ে এলাম দিদি—' বাহাদুরির ভঙ্গিতে দাঁড়ায় সে বুকে হাত দিয়ে, চোখ বুজে হাসে মিটিমিটি।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো বিনতা পূষনের রকমটা। বললে, 'আমার পারমিশনের আর দরকার কী। মস্ত পুরুষ হ'য়ে গেছো তুমি এখন। আমাকে জানাতে এলে, এই-না ঢের!'

'বাব্বা! তোমরা, দিদিরা—তুমি ব'লে নও, সব দিদিই— আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, বেশ যেন একটু সাম্রাজ্যবাদী-টাইপ। খুব খারাপ টেণ্ডেন্সি। এরকম কেন হয় বলো তো দিদি?'

'কাছে আয়, ব'লে দিচ্ছি কেন।'

'পাগল! কাছে গেলেই তো হামলা করবে, দূরেই বেশ। তা শোনো, কিসে নাম লেখালাম জানো? কাল থেকে-না, আমাদের পাড়া থেকে শেয়ালদা স্টেশনের উদ্বাস্তুদের মধ্যে রিলিফের কাজ করা হবে। যা ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক আসছে দিদি, গিয়েছিলাম আজ শেয়ালদায় দেখতে, তিলধারণের জায়গা নেই আর স্টেশনে, কান্নাকাটি চ্যাঁচামেচি যা অবস্থা হয়েছে-না, দেখে এসো কাল।'

'দেখেই আসবো শুধু? তোদের কাজে আমাকে নিবিনে?'

মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতে পূষন্ ঝাঁপ দিয়ে পড়লো দিদির ওপর। টাল সামলাতে পারলো না বিনতা, পূষনের টানে গিয়ে পড়লো ঝুপ্ ক'রে ইজিচেয়ারটার ওপর, পূষন্ বসে মেঝেয় বিনতার হাঁটু জড়িয়ে। প্রশান্ত উঠে ব'সে হা-হা ক'রে হেসে ওঠে।

একটু গুছিয়ে ব'সে বিনতা বললো, 'তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি আর হবে না বোকা ছেলে!'

'হবে, হবে। এই ছাখো-না কেমন বুদ্ধি ক'রে তোমার নামটাও দিয়ে এসেছি রিলিফের কাজে। বলো তুমি, খুব বুদ্ধির কাজ হয়নি এটা?' বলতে-বলতে উঠে পড়লো পূষন্, 'ক'টা বাজে প্রশান্তদা?' ঘড়ি-পরা ডান-হাতটা বাড়িয়ে ধরে প্রশান্ত পূষনের দিকে। ঘড়ি দেখেই ছুট দিলো পূষন্ বাইরে, চেঁচিয়ে ব'লে গেল, 'আমার আসতে একটু দেরি হবে দিদি, মিটিংএ যাচ্ছি ময়দানে।'

অভিভূতের মতো কাটলো বিনতার কয়েক মুহূর্ত।

'কী ডাকাত ছেলে রে বাবা—' বললে সে আনমনে। আর তারপর প্রশান্তর দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা প্রশান্ত, দিন-দিনই যেন ওর দস্যিপনা বাড়ছে, তাই না?' বুকের মধ্যে কেমন কেঁপে ওঠে বিনতার, কী-একটা অবরুদ্ধ আবেগ ঠেলে ওঠে গলা পর্যন্ত, চেয়ার থেকে উঠে

প'ড়ে নিজের কাছেই সে আক্ষেপ জানায়, 'আমি ওর দিদি হবার যোগ্য নই। বেঁচে থাকলে ও কত বড়ো হ'য়ে মস্ত লোক হবে ও। ও তখন ওর দিদির কথা ভেবে লজ্জা পাবে···তুমি বোসো একটু প্রশান্ত, আসছি আমি—' ব'লে বিনতা বেরিয়ে গেল।

গেল সে পূষনের ঘরে, এখনো হয়তো ও চ'লে যায়নি ভেবে। কিন্তু পাওয়া গেল না। বিনতা তখন পূষনের বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক ক'রে সুন্দর সুজনিটা দিয়ে ঢেকে দিলো আবার। বই-খাতায় এলোমেলো টেব্‌ল আর শেল্‌ফটা রাখলো গুছিয়ে। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফোটোটা কাৎ হ'য়ে গেছে একটু— ঠিক ক'রে দিলো সেটা। দেয়ালের এক কোণে সদ্য মাকড়সার জালটাও চোখ এড়ায় না, মেঝে দেয়াল সব ঝাঁটপাট দিয়ে ঝকঝকে তকতকে ক'রে মনটা একটু হাল্কা হ'লো।

বুড়ি-চপলার সঙ্গে ব'সে চালের কাঁকর বাছছিলেন সারদা রান্নাঘরে। বিনতা এসে ব'সে পড়লো সামনে, বললে, 'হ্যাঁ মা, পূষন্‌টা খেয়েছে কিছু বিকেলে? না কি, না-খেয়েই বেরিয়ে গেল? ওঃ-হো, ওর পকেটে তো পয়সা ছিলো না মা একটাও। দেখলে বাঁদরটার কাণ্ড! নিশ্চয় সমস্তটা রাস্তা হেঁটেই পাড়ি দেবে হতভাগাটা।'

রান্নাঘর থেকে নিজের ঘরের দিকে আসতে-আসতে বিনতা একটা অট্টহাসির শব্দে আশ্চর্য হ'লো— একা-একাই হাসছে প্রশান্ত!

'ওমা তাই বলো, কখন আসা হ'লো মশায়ের?'

উন্মেষ অধিষ্ঠিত হয়েছে বেতের চেয়ারটায়। জবাব না দিয়ে হাসলো সে একটু। প্রশান্ত বললে, 'উন্মেষ আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছে বিনতা, এখন হার এক্সেলেন্সি রাজী হ'লেই বাঁচোয়া। আমি প্রস্তাব করেছি, আজ পাজি আড্ডায় যাবো না আমরা, আজ আমরা-আমরাই একা-একা একটু অজ্ঞাতবাস করবো— কী বলো, রাজী?'

পাজি আড্ডাটি হচ্ছে গুটি দশ-বারো পি. জি. অর্থাৎ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলে-মেয়ের সান্ধ্য আড্ডা, যে-আড্ডাটি জমে কোনোদিন কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে, কোনোদিন কলেজ স্কোয়ারের জলের সামনে বাঁধানো-ভিটির ওপর, আবার কোনোদিন-বা প্রেসিডেন্সি কলেজের সবুজ প্রাঙ্গণে। পি. জি.-র উত্তর আড্ডা প্রত্যয়ে দাঁড়িয়েছে পাজি। উন্মেষ পাজি আড্ডার পুরনো সদস্য— উন্মেষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরে এই দিন কয়েক হ'লো বিনতা, প্রশান্ত আর উর্মিলাও জমেছে গিয়ে সেখানে।

'একা-একা অজ্ঞাতবাস! মানে?'

'মানে আমি তুমি উন্মেষ আর মিষ্টিমাসি আজ অন্য কোথাও যাই চলো।'

'তোমরা যাও। আমি একটু ময়দানে যাবো মিটিংএ।'

দ'মে গেল প্রশান্ত।

'কিসের মিটিং?' জিগ্যেস করে উন্মেষ।

'মিটিংটা হচ্ছে স্কুল-টিচারদের, কিন্তু সে-জন্যে তো নয়—' একটু বিব্রত দেখায় বিনতাকে, কিন্তু তবুও সে ব'লেই ফেললে, 'পূষন্‌টা গেছে মিটিংএ, অথচ একটা পয়সাও ওর কাছে নেই, বুঝলে— সবে এই জ্বর থেকে ভুগে উঠলো, এতটা রাস্তা হেঁটে যাবে, আবার হেঁটেই ফিরতে হ'লে—'

'এইজন্যে যেতে চাও তুমি মিটিংএ!' প্রশান্ত জাগলো আবার, 'নারী-বুদ্ধি আর কাকে বলে! ঐ কাতারে-কাতারে জনসমুদ্র থেকে উনি খুঁজে বের করবেন ওঁর ভাইটিকে। আরে, এটা ভেবে দেখছো না তুমি যে পূষন্‌ তার সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া একা-একা নিশ্চয় যায়নি অদ্দূর, আর তাই যদি হ'লো তবে ওর কাছে পয়সা থাকলেও যা, না-থাকলেও তা।'

কথাটা মনে লাগলো বিনতার, খানিক ভারমুক্ত হ'লো মনটা।

'এই যে মিষ্টিমাসি এসে গেছে। আর এক সেকেণ্ড দেরি হ'লে তোমাকে ফেলেই আমরা চ'লে যেতাম।' বললে প্রশান্ত।

ঠোঁটে একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে উর্মিলা এসে খাটের ওপর বসলো। নিজের হাতঘড়িটায় দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, 'তোমার ঘড়িটি বোধ হয় ঘোড়া হ'য়ে আছেন, ঠিক ক'রে নাও— পাঁচটা বেজে মাত্র সাত মিনিট হয়েছে।'

'অস্কার ওয়াইল্ড কী বলেছেন জানো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সূর্য চলে না, সূর্যের দিকে তাকিয়েই ঘড়ি চলবে।' প্রশান্ত জন্ম-সপ্রতিভ।

তেতো ওষুধ গিলবার মতো মুখখানা হ'লো উর্মিলার, বললে বিনতার দিকে ফিরে, 'তোর কি হয়েছে রে বিনতা, অমন ক'রে ব'সে আছিস?'

'কেমন ক'রে?' উঠে পড়ে বিনতা, 'তোমার হাতে ওটা কী বই উন্মেষ?' এগিয়ে এসে টেনে নেয় বইখানা। খবর-কাগজে মলাট-দেওয়া বেশ মোটা বই, মলাট উল্টেই খুশি হ'য়ে পড়ে বিনতা, আর দু-চোখের সেই খুশি উন্মেষের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'ঈশ্, আজ মনে আছে তাহ'লে। মার্জিনে এ নোটগুলো কার? মেজোমামার?'

'হুঁ, পরের সংস্করণে ঐ-সব অ্যাডিশন অল্টারেশন হবার তো কথা ছিলো—'

'কথা ছিলো কেন! হবে না?'

'কী বই রে বিনতা?'

'নটোরিয়স লর্ড বায়রন।'

'কার লেখা?' জিগ্যেস করলে প্রশান্ত।

'নিত্যপ্রসাদ। উন্মেষের মেজোমামা—' বললে উর্মিলা।

উঠে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় প্রশান্ত বইখানা, উল্টে-পাল্টে দেখতে-দেখতে বললে, 'নাম শুনেছি বইটার। তোমার হ'য়ে গেলে আমাকে দিয়ো তো একটু— পড়তে হবে।'

'এখন কেমন আছেন উনি ?' বিনতার গলায় সত্যিকারের উদ্বেগ।

মাথা নাড়লো উন্মেষ, বললে, 'ভালো নয়। দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। কী যে করবো কিছুই বুঝতে পারছিনে। সবাই বলছে আমার দোষেই নাকি হ'লো এমন। অথচ—'

প্রশান্ত প্রসঙ্গটা অনুধাবনের চেষ্টায় বললো, 'কী অসুখ ?'

কথাটার জবাব দেয় না কেউ। উর্মিলা বলে, 'আচ্ছা বিনতা, একদিন চল-না দেখে আসি তাঁকে ? আজকেই তো যেতে পারি—'

বিনতা তাকায় উন্মেষের দিকে। আর তাইতে উন্মেষ এমনি বিব্রত বোধ করে যে সেটা কারোরই নজর এড়ায় না।

পৃষনকে নিয়ে ঐ-রাহাজানির সঙ্গে যে উন্মেষের বাড়ির একটি ছেলে জড়িত ছিলো এটা বিনতা কাউকেই বলেনি, আর সেইজন্যেই, উর্মিলাও বুঝতে পারে না কেন বিনতা উন্মেষের বাড়ি যাবার প্রসঙ্গে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করে না। অথচ উন্মেষ সম্বন্ধে বিনতার মনের অবস্থাটা বুঝতে তো বাকি নেই উর্মিলার। উৎসাহ উন্মেষও দেখায় না— এটাও হেঁয়ালি ঠেকে তার কাছে। অথচ শ্রীমানও যে—যতই চাপাচাপি করো না বাপু, ও বুঝতে বাকি থাকে না কারো। কিন্তু তবু বাড়ি নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে এত ব্যাজার কেন গো ?—ভাবে উর্মিলা গভীরভাবে। বিনতাকে একটু ঠাট্টাও কি ইতিমধ্যে না ক'রে পেরেছে উর্মিলা কাল দুপুরে' চুপিচুপি। কিন্তু কী মেয়ে এই বিনতা! উত্তরে এমন একটু মুচকি হাসলো যে কার বাপের সাধ্যি তার মর্ম বোঝে। রাগে দুঃখে অভিমানে উর্মিলার ইচ্ছে করে বিনতার চুল ছিঁড়তে।

'থাক, আজ আর কোথাও গিয়ে দরকার নেই।' বললে বিনতা, 'আজ এখানেই ব'সে-ব'সে যত খুশি জমাও। শরীরটা ঠিক— ত্মাখো তো ডাক্তারবাবু, নাড়ীটা একটু চঞ্চল লাগছে যেন—' বাঁ-হাতটা উঁচিয়ে ধরলো সে প্রশান্তর নাকের কাছে।

* * দ শ * *

'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম—' বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের মুখে দেখা হ'য়ে গেল উন্মেষের সঙ্গে বিনতার। বিনতা বললে, 'কাল গেলে না যে বড়ো? ইউনিভার্সিটিতেও তো আসোনি?'

'আজও আসতাম না। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই আসতে হ'লো।'

'আমার সঙ্গে!' বিস্ময় লাগে বিনতার চোখে, চকিতে সন্ধান ক'রে নেয় কোনো গূঢ় বক্তব্য ফুটে উঠেছে নাকি উন্মেষের চোখে-মুখে— কিন্তু কই, যেমনি সহজ সাধারণ অন্যমনস্কভাবে ও কথা বলে সব-সময় তেমনিই তো দেখছি এখনও। জিগ্যেস করলো, 'কেন?'

'যাবো বলেছিলুম তোমার ওখানে, যাইনি। আর তাছাড়া এখন হয়তো আর বাড়ি ছেড়ে বেরুনো চলবে না আমার। মেজোমামা যা-তা শুরু করেছেন একেবারে। কিছুতেই সামলে রাখা যাচ্ছে না। সেইজন্যেই ভাবলাম তোমাকে একটু জানিয়ে যাই। নয়তো তুমি হয়তো আবার ভাববে।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে বিনতা, তারপর বললে, 'চলো-না ঘুরে আসি একটু রাস্তা থেকে? তোমার কি খুব তাড়া আছে? এক্ষুনি ফিরবে বাড়িতে?'

'না, চলো।'

'কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ উন্মেষবাবু!' গুটি পাঁচ-ছয় ছাত্রছাত্রী জটলা পাকিয়ে ঘিরে ফেললো উন্মেষকে, তার মধ্যে একজন সহর্ষে অভিনন্দনটি জানালে। আর-একজন উন্মেষের একটা হাত টেনে নিয়ে সেটি পিষতে-পিষতে বললে উদ্ভাসিত মুখে, 'যদিও তোমার কাছ থেকে ব্যাপারটা

ভাই একেবারেই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সেইজন্যেই বোধ হয় আরো বেশি ক'রে অভিনন্দনযোগ্য।'

এই অন্তর্কিন্তু অভিনন্দনে উন্মেষ মোটেই আরাম বোধ করছে মনে হয় না, অভিনন্দনের কারণ সে কী ভাবলো সে-ই জানে— সারা মুখে তার ফুটে উঠলো বিরক্তি, মৃদুকণ্ঠে বললে, 'হঠাৎ এ-সবের মানে?'

'মানে মানে? কী বলতে চাও! ভেবেছো আমরা কোনো খবর রাখি না?'

'রাখো হয়তো। কিন্তু খবরটা আমি রাখি কিনা আমার জানা দরকার!'

'বড্ডো দাম বাড়াচ্ছেন ভাই নিজের!'

'তা বাড়াক। দামের কাজ করলে আমরা দাম দিতে প্রস্তুত।'

'কেন বাবা আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় করছো। থানা-পুলিশ ক'রে এলে, নিজের বাড়িতেও শুনছি অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছো, হালচাল সব উল্টে গেল তোমার— ভাবো এ-সব খবর রাখি না কিছু?'

'কিছু মনে কোরো না তোমরা—' বললে উন্মেষ বিরসমুখে, 'বিপ্লব বা তোমাদের বিপ্লব-বোধে আমি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমরা যা ভেবেছো সব ভুয়ো।'

'ভুয়ো! অহংকারের একটা সীমা থাকা উচিত উন্মেষবাবু। ঘটনা-গুলোও সব ভুয়ো নিশ্চয়?'

এ-প্রশ্নের উত্তরে উন্মেষের চোখ দুটি শুধু একটু চকচক ক'রে উঠলো। কিন্তু কিছু বললে না।

'যাক যাক, মিছে তর্কে কাজ এগোয় না। অব্জেক্টিভ প্রোগ্রেশনেই আমরা আপাতত খুশি থাকতে পারবো, সাব্জেক্টিভ প্রোগ্রেশনে আজকের দিনে আমাদের একটু দেরি হ'লেও সইবে। চলো হে। আচ্ছা,

ঠিক আছে উন্মেষবাবু, কিছু মনে করবেন না ভাই।' একজন বললো। তারপর উন্মেষকে ছেড়ে ছাত্রছাত্রীর জটলাটা এগিয়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে।

কঠিন, কালো মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো উন্মেষ।

'চলো—' বিনতা বললো মৃদুস্বরে।

কথা না ব'লে এগোয় উন্মেষ বিনতার সঙ্গে, রাস্তায়। খানিকটা পথ দু-জনেই হাঁটে চুপচাপ। বিনতা বললো, 'আমাদের বাসায় চলো-না? যাবে? বেশিক্ষণ আটকাবো না, চলো যাবে?'

'চলো।'

'যাবে?' খুব খুশি দেখায় বিনতাকে, 'আচ্ছা তাহ'লে দাঁড়াও একটু, আমি উর্মিকে একটা কথা ব'লে এক্ষুনি আসছি। ও আবার আমাকে না দেখে খুঁজে মরবে। এইখেনেই দাঁড়িয়ে থেকো, কোথাও চ'লে যেয়ো না আবার।' বলতে-বলতে দ্রুত পা চালিয়ে দিলো সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

মিনিট দশেক পরে বিনতা যখন ফিরে এলো, দেখলো উন্মেষের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রবীণ অধ্যাপক, আর গুটি তিন-চার ছাত্রছাত্রী। অধ্যাপক বলছেন উন্মেষকে, 'তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক আশা অনেক ভরসা, আর সেইজন্যেই-না এ-সব বলা। যার কাছ থেকে যা আশা করে আর কি লোকে— আর যে যা পারে তার তাইতেই থাকা উচিত। তাইতে তোমারও মঙ্গল, আর-পাঁচজনারও মঙ্গল। তাতে ক'রে যাকে বলে য়ুনিভার্সাল ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স, সেইটে রক্ষা পায়। এই যে তোমার মামা, নিত্যপ্রসাদ, তাঁকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি, কেন? বড়ো-বড়ো স্কলার, বড়ো-বড়ো প্রফেসর তো আমরা কতই দেখেছি। কিন্তু নিত্যপ্রসাদকে আমরা এমন আদর্শস্থানীয়, এমন শীর্ষস্থানীয় মনে

করি কেন? স্পিনোজা যাকে বলেছেন গ্রেটার পার্ফেকশন, যাকে বলেছেন সেল্‌ফ-প্রিজার্ভেশন, যাকে বলেছেন এসেন্স অব ভার্চু, ওঁর মধ্যে আমরা তার একটা সাক্ষাৎ রূপায়ণ দেখতে পাই। দেখে আমরা নিজেরাও শিখি, অমনি আর-পাঁচজনাকেও বলি। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। আজ নিত্যপ্রসাদ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, কী দুঃখের কথা, কত বড়ো পরিতাপের কথা। এ অকল্যাণ শুধু তোমার নয়, তোমাদের পরিবারের নয়, এ অকল্যাণ আমি বলবো সমগ্র দেশের, রাষ্ট্রের। কাল তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, কী দেখলাম! গ্যাখো, চেষ্টা ক'রে গ্যাখো যদি ওঁকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারো, এখনো তো একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাননি। শুধু এইটে মনে রেখো যে দলে প'ড়ে, অপরের প্ররোচনায় জীবনের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। Don't be a Seneca, don't open your own veins like a Seneca by the command of a tyrant.' —বলতে-বলতে অধ্যাপক উন্মেষের পিঠটা একটু চাপড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। ছাত্রছাত্রীর দলটিও অমনি অনুসরণ করলো তাঁকে।

স্থির, প্রস্তরীভূত দাঁড়িয়ে রইলো উন্মেষ।

বিনতাও বিরক্ত বোধ করছিলো। সে বললে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলো এবারে। অমন জড়ভরতের মতো দাঁড়িয়ে থাকো কেন যখন বলে ঐ-সব? প্রতিবাদ করতে পারো না? চলো।'

'এখন না হয় থাক, পারি তো বিকেলের দিকে তোমাদের বাসায় যাব'খন, কেমন?'

চোখ দুটি স্থির হ'লো বিনতার। খানিকক্ষণ অপলক নিরীক্ষণ করলো উন্মেষকে, শেষে হেসে ফেলে বললো, 'আমি কী করলাম তোমার। আমার ওপর রাগ করছো কেন অনর্থক!'

'রাগ করেছি বুঝলে কিসে ?'

'আচ্ছা, রাগ যদি করোনি, তাহ'লে আর কথা বাড়িয়ো না। বাসে চাপবে ? তার চেয়ে হেঁটেই চলো যাই-না ?'

'হেঁটে ? বলো কি— সেই গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত ?'

'আচ্ছা তাহ'লে এই ট্রামটায় চাপি এসো—' বিনতা উন্মেষকে আর সময় না দিয়ে উঠে পড়লো ট্রামে, বাধ্য হ'য়ে উন্মেষও উঠে এলো।

প্রায় ফাঁকা ট্রাম। একেবারে সামনের আসনে গিয়ে বসলো দু-জনে পাশাপাশি।

মৃদু হাল্কা গলায় বিনতা বললে, 'ভাড়াটা তুমিই দাও না !'

কথা বলে না উন্মেষ। নির্বিকার মুখে ব'সেই থাকে।

আর সেই মুখ দেখে বিনতার রসিকতার প্রবৃত্তি উবে যায়। সে-ও ব'সে রইলো তখন কাঠ হ'য়ে, জানালায় মুখ রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

'তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে—' একটু পরে বললো বিনতা, 'তাহ'লে না-হয় নেমে যেয়ো তুমি জায়গামতো। আমাদের বাসায় পরে সুবিধেমতো যেয়ো না-হয় এক-সময়।'

এবারও উন্মেষ কথা বললে না।

কণ্ডাক্টর এলে উন্মেষ পকেটে হাত দেয়, কিন্তু তার আগেই বিনতা দিয়ে দেয় পয়সা। টিকিট নিয়ে একটি গুঁজে দেয় উন্মেষের হাতে।

বিডন স্ট্রীট এসে গেল। বিনতা তাড়া দিলো উন্মেষকে, 'এ কি, ব'সে রইলে যে ? এই তো তোমার— নামবে না ?'

'কেন চ্যাচামেচি করছো—' বিরক্তমুখে ব'লে ওঠে উন্মেষ এতক্ষণে, 'ব'সে থাকো না চুপ ক'রে।'

বিনতার ইচ্ছে হয় উন্মেষের কানটা ম'লে দেয়। কিন্তু সে-ইচ্ছা তার মনেই লুকিয়ে যায়।

গ্রে স্ট্রীট এসে গেলে নামলো দু-জনে। চুপচাপ। রাস্তায় এগুতে লাগলো, চুপচাপ।

বিনতাদের গলির মুখে এসে মুখ খুললো উন্মেষ, 'রাগ করেছো নাকি ?'

অবাক চোখে এক-ঝলক তাকায় বিনতা উন্মেষের দিকে। হয়তো ভাবে— কী রে ছেলেটা!

'রাগ করলে আর করছি কি—' বললে উন্মেষ ক্ষুব্ধ গলায়, 'আমার কিন্তু ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাশ জল খাইয়ো কিন্তু।'

'কচু খাওয়াবো তোমাকে—' বলতে ইচ্ছে হয় বিনতার, কিন্তু নির্বাক সে। উন্মেষকে পেছনে ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সদর-দরজা খোলাই রয়েছে। চট্ ক'রে ভেতরে ঢুকে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে পরম ভদ্রমুখে বিনতা করজোড়ে উন্মেষকে একটি নমস্কার দেখিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আজ তাহ'লে এসো, কেমন!' ব'লেই ঠক্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো দরজা।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরে যখন খুললো আবার দরজাটা, দেখলো উন্মেষ দাঁড়িয়েই আছে পরম নিশ্চিন্ততায়, দরজাটা খুলতেই সে সস্মিত মুখে দাঁতে কেটে বললে, 'ছেলেমানুষ!'

এক-ঝলক রক্ত লাফিয়ে ওঠে যেন বিনতার মুখে, বলে মনে-মনে, 'তোমার বুড়োমানষী আজ ঘোচাবো, সবুর করো—' কিন্তু বাহ্যতঃ রূঢ় হবার ভান করলে, 'কী, দাঁড়িয়েই থাকবে বাইরে, না কি!'

'দরজা ছেড়ে দিলেই ঢুকতে পারি।'

দরজা ছেড়ে দিয়ে বিনতা উন্মেষকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে হাজির হ'লো।

'তুমি একটু বোসো। মা কী করছেন দেখে আসি একটু—' ব'লে তখুনি বেরিয়ে যায় বিনতা।

ফিরে এসে দেখলো, উন্মেষ একটা কাঁচের গ্লাশ হাতে নিয়ে ঘরের কোণে জলের কুঁজোটায় হাত দিয়েছে। পা টিপে-টিপে উন্মেষের পেছনে এসে বিনতা ধমকে উঠলো, 'এইয়ো!'

উন্মেষের হাতটা চমকে উঠলো।

খানিকটা হেসে নিয়ে শেষে বিনতা ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে যায়, চোখ পাকিয়ে বলে, 'চোর! চোর কোথাকার! জলচোর!'

ততক্ষণে উন্মেষ জল গড়িয়ে নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করেছে।

পিপাসা মিটিয়ে খানিকটা জল-সমেত গ্লাশটা রাখতে যাচ্ছিলো উন্মেষ টেব্‌লের উপর।

'এই ছেলে—' ফের ঝামটা দিয়ে ওঠে বিনতা, 'চালাকি পেয়েছো, না? জলটা ফেলে দিয়ে এসো যাও বাইরে নর্দমায়, আর চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে গ্লাশটা অমনি ভা-লো ক'রে ধুয়ে নিয়ে আসবে। অমনি-অমনিই গ্লাশটা রেখে দেওয়া হচ্ছে। যাও, কলতলায় ছাই আছে, তাই দিয়ে মাজবে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন গোরুচোরের মতো. যাও-না। বামুনের গ্লাশে মজা ক'রে জল খাবার সময় মনে ছিলো না?'

উন্মেষ বেশ গম্ভীর চালেই ঠক্ ক'রে রাখলো গ্লাশটা টেব্‌লে, ইজিচেয়ারে সটান শুয়ে প'ড়ে বললে, 'তুমি জাত তুললে কেন। নয়তো ধুয়েই রাখতাম।'

জানালাটা বন্ধ ছিলো, খুলে দিলো বিনতা। দরজাটা ভালো ক'রে খুলে দিয়ে পর্দাটা টেনে বেশ ক'রে ঢেকে দিলো দরজার মুখ। আর তারপর ফিরে এসে টেব্‌লটা গোছাতে-গোছাতে বললে, 'কতক্ষণ তুমি থাকবে বলো তো? অনেকক্ষণ যদি থাকো তাহ'লে আমাকে কাপড়টা বদলে নিতে হয়, নয়তো আর বদলাই না। কী বলো?'

উন্মেষ কোনো জবাব দিলো না।

বিনতা তখন মারমুখী হ'য়ে এগিয়ে এলো তার সামনে, বললে, 'তুমি কী ভেবেছো বলতে পারো, তুমি যে আমার কথার জবাব ইচ্ছে হ'লে দাও, ইচ্ছে না-হ'লে দাও না— এর মানে কী! বাঃ, চুপ ক'রে রইলে যে!'

'কী বলবো—'

'কী আবার বলবে। আমার কথার জবাব দেবে।'

'তোমার কথার কোনো জবাব নেই। তুমি দারুণ ঝগড়াটে, তাই ইচ্ছে ক'রে-ক'রে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করো। আমি কেবল সেটি হ'তে দিইনে। আমার সঙ্গে তোমার এই পার্থক্য।'

'পার্থক্য!' চোখ সরিয়ে নিলো বিনতা, 'ও!' বেতের চেয়ারটা ছড়ছড় ক'রে টেনে নিয়ে এবার সে ব'সে পড়লো ধপাস ক'রে, আর তারপর খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে এটা-ওটা খুঁটে কিছু সময় কাটালো, আর তারপর একেবারে অন্য গলায়— লঘু চপলতা কেটে গিয়ে এখন আবার সে শান্ত, গম্ভীর— বললে, 'তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি উন্মেষ?'

উন্মেষের চোখ বললে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন।

বিনতা বললে, 'প্রশ্নটা নির্দোষ, কিছু ভেবে নয় কিন্তু। আচ্ছা তোমার মেজোমামা বিয়ে করেননি কেন?'

উন্মেষ আশ্চর্য হয় একটু, বললো, 'জানিনে।'

'জানো না? সত্যি? তবে যে একটা গুজব শুনি?'

'কী?'

'তোমরা শোনোনি?'

'কী বলো-না!'

একটু ইতস্তত করে বিনতা, তার পরে বললো, 'ঐ যে কোন কলেজের

প্রফেসার যেন, মমতাময়ী দত্ত, তাঁর সঙ্গে নাকি ওঁর বিয়ের ঠিক হয়েছিলো, তারপর কী-সব কারণে সেটা ভেঙে যেতে দু-জনের কেউই বিয়ে করেননি আর। শুনি তো অনেকের মুখেই। একেবারে বাজে খবর?'

ঘাড় নাড়লো উন্মেষ, বললো, 'না, বাজে না। কেন ভেঙে গিয়েছিলো সেটা শোনোনি কিছু?'

একটু চুপ ক'রে রইলো বিনতা। তার পরে বললো, 'না।'

'বিয়ে ভেঙে গিয়েছিলো—'

'আপত্তি থাকলে বলবার দরকার নেই।'

'ভেঙে গিয়েছিলো— একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেটা। তখন তোমার আমার জন্মও হয়নি। ছেলেদের হাতে-হাতে তখন— বাঁ-হাতে মহাত্মা-সম্পাদিত ইয়ং ইণ্ডিয়া, আর ডান-হাতে তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের রসিদ-বই। আর তার মধ্যে দেশবন্ধু ডাক দিলেন, ইউনিভার্সিটি বয়কট করো সবাই। দলে-দলে সবাই সেই ডাকে সাড়া দিলো। আর শুধু কি ইউনিভার্সিটি, স্কুল কলেজ আপিস কাছারি— চারদিকে তখন কেবল বয়কট আর পিকেটিং। কিন্তু মেজোমামা ছিলেন স্যর আশুতোষের প্রিয়তম ছাত্র। তিনি ছাড়লেন না ইউনিভার্সিটি। শুধু ছাড়লেন না নয়, তিনি ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী। আর ঐ যাঁর নাম বললে, মমতাময়ী, তিনি আর তাঁর দাদা ছিলেন দেশবন্ধুর দারুণ ভক্ত। সুতরাং বুঝতেই পারো। বিয়ের নাকি ওঁদের দিনক্ষণও ঠিক হ'য়ে গিয়েছিলো— কিন্তু ঐ এক ধাক্কায় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল। মেজোমামা ইউনিভার্সিটি ছাড়লেন না, কিন্তু মমতাময়ীকে ছাড়লেন। অসহযোগের ধাক্কা যখন কেটে গেল, সবাই যে-যার আবার স্কুল-কলেজে ফিরে এলো, মমতাময়ী তখন কলেজে পড়তেন, তিনিও ফের এসে

ঢুকলেন কলেজে। ছোটোমামির কাছে শুনতে পাই, পরে অনেক দরবার হয়েছিলো বিয়েটা হওয়ানোর জন্যে—কিন্তু মেজোমামার গোঁ তো আর জানো না, তিনি কিছুতেই আর রাজী হলেন না বিয়েতে। মমতাময়ীও শুনি এই কারণেই বিয়ে করেননি।'

শুনে চুপচাপ ব'সে রইলো বিনতা। একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো।

আর উন্মেষ চোখ বুজে ইজিচেয়ারে চিৎ হ'য়ে রইলো।

'কিন্তু আমি এখন তাঁকে নিয়ে কী করি বলতে পারো—' উঠে ব'সে বললো উন্মেষ এক-সময়।

বিনতা কী বলবে ভেবে পায় না, কী সাহায্য সে করতে পারে ওকে, উন্মেষের দিকে নির্বাক তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবে সে।

'তুমি যাবে আমাদের বাড়ি? দেখে আসবে তাঁকে?'

চমকে ওঠে বিনতা। বলে, 'আজ? এখন?'

'ক্ষতি কী?'

'না থাক, আজ না। বলব'খন তোমাকে।'

'কিন্তু আমার যে যেতে হবে এখন?' হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললো উন্মেষ, 'আড়াইটে বাজে, তিনটের সময় আমার যাবার কথা এক ডাক্তারের কাছে।'

'ডাক্তার? মেজোমামার জন্যে?'

'হুঁ। উঠি তাহ'লে আজ, কেমন?'

* * এ গা রো * *

আজ আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা···

মৃদু হার্মোনিয়মের সঙ্গে গাইছে বিনতা। দিন কয়েক পরে এক রোববারের সকালবেলায়। বিনতার ঘরে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে ঘিরে ব'সে আছে তাকে পূষন্‌দের কিশোর বাহিনীর গুটি সাত-আট ছেলে-মেয়ে।

উঁচু পর্দায় আজকাল আর গলা ওঠে না বিনতার। দমও পায় না। কিন্তু সে-সব ওজর-আপত্তি এই ছেলে-মেয়েগুলি কানে তুলবে না। গলা নেই দম নেই, তবু বিনতার গান শুনে-শুনে আশ মেটে না ওদের। এক-একটা গান গায় বিনতা, আর ওরা যারা গাইতে পারে অস্থির হ'য়ে পড়ে সেটি গলায় তুলে নিতে। আর, এই ছেলে-মেয়েগুলির পাল্লায় প'ড়ে বিনতাও নতুন ক'রে বাঁচবার উল্লাসে মেতে ওঠে। যেন ধুয়ে ফেলতে চায় মনের সমস্ত গ্লানি।

আগে ওরা জানতো না ওদের এই দিদিটি গাইতে পারে। সেদিন কথায়-কথায় এটা ফাঁস ক'রে দিয়েছে পূষন্‌। কিশোর বাহিনীর মিলন-কেন্দ্রে চলছিলো ওদের সম্মেলনের তোড়জোড়, সম্মেলনে গাইতে হবে ব'লে শ্যামলী রবীন্দ্রনাথের ঐ-গানটির তালিম দিচ্ছিলো— 'তিমির-দুয়ার খোলো', শুনতে-শুনতে পূষন্‌ গোলমাল ক'রে উঠেছিলো— সুর হচ্ছে না, সুর হচ্ছে না। সুর হচ্ছে না? তো গেয়ে শোনাও? 'আমি পারবো না—' বলেছিলো পূষন্‌, 'দিদিকে যদি ধ'রে নিয়ে আসতে পারো তো ত্যাখো, দিদি জানে।'

'দিদি গান জানে?' ব্যস্‌।

কিছুতেই যখন ছাড়া পেলে না তখন ধরা দিতেই হ'লো বিনতাকে। আর যখন ধরাই দিলে তখন দেখা গেল তার গলায় অজস্র গান।

যে-জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ি-চপলা।

'কী বুড়ি-মা?'

'বুড়ো কত্তা ডাকছে তোমাকে আর পীতেম্বরকে।'

আশ্চর্য হ'লো বিনতা। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন! কেন? কী ব্যাপার? আবার তাকে আর পূষন্‌কে একসঙ্গে! কিন্তু সে-সব কিছু বলতে পারে না বুড়ি-চপলা।

কালেভদ্রে বাবাকে দেখতে যায় বিনতা ওপরে। পূষন্ যায় আরো কম। মনে ক'রে দেখলো বিনতা, দিন সাতেক আগে যখন একবার উদ্বেগ বেড়েছিলো বাবার— তখন গিয়েছিলো সে একবার দেখতে।

'চল পূষন্, শুনে আসি— তোরা বোস রে, গানটা তোল ততক্ষণে।'

অরুণ আলোর সোনার কাঠি! রায়বাহাদুরের ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। এখানে রুপোর কাঠির রাজত্ব। কেননা তাঁর রুপোর তারে মোড়া সট্‌কাটি থেকে সদা-নির্গত ধোঁয়ায় এবং পুবের জানালা দুটি খুলতে নিষেধ থাকায় সারদা, বুড়ি-চপলা এবং ভরত ছাড়া আর কারো পক্ষে এ-ঘরে এসে ব'সে থাকা সম্ভব নয়।

নিম্নাঙ্গ তাঁর আজ দশ বছর পর্যন্ত পক্ষাঘাতে অসাড়। বালিশে হেলান দিয়ে ষাট বছরের বৃদ্ধ রায়বাহাদুর সট্‌কাটি মুখে নিয়ে প'ড়ে আছেন। কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটা বালাপোশে ঢাকা। কড়া

তামাকের গন্ধে আর ধোঁয়ায় এবং বারোমেসে একটা ভ্যাপ্‌সা দম-আটকানো পরিবেশে সমস্ত ঘরখানায় যেন কী-এক ভুতুড়ে ছমছমে আবহাওয়া।

পূষন্‌কে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলো বিনতা মা ব'সে আছেন মেঝেয় হাঁটুতে মুখ গুঁজে। ওদের পায়ের শব্দে উঠে পড়লেন, 'আয় মা, বোস। দেখি নীলু আবার আসছে না কেন—' বলতে-বলতে সারদা বেরিয়ে গেলেন।

মনে-মনে প্রমাদ গুনলো বিনতা। গিয়ে বসলো খাটের ওপর বাবার পায়ের দিকে। পূষন্‌ দাঁড়ালো বিনতার পিঠের পাছে খাটের বাজু ধ'রে। তন্দ্রাজড়িত নেশাচ্ছন্ন আরক্ত খুদে-খুদে চোখ দুটি কুঞ্চিত রেখায় ফাঁক হ'লো শ্যামসুন্দরের। সট্‌কাটা একটু নেতিয়ে ছিলো, হঠাৎ ঘন-ঘন জোরালো টানের দমকে এবার প্রাণ পেয়ে উঠলো। মুখ-মুখ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন রায়বাহাদুর, খক্‌-খক্‌ কাশতে লাগলেন, পিকদানিটা টেনে ওয়াক-ওয়াক ক'রে গয়ার ফেললেন।

অবশেষে, মিনিট দশেক পরে, সারদা ফিরলেন নীলুকে নিয়ে; রেশমী রাত্রিবাস পরনে নীলুর, ঢুলুঢুলু চোখ, রুখুরুখু চুল, অলস-আবেশ ভঙ্গি। এসে বসলো পিঠ-উঁচু গদি-আঁটা কাঠের চেয়ারটা সশব্দে টেনে। সারদা আগেকার মতো মেঝেতেই বসলেন। আর বুড়ি-চপলা, সে এসে বসলো ঘরের চৌকাঠের ওপারে উবু হ'য়ে কান খাড়া ক'রে।

ঝিমনো অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগলো রায়-বাহাদুরের। এবং তার পরে ফ্যাসফেসে গলায় বলতে শুরু করলেন যে, রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি, তাঁর মনে হচ্ছে দু-এক দিনের বেশি আর তিনি বাঁচবেন না, তাই এটা এখন ছেলে-মেয়েদের জানানো প্রয়োজন যে তাঁর তিনখানা বাড়ি সমেত সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি

তিনি তাদের মা সারদার নামে উইল ক'রে রেখেছেন, এতে অবিশ্যি যদি ওদের আপত্তি থাকে তবে ওদের ইচ্ছানুযায়ী আজই উইলটা বদলানো দরকার।

শ্যামসুন্দরের কথা শেষ হবার আগেই আসল বক্তব্যটা বুঝে নিয়ে উঠে পড়লো নীলু, টাকরায় শব্দ ক'রে এই বলতে-বলতে সে বেরিয়ে গেল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আই ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দি উইল! হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে!'

'তুই নিচে যা পূষন্—' বললে বিনতা।

বেরিয়ে যায় পূষন্।

'আমার আপত্তি আছে এ-উইলে—' বললে বিনতা স্পষ্ট গলায়।

ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলেন শ্যামসুন্দর, 'আপত্তি আছে? কী আপত্তি?'

'মা-র নামে সমস্তটাই থাকলে আপনার বড়ো ছেলের হাতে সে-সব উড়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। আমি নিজের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু আপনার ছোটো ছেলের কথা আপনার ভাবা উচিত।'

'আমিও তাই বলেছিলাম মা।' বললেন সারদা তাড়াতাড়ি।

সট্‌কাটা মুখে পুরে ভাবতে লাগলেন শ্যামসুন্দর।

বিনতা আর কিছু না ব'লে ব'সে থাকে শক্ত হ'য়ে।

'ছোটো ছেলের কথাও আমার ভাবা উচিত, কেমন?'

'ছোটো ছেলের কথাও আমার ভাবা উচিত, অ্যাঁ!' কথাটা দ্বিতীয়বার বললেন শ্যামসুন্দর প্রত্যেকটি শব্দ টেনে-টেনে। তারপর সারদার দিকে তাকালেন, 'তুমিও বলছো উইলটা বদলানো দরকার, কেমন?'

'হ্যাঁ।' থতমত খেলেন সারদা কথাটা বলতে, 'আমি তো বলি সামান্য কিছু নীলুকে দিয়ে বাকি সবটাই বিনুর নামে লিখে দিলে—'

কথাটা শেষ হ'তে পারে না সারদার, তার আগেই সমস্ত ঘরখানাই উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো রায়বাহাদুরের অট্টহাসির শব্দে। বড়ো ভয়ংকর সে-হাসি। এত জোরে তিনি এখনো হাসতে পারেন, এ কেউ নিজ-কানে না শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না।

হাসি থামিয়ে রায়বাহাদুর হাঁক দিলেন, 'চপলা!'

এসে দাঁড়ায় বুড়ি-চপলা।

'নীলাম্বরকে ডেকে নিয়ে এসো। জল্‌দি।'

মিনিট পাঁচেক সময় ঘরের আবহাওয়া থরথর ক'রে কাঁপলো শুধু। সট্‌কার গুড়গুড় শব্দে শতচ্ছিদ্র হ'লো স্তব্ধতা। তারপর নীলু যখন এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে, ফ্যাসফেসে গলাটা রায়বাহাদুরের তীব্র শোনালো, 'এদিকে আয়।'

খাটের পাশেই অগত্যা এসে দাঁড়ায় নীলু।

'শোন। আমি তোদের জন্ম দিয়েছি সেকথা জানিস তোরা? অ্যাঁ! আচ্ছা, জানিস আর না-ই জানিস, কথাটা সত্যি। কিন্তু আমি ম'রে যাবো শুনে তোদের কিছুই এসে গেল না, অ্যাঁ! এমনিই হয়! বাবা সংসার, সংসার! তা যাক ও-সব বাজে কথা। যে-উইলের কথা বললাম তাতে তোর এই বোনের আপত্তি আছে— কেননা, তোর মাকে দেওয়া মানে নাকি তোকেই দেওয়া, আর তুই তো দু-দিনেই সব ফুঁকে দিবি। তাই আমি ঠিক করলাম উইলটা বদলাতেই হবে। এই ধর চাবিটা। ঐ সিন্দুকটা খোল। ওর মধ্যে দলিল উইল সব আছে, নিয়ে নে তুই। আচ্ছা দাঁড়া, শোন আগে তাহ'লে। আসলে আমার আগের কথাগুলো সব মিথ্যে। তোর মাকে আমি এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই দিইনি (এইখানে আর-একবার হেসে ওঠেন রায়বাহাদুর। বিনতা উঠে দাঁড়ায়। সারদা আরো অস্থির হ'য়ে পড়েন), কুচবেহারের বাড়িটা আর

নগদ দু-হাজার টাকা দিয়েছি চপলাকে। আর বাদ বাকি সব তোর! সমস্ত তোর! হা-হা-হা-হা! রায়বাহাদুর শ্যামসুন্দর ম'রে গেছে, ঠুঁটো জগন্নাথ একটা সাক্ষীগোপাল হ'য়ে গেছে, ভেবেছো তোমরা সবাই। না, মরিনি আমি এখনো! মরার আগে তোমাদের হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো, মরিনি আমি, হ্যাঁ— ছোটো ছেলের কথাও আমার ভাবা উচিত্! এই দশটা বছর কে ভেবেছে আমার কথা! যা, খা এবারে! শয়তানের ভোগ শয়তানেই থাক! যাঃ।'

উত্তেজনার বশে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন তিনি। সট্‌কাটা খ'সে গেল হাত থেকে। বুড়ি-চপলা ছুটে এসে বুক ড'লে দিতে লাগলো তাঁর। বিনতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে কাঁপতে-কাঁপতে। সারদা সম্ভবত উত্থানশক্তি-রহিত হ'য়ে গেলেন। আর নীলু? সে সিন্দুকের চাবিটা হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো কতক্ষণ, আর তারপর এগিয়ে গেল সিন্দুকটার দিকে পরমোল্লাসে।

নিচে নেমে এসে বিনতা ঢুকলো গিয়ে পূষনের ঘরে। কেননা তার ঘরে তখনো ছেলে-মেয়েদের গানবাজনা চলছে পুরোদমে। শ্যামলী কিন্তু লক্ষ্য করলো বিনতাকে, সে-ই ছুটে এলো সঙ্গে-সঙ্গে।

কিন্তু বিনতার মুখ দেখে ভয় পায় সে, কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে।

বিনতা বললো কোনোরকমে, 'আজ তোরা যা ভাই, এখন কোনো কথা আমাকে জিগ্যেস করিসনে। ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে সব চ'লে যা। আর শোন, আজ দুপুরেও আসিসনে তোরা, যা—' একরকম ঠেলেই বের ক'রে দিলো সে শ্যামলীকে ঘর থেকে।

ওরা চ'লে গেলে পূষনের ডাকাডাকিতে দরজা খোলে বিনতা। ভয় পায় পূষন্ দিদির চোখ-মুখের চেহারা দেখে।

'যা তো পূষন্, দৌড়ে উর্মিকে ডেকে নিয়ে আয়, এক্ষুনি, যা—'

কিছুই বুঝতে পারে না পূষন্। কিন্তু তবু আর দাঁড়ায় না সে।

একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এলো উর্মিলা। ওদের পায়ের শব্দে মাথা তুললো বিনতা ইজিচেয়ারের পিঠ থেকে। ছুটে এসে বসলো উর্মিলা নিচে, বললো, 'কি রে, কী হ'লো—'

পূষন্ও এসে দাঁড়ালো কাছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে বললো বিনতা, 'বেশি কথা জিগ্যেস করিসনে এখন উর্মি। পরে বলবো সব। আসল কথা হচ্ছে আমাকে আর পূষন্কে আজই এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, আজই, হ্যাঁ। কেন তা পরে শুনিস। তোকে ডেকেছি, তুই-ই এখন আমার ভরসা, উর্মি। নয়তো দাঁড়ানোর আর জায়গা নেই আমার। পূষনের এটা পরীক্ষার বছর— একটা বছর তুই রাখতে পারবি ওকে তোদের বাসায়? আমি অন্য কোথাও একটা দেখে নেবো—'

সারদা এসে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বোঝাতে চাইলেন, কর্তা তো মরেননি এখনো, উইলের প্রশ্ন তো তাঁর মৃত্যুর পরে, আর তা ছাড়া এ-বাড়িটা তো তাঁর নামেই আছে। কিন্তু কোনো যুক্তির মধ্যেই টানা গেল না বিনতাকে। সারদা তখন পূষন্কে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন।

পূষনের সহ্য হয় না মা-র কান্নাকাটি আর এই অদ্ভুত পরিবেশ। মা-র হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সে বিনতার সামনে, বললে, 'আমি বলছি দিদি, এমন ক'রে আমাদের যাওয়া চলতে পারে না।'

বিভ্রান্তের মতো বিনতা নিজের কাপড়চোপড় সব ভরছিলো স্যুটকেশে। উর্মিলা হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে খাটটার ওপর। পূষনের কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে থমকে যায় বিনতা, তাকিয়ে থাকে পূষনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

'না, আমাদের এমন ক'রে চ'লে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।'

উর্মিলা অবাক হ'য়ে যায় পূষনের কথায় বিনতার প্রতিক্রিয়া দেখে। কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ের এতক্ষণের এত জেদ এত একগুঁয়েমি সব যেন শিথিল হ'য়ে গেল।

স্যুটকেশের ডালা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিনতা টলতে-টলতে গিয়ে পড়লো ইজিচেয়ারটায়।

* * বারো * *

সেদিন মিত্রসদনেও সকাল থেকেই দুষ্টগ্রহের দুর্বিপাক শুরু হ'লো। নিত্যপ্রসাদকে নিয়ে।

বিদ্যুৎ-চিকিৎসা চলছে তাঁর। এর আগে একবার শক খাওয়ানো হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিন তাঁকে নিয়ে যাবার কথা ডাক্তারের চেম্বার্সে। কিন্তু আজ নিত্যপ্রসাদ বেঁকে বসেছেন, কিছুতেই উঠবেন না ইজিচেয়ার থেকে। সকালের খাবার কিন্তু কোনো হাঙ্গামা না ক'রেই খেয়েছেন ঘূর্ণির হাতে নিয়ম-মতো। তার পরে যখন তাঁকে বাইরে বেরুবার জামা-কাপড় পরাতে এলো ঘূর্ণি, বিকারগ্রস্ত বড়ো-বড়ো চোখ দুটো তাঁর কুটিল চকচকে দুটো সাপ হ'য়ে গিয়ে ফণা তুলে নেচে উঠলো।

'ওঠো জ্যাঠামণি, লক্ষ্মীটি। কাপড় জামা প'রে নিয়ে চলো বেড়িয়ে আসি একটু। ওঠো, ও জ্যাঠামণি, ওঠো-না, কী যে তুমি—' টিপটিপ কাঁপে ঘূর্ণির বুক, দম ফেটে কান্না পায়, কিন্তু উপায় নেই। ভয় পেলে চলবে না তার, তাকেই সামলাতে হবে সব, আর তাই দৃষ্টিহীন চোখে ঘূর্ণি জ্যাঠামণির দিকে তাকিয়ে তাঁর হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগলো।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা নেই নিত্যপ্রসাদের, কিন্তু নড়বারও লক্ষণ নেই কোনো। কেবল অদ্ভুত চোখ দুটিতে তাঁর নানারকম ভাবের খেলা চলতে লাগলো। চলতে-চলতে চোখের সাপ দুটো দুলে-দুলে কখন এক-সময় তীব্র ব্যঙ্গে ফেটে প'ড়ে গলিত তরল কালকূটে মাখামাখি হ'য়ে ঝিলঝিল ক'রে উঠলো, কঠিন মুঠিতে নিত্যপ্রসাদ ঘূর্ণির একটা হাত আঁকড়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন নাটুকে গলায়, 'Your name, fair Gentlewoman ?'

কঠিন মুঠির নিষ্পেষণে আতঙ্কে যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে যায়

ঘূর্ণির, দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর মুখ ফোটে না তার।

একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে পড়েন নিত্যপ্রসাদ, অসীম বিতৃষ্ণায় ঠেলে দেন ঘূর্ণিকে দূরে, চক্রাকারে পাক খেতে শুরু করেন ঘরময় আর বিড়বিড় করতে থাকেন, 'O Lear, Lear, Lear ! How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child ! Away, away !'

ছুটে পালিয়ে যায় ঘূর্ণি ঘর থেকে। দোতলায় মায়ের ঘরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তাঁর বিছানায়। ছুটে এলেন নীরজা মেয়ের কাছে।

'আমি আর পারবো না মা ! পারবো না, পারবো না, পারবো না— এই ব'লে দিলাম। আমি কি মানুষ না !'

স্তব্ধ পাথর হ'য়ে গেলেন নীরজা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। নিদারুণ ক্লান্তিতে বললেন, 'তোরা মানুষ না হ'লে আর মানুষ কে। আমিই শুধু আছি একটা অমানুষ !'

উঠে গেলেন নীরজা নিত্যপ্রসাদের ঘরে। এসে থমকে দাঁড়ালেন দরজায়। ঘরময় পাক খাচ্ছেন মেজোভাসুর আর বিড়বিড় ক'রে কী-সব বকছেন ইংরিজিতে।

'উনিশ ! উনিশ !'

একি ! চমকে উঠলেন নীরজা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প'ড়ে নিত্যপ্রসাদ উঁচু গলায় ডাকছেন উনিশকে। এও কি সম্ভব ? ঠাকুর, ঠাকুর, এ যেন সত্য হয়, সত্য হয়··· আনন্দে বিস্ময়ে কেঁদে ফেললেন নীরজা, ছুটে চ'লে গেলেন উন্মেষের ঘরে।

'এই উনিশ, চল শিগগির, তোর মেজোমামা তোকে ডাকছেন।' ছুটে এসে উন্মেষের হাত ধ'রে টানাটানি লাগিয়ে দেন নীরজা।

বিশ্বাস হয় না কথাটা উন্মেষের। শক্ত হ'য়ে থেকে বললে, 'কেন মিথ্যে আর চেষ্টা করছো ছোটোমামি, ও আর হবে না।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন নীরজা, রাগে দুঃখে ইচ্ছে করে তাঁর ছেলেটাকে গালে-মুখে চড়াতে, ইচ্ছে করে চুলের মুঠি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে এই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর হতভাগা ছেলের মাথাটা চেপে ধরতে ঐ দেবতুল্য মানুষটির পায়ের তলায়। বললেন, 'যাবিনে তুই? তোকে ডাকছেন অ্যাদ্দিন পরে নিজে থেকে, তবু যাবিনে তুই?'

'তুমি বানিয়ে বলছো ছোটোমামি। ডাকতে পারেন না মেজোমামা। কিছুতেই না—'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি? মিথ্যে কথা?'

'বেশ, চলো—'

লম্বা-লম্বা পা ফেলে উন্মেষ নিত্যপ্রসাদের ঘরে এলো। নীরজাও এলেন পিছু-পিছু। ঘরের মধ্যে ঢুকে উন্মেষ সরাসরি দাঁড়ালো গিয়ে মেজোমামার পেছনে।

ব'সে আছেন চেয়ারে নিত্যপ্রসাদ তাঁর লেখার টেব্‌লে। খোলা ফাউণ্টেন পেনটা একটা খাতার ওপর বাগিয়ে ধ'রে চিন্তাবিষ্ট হ'য়ে কি যেন সমাধান খুঁজছেন।

The Warnings of King Lear !!! —উন্মেষ দেখলো মেজোমামা খাতাটার ওপর বড়ো-বড়ো ক'রে লিখেছেন। প্রবন্ধ লিখছেন? তার শিরোনামা ঐ?

শেক্‌স্‌পীয়রের এই King Lear নাটক সম্বন্ধে মেজোমামার চিরদিনের বিতৃষ্ণা, উন্মেষ ভালোরকমই জানে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা বিশ্বাসঘাতকতার অমন কুৎসিত দৃষ্টান্ত তিনি নাটকেও সহ্য করতে

পারেন না। এই নাটকের আলোচনা উঠলে মেজোমামা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনায় অসংযত হ'য়ে ওঠেন, শেক্স্পীয়রের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করেন— ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-মহলে একথা কে না জানে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিত্যপ্রসাদকে খ্যাপানোর দুষ্টুমি চাপলে কতদিন তারা এই King Lear নামটা ঢিলের মতো ছুঁড়েছে নিত্যপ্রসাদের কানে।

কেননা, মেজোমামা বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী? মানুষের বুকের মধ্যে আশা আনন্দ ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা তো? যদি তাই হয়, তবে এ-নাটক লিখে ভদ্রলোক নিজেকে চরম অসাহিত্যিক প্রতিপন্ন করেছেন। কী মানে হয় এডমণ্ডের মতো অমন শয়তান একটা জারজ সন্তানকে সাহিত্যে ঢুকিয়ে দেবার, কী দরকার ছিলো গনেরিল আর রিগ্যানের মতো অমন দুটো নচ্ছার ডাইনীকে কর্ডেলিয়ার মতো অমন সুন্দর একটি মেয়ের বোন করবার? সাহিত্যের কি মানুষের এতে কী সুসার হয়— হাজার তর্কেও কেউ কোনোদিন মেজোমামাকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি সেটা।

তাহ'লে সেই কথাটাই এখন মেজোমামা লিখিত-ভাবে বলতে বসলেন নাকি? কেন? উন্মেষের মনের মধ্যে আবার দাউদাউ অভিমান জ্ব'লে ওঠে। এই উন্মাদ অবস্থার মধ্যেও আর-সব ছেড়ে ঐ King Lear-ই তাঁর মাথার মধ্যে এসে চাপলো কেন ভূতের মতো? এ-রোগের কি ওষুধ? কোন ওঝা পারবে এমন সেয়ানা পাগলের পাগলামি সারাতে! কঠিন কঠোর হ'য়ে যায় উন্মেষের মনটা। ফিরে দাঁড়িয়ে সে চ'লে যেতে উদ্যত হয়।

কিন্তু সাধ্য কী। নীরজা অমনি খপ ক'রে ধরলেন উন্মেষের একটা হাত।

'ছাড়ো।'

চমকে মুখ ফেরান নিত্যপ্রসাদ। উন্মেষের দিকে তাকিয়ে বিকারগ্রস্ত চোখ দুটোতে তাঁর অবিশ্বাসের ক্লেদ কিলবিল ক'রে ওঠে।

অসহ্য লাগে উন্মেষের এই দৃষ্টি। সে-ও যেন অন্ধ হ'য়ে যাবে ঐ-চোখের দিকে আর-একবার তাকালেই। হঠাৎ সে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে: 'কী করেছি আমি, বলো, বলো তুমি··· তুমি যা করতে বলবে আমি তা-ই করবো, বলো—'

নীরজা তাড়াতাড়ি চেপে ধরেন উন্মেষের মুখটা।

নিত্যপ্রসাদ হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে। ঘুরতে শুরু করলেন ঘরের মধ্যে চক্রাকারে। হাসির বেগটা একটু কমলে উন্মেষের দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি শুরু করলেন নাটুকে গলায়, 'Take heed of the foul fiend: obey thy parents ; keep thy words justly ; swear not ; commit not with man's sworn spouse ; set not thy sweet heart on proud array. Should I repeat? Well then, obey thy parents ; keep thy words justly—' পরের কথাগুলো হঠাৎ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল, সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টায় মুখ-চোখ তাঁর শক্ত কুঞ্চিত বিকৃত হ'য়ে যেতে লাগলো, এবং অবশেষে, স্পষ্ট দেখলেন নীরজা, স্পষ্ট দেখলো উন্মেষ, কেঁদে ফেললেন তিনি। মেঝের ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিত্যপ্রসাদ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো উন্মেষ মেজোমামাকে, নীরজা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই ব'সে পড়লেন অবসন্নের মতো।

এক-ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলেন নিত্যপ্রসাদ নিজেকে। উন্মেষ যেন একটা সাপ, তার ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছিটকে স'রে

গেলেন তিনি ইজিচেয়ারটার পাশে, দূর থেকে উন্মেষের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে ফুটে ওঠে ত্রাস, ঘৃণা।

প্রস্তরীভূত উন্মেষ অপলক চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে ছাখে তার মেজোমামাকে।

নীরজা উঠে প'ড়ে ঘর থেকে চ'লে যাবার জন্মে পা বাড়াতেই নিত্যপ্রসাদ আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলেন, নীরজার দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় একটা হাত প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললেন, 'Cordelia, Cordelia ! stay a little, Ha !'

যন্ত্রচালিতের মতো নীরজা দরজার কাছ থেকে ছিটকে স'রে এলেন নিত্যপ্রসাদের পাশে। উন্মাদ নিত্যপ্রসাদ ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরলেন নীরজাকে। প্রাণপণ শক্তিতে নীরজাকে বুকের মধ্যে পিষতে লাগলেন, নীরজার গালে গাল ঘষতে লাগলেন আর গোঙাতে লাগলেন।

এভাবে আক্রান্ত হবেন, কল্পনাও করতে পেরেছিলেন কি নীরজা? সমস্ত চৈতন্য সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী তাঁর শিথিল অবশ হ'য়ে গেল, নির্জীব একটা মাংসপিণ্ডের মতো তিনি নিজেকে নিত্যপ্রসাদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিলেন।

আর উন্মেষ?

দরজার চৌকাঠের ও-পাশে-দাঁড়ানো ঘূর্ণি?

চোখের সামনে তারা এ-দৃশ্য দেখলো? না দেখলো না? সঠিক বলা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে, ঘূর্ণি যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলো তা সে নিজেই জানলো না। দরজাটা আটকে ফেলে সে এমন অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য সংসারের আর-সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে ফেললো, নিজেও মেঝেয় ব'সে হাঁটুতে মুখ গুঁজলো। আবার উঠতেও হ'লো সঙ্গে-সঙ্গেই। বাহুবন্ধন সম্ভবত

আলগা করেছিলেন নিত্যপ্রসাদ, আর সঙ্গে-সঙ্গে নীরজার অচেতন দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

উন্মেষ ও ঘূর্ণি দু-জনেই ছুটে এলো নীরজার কাছে; ভয় পেয়ে নিত্যপ্রসাদ স'রে গেলেন দূরে, কিন্তু চোখে-মুখে ফুটে উঠলো হিংস্র রাগ, দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগলেন তিনি, যেন একটা বেড়াল তাক্ খুঁজতে লাগলো তার মুখ থেকে কেড়ে-নেওয়া ইঁদুরটার ওপর কখন আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ডাক্তার? না, সাব্যস্ত করে ওরা, ডাক্তার ডাকা চলবে না। বাড়ির আর-কাউকেও ডাকা চলবে না। কিন্তু তাহ'লে কী করবে এখন তারা এই দুই রুগীকে নিয়ে? ঘূর্ণি তাড়াতাড়ি ছুটলো জলের সন্ধানে নিজের ঘরে। কিন্তু ধরা প'ড়ে যায় মিনুর কাছে। 'ও কি রে রিণিদি, কুঁজোটা নিয়ে চললি কোথায়?' ঘূর্ণির মুখে প্রথমটা উত্তর জোগায় না, শেষে ব'লেই ফেললে, 'মা ফিট হয়েছে—' ব'লেই দৌড়য়। পিছু নেয় মিনু চিনু গিনু।

নীরজা ফিট হয়েছেন নিত্যপ্রসাদের ঘরে, এই খবরটি অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত বাড়িতে।

কেন ফিট হলেন?

এই প্রশ্নটির সঙ্গে সকলের মনে আরো দুটি প্রশ্ন লাফিয়ে উঠলো। এক, নীরজার তো ফিটের ব্যারাম নেই— তবে? দুই, ফিটের খবরটা ঘূর্ণি মিনুদের কাছে নিজে থেকে বলেনি, কুঁজো নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলো, মিনু জিগ্যেস করতে তবে বলেছে— এর মানে? ফিট হওয়ার কারণটা তাহ'লে কী?

এই তিনটে প্রশ্ন থেকে এ-বাড়ির বয়স্কদের মনে নানারকম উত্তরের

উৎপত্তি ঘটলো। সেই-সব উত্তর থেকে আবার নবতর প্রশ্নের উদ্ভব। সেই প্রশ্নগুলি প্রসব করলো আবার নূতনতর পর্যায়ের উত্তর। সৃষ্টিতত্ত্বের এই আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঐ বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই নিত্যপ্রসাদ নীরজা উন্মেষ আর ঘূর্ণিকে নিয়ে কত বিচিত্র গবেষণার যে অবতারণা হ'লো সকলের সারবান মস্তিষ্কে! মাছি তো এক-এক বারে দেড়শোটি ডিম পাড়ে মাত্র, সন্দেহ এক-এক বারে ডিম পাড়ে অন্তত তার দ্বিগুণ।

আর, পৃথিবীর রঙ বদলে গেল ঘূর্ণি উন্মেষের চোখে। যতই তারা ভুলতে চেষ্টা করে দৃশ্যটা, ততই সেটা বন-ওকড়া ফলের মতো আরো জড়িয়ে-আঁকড়িয়ে ধরে তাদের— কাঁটাগুলো ফুটে যায় তাদের সমস্ত চৈতন্যে।

নিত্যপ্রসাদকে নিয়ে সেদিন আর ডাক্তারের কাছে যাওয়া হ'লো না। দেরি দেখে ডাক্তার নিজেই ফোন করেছিলেন, ফোন পেয়ে বিভাবতী ঘূর্ণিকে অবলম্বন ক'রে প্রাণপণ একটা চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মেজদাকে বশে আনবার, কিন্তু ফলটা হয়েছিলো বিপরীত।

নীরজা শয্যা নিলেন। আচ্ছন্ন মুমূর্ষুর মতো প'ড়ে রইলেন নেতিয়ে বিছানায়। কারো কোনো কথার জবাবে হাঁ-না কিছুই বললেন না। থেকে-থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে তাঁর চোখ থেকে আর কেঁপে-কেঁপে উঠছেন।

আদিত্যপ্রসাদ খেপে অগ্নিশর্মা হলেন এবং দুপুরে খেতে ব'সে ভালো ক'রে না-খেয়ে আর চাকরবাকরদের অকারণে গালি-গালাজ ক'রে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। যাবার আগে ঘর থেকে সবাইকে বের ক'রে দিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করলেন নীরজার, এ-সবের মানে কী জানতে চাইলেন। কিন্তু নীরজা নির্বাক নিস্পন্দ। আদিত্যপ্রসাদ তখন

বাছা-বাছা কিছু শ্লেষ-বাক্য শোনালেন তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে। শুনিয়ে চ'লে গেলেন রিজেন্ট পার্কে তাঁর অবসরযাপনের সঙ্গিনী বা তাঁর হৃদয়ের শুশ্রূষাকারিণী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা সীনিয়র ট্রেনড্ নার্স মিস পুষ্পময়ী রায়ের কাছে।

চেম্বার্স থেকে ফিরে এসে বিভাবতীর নির্বন্ধাতিশয্যে শিবপ্রসাদ দেখতে এলেন নীরজাকে। কিন্তু নীরজা শক্ত হ'য়ে রইলেন কাপড়ে মুখ ঢেকে, কিছুতেই হাতখানা বের ক'রে নাড়ী পরীক্ষা করতে দিলেন না। মুখ ব্যাজার ক'রে ফিরে গেলেন শিবপ্রসাদ।

ঘূর্ণি শুয়ে রইলো নিজের ঘরে মুখ কালি ক'রে, দুপুরে খাবার ডাক পড়লে বিরক্ত হ'য়ে চাকরকে হাঁকিয়ে দিয়ে দরজায় তুলে দিলো ছিটকিনি।

আর উন্মেষ?

নীরজা শয্যা নিয়েছেন ব'লে উন্মেষ সম্বন্ধে সব দায়িত্ব যেন বি[illegible]তাঁর ওপর বর্তে গেছে— এই কর্তব্যবোধে অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ বিভাবতীর হঠাৎ যখন খেয়াল হ'লো, উনিশ খায়নি তো— তখন গোটা বারোর সময় মেদালস দেহটি নিয়ে হন্তদন্ত ছুটলেন তিনি তেতলায় ওর তত্ত্ব নিতে, কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজেও কোথাও উন্মেষকে পাওয়া গেল না।

* * তেরো * *

সেদিন, বিকেল চারটের সময় প্রশান্ত এলো বিনতার কাছে। দরজা ভেজানো ছিলো। পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসে বসলো চেয়ার টেনে বিনতার কাছে। সমস্ত মুখ থমথম করছে প্রশান্তর।

নির্বিকার মুখে শুয়ে আছে বিনতা ইজিচেয়ারটায়। মৃদুস্বরে বললো, 'কী ব্যাপার!'

কথা না ব'লে প্রশান্ত স্থির চোখ দুটি নিবদ্ধ রাখলো বিনতার মুখে। গূঢ় কোনো বক্তব্য যেন নিষ্পিষ্ট হ'তে লাগলো তার ঠোঁটের রেখায়।

কথার জবাব না পেয়েও বিনতা আর কৌতূহল প্রকাশ করলো না। উঠে ব'সে সহজ গলায় বললো, 'আচ্ছা প্রশান্ত, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে দিতে পারো? যে-কোনো চাকরি। এ-বছর পরীক্ষা দেওয়া আর হ'লো না আমার— আর শুধু চাকরি না, ছোটোখাটো একটা ফ্ল্যাটও, আমি আর পৃথক্ থাকবো। এ তোমাকে দিতেই হবে জোগাড় ক'রে। তুমি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই পারো।'

প্রশান্ত অবাক। বললে, 'নিশ্চয়ই পারি। না-পারার কী আছে। তুমি রাজী হ'লেই হয়!'

শুয়ে পড়লো বিনতা। চোখ বুজলো অসহ্য বিতৃষ্ণায়।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ প্রশান্ত নেমে বসলো বিনতার পায়ের কাছে। ভারী হাত দু-খানা রাখলো বিনতার কোলের ওপর। চমকে উঠে বসলো বিনতা। শরীরের সমস্ত রক্ত তার একসঙ্গে ছল্‌কে উঠলো, 'ছি ছি প্রশান্ত, এ কী—' কিন্তু হঠাৎ এত ভয়— এমন কাঁটা দিয়ে ওঠে কেন সমস্ত শরীরে··· আঃ, না না— 'ছি প্রশান্ত, উঠে বোসো, আমি—'

আমি তো তোমাকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসি— সমস্ত চেতনা তার চিৎকার ক'রে বলতে চায়, কিন্তু পারে না— সত্যিই ভালোবাসি··· বিশ্বাস করো··· কিন্তু এ তোমার কোন দাবি, আমি যে অন্য আর-একজনকে কথা দিয়েছি! কথা দিয়েছো? দাওনি, দাওনি, কোনো কথাই তোমাদের মধ্যে হয়নি, কোনো কথাই হয়নি—

একটা ডানা-ভাঙা পাখি নিঃসীম শূন্যে যেন ঘুরে-ঘুরে পড়তে লাগলো নিচের দিকে।

উন্মত্তের মতো প্রশান্ত বিনতার কোলের মধ্যে মুখ লুকলো, প্রাণপণে বিনতার কটিবেষ্টন ক'রে ধরলো দু-হাতে।

থরথর কাঁপছে বিনতা, আচ্ছন্ন অবশ হ'য়ে গেছে তার সমস্ত শরীর, সমস্ত ইন্দ্রিয়।

কিন্তু যে-মুহূর্তে আরো ওপরে উঠতে চেষ্টা করে প্রশান্ত, তীব্র একটা ঘৃণার স্রোত শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে চারিয়ে যায় বিনতার, জোরটা ঠেলে দিয়ে সমস্ত শক্তিতে সে দাঁড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে এই আদিম বর্বরতার গ্রাস থেকে— কিন্তু সারাদিনের ক্লান্ত অনশনক্লিষ্ট দেহটা বিশেষ সাহায্য করলো না তার নৈতিক বোধকে। দাঁড়িয়ে উঠতে পারলো সে, কিন্তু মুক্ত করতে পারলো না নিজেকে প্রশান্তর নির্মম থাবা থেকে। সে এক কুৎসিত বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হ'লো তখন সেই দরজা-জানালা-সাঁটা ঘরের মধ্যে। উন্মত্তের মতো বিনতা প্রশান্তর চুল টেনে ধ'রে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগলো প্রশান্তর নির্বোধ গ্রাস থেকে, আর প্রশান্ত— হাঁটু-গেড়ে-বসা প্রশান্ত— ক্ষিপ্তের মতো বিনতার কোমর আঁকড়ে ধ'রে বিনতার প্রসন্নতা, বিনতার প্রেম, বিনতার স্বীকৃতি ভিক্ষা চাইতে লাগলো।

দু-মিনিট না দু-যুগ কেটে গেল এমনি বেপরোয়া কদর্য সংগ্রামে সে-বোধ রইলো না কারো। শুধু দুঃসহ দ্বন্দ্ব চললো দেবাসুরে, অমৃতে-গরলে, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর।

অবশেষে এক-সময় বিনতাকে ছিটকে পড়তে দেখা গেল তার বিছানায়, আর প্রশান্তকে মুখ ঢেকে ব'সে থাকতে মেঝেয়।

ঘটনাটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকলো শুধু ইজিচেয়ারটা। ধস্তাধস্তিতে ভেঙে গেছে সেটা, ভূমিসাৎ হ'য়ে প'ড়ে রইলো নিরপরাধ জড় পদার্থটা মেঝের ওপর।

এর পর ঘরের মধ্যে একটা দুঃসহ শূন্যতা। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রশান্ত, চোরের মতো একবার তাকালো খাটের ওপর বালিশে মুখ-ঢেকে-প'ড়ে-থাকা বিনতার দিকে—একরাশ রুক্ষ কালো চুল আলুলায়িত ছড়িয়ে আছে পিঠময়, দেখে যেন তার বুকের মধ্যে তীব্র একটা বালুকার ঝড় উঠলো। আর তার মধ্যেই হাঁটু-ভাঙা একটা পশুর মতো ধুঁকতে-ধুঁকতে বেরিয়ে গেল প্রশান্ত দরজা খুলে। সশব্দে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা পেছনে।

সেই শব্দে চমক ভেঙে উঠে বসলো বিনতা। ভাঙা চেয়ারটার দিকে চোখ পড়লো একবার। যদি কেউ এসে পড়ে এক্ষুনি? ভয়ে লজ্জায় হাত-পা অবশ লাগে তার। তবু প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ায় সে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা অতল গভীরে ঘন অন্ধকারে যেন ডুবে যায়, দু-হাতে মাথা চেপে ধ'রে ব'সে পড়ে মেঝেয়।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ, হয়তো একঘণ্টা কি আরও বেশি, কেটে গেল।

তারপর আধ-খোলা দরজার বাইরে থেকে ক্ষীণ একটা ডাক যখন ভেসে এলো বিনতার কানে, তখন সত্যিই ঘরটা সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে

গেছে। মূর্ছার ঘোর কাটিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো বিনতা, কেমন যেন শীত-শীত লাগলো, উঠে প'ড়ে ত্রস্ত পায়ে স'রে এলো দরজার মুখে।

'কী মা ?'

মেয়েকে দেখে সারদার ক্লান্ত নিরুপায় দৃষ্টি কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়লো।

'ঘরেই আছিস মা ? একা ? আলো জ্বালিসনি কেন ?'

'শরীরটা বড্ডো খারাপ লাগছে মা—' দরজার একটা পাল্লায় ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়ালো বিনতা।

'খারাপ লাগছে ?' ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন সারদা, কাছে স'রে এসে হাত দেন মেয়ের কপালে বুকে, 'শরীরের আর দোষ কী, সারাটা দিন যে-ক'রে কাটালি, খেলি না দেলি না, মাথায় একটু জলও দিলি না—'

ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙে যায় বিনতার, ছেলেমানুষের মতো ভেঙে পড়ে সে মায়ের কাঁধের ওপর, কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে।

'ভগবান, ভগবান !' করুণায় মমতায় বিদীর্ণ হ'য়ে গেল যেন স্নেহবুভুক্ষু সারদার বুকটা।

এক ঘণ্টা পরে।

বিনতা কাং হ'য়ে শুয়ে আছে তার বিছানায়। সারদা শিয়রে ব'সে জট ছাড়াচ্ছেন মেয়ের চুলের। পূষন্ পাশে ব'সে দিদির বাঁ-হাতটা চিতিয়ে আড় ক'রে দুমড়ে তেরছা ক'রে ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করছে। আর, পাশেই উর্মিলা ব'সে আছে চেয়ারে। 'দেখি তো উর্মিদি তোমার বিদ্যাস্থানটা—' এবার জ্যোতিষার্ণব উর্মিলার বাঁ-হাতটা টেনে নেয়। 'ওমা! একি!' 'কী, কী দেখলি ?' ভড়কে যায় উর্মিলা। 'তোমার বিদ্যাস্থানে যে— বলবো ?' 'শিগগির—' 'তোমার বিদ্যাস্থানে বিদ্যুৎ।'

বিনতা পর্যন্ত হেসে ফেললো এবার।

সান্নদার মুখের সেই সদা-বিষণ্ণতা কোথায় গেছে মিলিয়ে। ছেলের দুষ্টুমিতে মিষ্টি একটা ধমক দেবার ইচ্ছে হয় তাঁর, কিন্তু সে-ইচ্ছে কণা-কণা স্বর্ণরেণুর মতো ছড়িয়ে পড়ে তাঁর আলো-মাখানো টকটকে মুখখানায়— বলতে পারেন না কিছু।

আর উর্মিলা চটাস্ ক'রে একটি চড় দক্ষিণা দেয় গনৎকারকে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো বিনতা। উর্মিলার হাতটা টেনে ছাখে, আটটা বেজেছে। বললো, 'মা, একটু বেরুবো আমি, না, বারণ কোরো না, শরীর এখন আর একটুও খারাপ লাগছে না, অতটা দুধ খেয়ে মনে হচ্ছে এখন দশ মাইল রেস দিতে পারি!'

'কিন্তু এত রাত্তিরে তুই যাবি কোথায় বল দেখি? একা যাবি?'

'একা কেন— উর্মি, চল-না ভাই একটু, বেশি দূরে না, চল-না, চল—'

রাস্তায় বেরিয়ে উর্মিলা বললো, 'কোথায় যাবি সেটা না-বললেও বুঝে নিয়েছি। কিন্তু এত রাত্তিরে এই অভিসারে না বেরুলেই চলতো না?'

'অভিসার তো রাত্তিরেই হয় রে বোকা!'

'সে-বাড়ি চিনিস তুই? একদিন তো মাত্র গেছিস— খুঁজে বের করতে পারবি তো?'

'চল তো—'

সাড়ে-আটটার সময় যখন পৌঁছলো ওরা মিত্রসদনের গেটে, দোতলার ব্যালকনি থেকে ওদের দেখে ভুরু কোঁচকালো ঘূর্ণি আর রুচিরা।

'ঐ শাদা শাড়ি-পরা মেয়েটিকে চেনা-চেনা লাগছে যেন—' ঘূর্ণি বললে।

'ওর নাম বিনতা।' মুহূর্তে শক্ত হ'য়ে গেছে রুচিরার চেতনা, বললে সে উদাসীন গলায়।

'বিনতা! এ-ই বিনতা?' তাড়াতাড়ি ঘূর্ণি নিচে নেমে এলো সদরে, 'কাকে খুঁজছেন?'

খোট্টা দরোয়ান রামগোলাম বললে আগ-বাড়িয়ে, 'উনুইশ দাদাকে। তো হামি তো বোল্ দিয়া—'

'তুমি থামো না! উন্নিশদা'কে খুঁজছেন? আসুন-না ভেতরে।'

'কী হবে এসে—' হাসে বিনতা, এগিয়ে আসে একটু, 'শুনলাম নাকি বাড়িতে নেই?'

'নেই কি যেমন-তেমন নেই, একেবারে সেই বেলা দশটা থেকে খোঁজ নেই ছেলের। তা আমি তো ভেবেছিলাম আপনার ওখানেই আছে— যায়নি আপনার ওখানে?'

অবাক বিনতা। বললো, 'আপনি কি চেনেন আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনি বিনতা তো?'

'আপনি তাহ'লে ঘূর্ণি— আমার অবিশ্যি মনে হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু উনিশদা'র খবর আপনি জানেন না কিছু?'

'না। আপনাদের তো দুপুরে যাবার কথা ছিলো আমাদের বাসায়?'

'তা তো ছিলো, কিন্তু যে নিয়ে যাবে সে-ই যে নিখোঁজ। কী কাণ্ড দেখুন দেখি—' অস্থিরতা লুকোতে পারে না ঘূর্ণি, 'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।' ভেতরে যেতে-যেতে বিড়বিড় করতে থাকে সে, 'আর কোথায় যেতে পারে, কোথায় খোঁজ নিই এখন বলুন তো! বন্ধুবান্ধব তো আছেন এককাঁড়ি—'

ওদের বসানোর জন্যে ঘূর্ণি উন্মেষের ঘরটাই পছন্দ করলো। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো রুচিরা। বিনতাকে একটু মামুলি ভদ্রতা দেখিয়ে স'রে পড়তে চেয়েছিলো সে, ঘূর্ণি কিন্তু ছাড়েনি, হাত ধ'রে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছে তাকেও।

কিন্তু কথাবার্তা একেবারেই জমলো না। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠলো ঘরের আবহাওয়া। কেন, বলা কঠিন। ঘূর্ণি একাই শুধু বক্‌বক ক'রে চললো, বিষয়বস্তু উন্মেষের সীমাহীন কাণ্ড-জ্ঞানহীনতা। ঘূর্ণির বচন-বাচনে সাধারণত হাওয়াও হেসে ওঠে, কিন্তু কোনো কারণে হাওয়া ভয় পেয়ে যদি পালিয়েই যায় ঘর থেকে!

'উঠবিনে বিনতা? ন'টা বাজে—'

'হ্যাঁ, চল—' উঠে পড়ে বিনতা চেয়ার থেকে, 'আজ তাহ'লে চলি—'

'কিন্তু আমি এখন কী করি সেটা বলুন তো। মাকেই বা কী বলবো। এত বড়ো কলকাতা শহর, এর কোথায় এখন খুঁজতে যাবো—'

দরজায় উন্মেষ।

অতর্কিত লজ্জায় আনত হ'লো বিনতার দুই চোখ, মুখ ফেরালো সে উন্মেষের চোখ তার ওপর পড়তেই।

রুচিরাও মুখ ফেরায়, কিন্তু তার দিকে উন্মেষের চোখ পড়বার আগেই।

ঘূর্ণি মুখ ফেরালো না, তার চোখ দুটি ইতিমধ্যে কুমির হ'য়ে গেছে, উন্মেষকে বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তই গিলে খাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখা গেল।

আর মুখ ফেরালো না উর্মিলা, বাক্যস্ফূর্তিও হ'লো তারই প্রথম। সে বললে, 'আসুন মহারাজ আসুন, ভেতরে এসে আসন পরিগ্রহ করুন, কত রাজ্যে দিগ্বিজয় সেরে এলেন সেই কাহিনী বলুন। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় বুঝি ছাতি ফেটে যাচ্ছে— জল খাবেন একটু?'

এগিয়ে এলো উন্মেষ উর্মিলার কাছে, 'কতক্ষণ এসেছো? দাঁড়িয়ে কেন সব? জল খাওয়াবে তো খাওয়াও, সত্যি ভয়ানক— হ্যাঁ রে রিণি, ছোটোমামি কেমন এখন? অ্যাঁ?'

'লজ্জা করে না তোর সে-কথা জিগ্যেস করতে—' ফেটে পড়ে ঘূর্ণি, উত্তেজনার ধমকে শেষের কথা তিনটে তার উল্টেপাল্টে গেল।

'তুমি জানো নাকি?' ভয়ানক মনোযোগ-সহকারে একটা বই পড়তে ব্যস্ত রুচিরাকে জিগ্যেস করলো উন্মেষ, 'ছোটোমামি কেমন আছেন জানো নাকি?'

মুখ বাঁকালো রুচিরা, বললে দাঁতে কেটে, 'নিজে গিয়ে দেখলেই হয়!'

'অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আমরা আজ চলি—' বললো বিনতা উন্মেষকে, সহজ হবার চেষ্টায় হাসে সে একটু, চেষ্টা করে একটু মামুলি পরিহাসের, 'অতর্কিতে হানা দিয়ে দেখে গেলাম তোমার ঘর, টেবলটা ও-রকম লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রেখেছো কেন? ভালো ক'রে গুছিয়ে রাখবে। আচ্ছা চলি ভাই—' ঘূর্ণির দিকে ফিরলো, 'আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে ভালো ক'রে ভাব জমানো যাবে।'

'আপনার! ওকে আবার আপনি! করছো কি তুমি?' চোখ কপালে তুললো উন্মেষ।

হেসে ফেললো বিনতা, বললো, 'আমারও বিচ্ছিরি লাগছে, কিন্তু ওর যা মেজাজের অবস্থা এখন!'

'মেজাজের দোষ দিয়ো না—' ঘূর্ণি কিন্তু তৎক্ষণাৎ তুমিত্বে উত্তীর্ণ হ'লো, বললে ঝাঁপতালে, 'জিগ্যেস করো তো ওকে, কোথায় ছিলো এতক্ষণ সেই বেলা দশটা থেকে!'

'সত্যিই তো। কোথায় ছিলে বলো তো?'

পরবর্তী দশ মিনিটে ঘরের আবহাওয়া হাল্কা স্বচ্ছন্দ হ'য়ে এলো। ন'টা বেজে গেলে বিদায় নেয় বিনতা উর্মিলা রুচিরা। এগিয়ে দিতে উন্মেষ এলো ওদের সঙ্গে।

রাস্তায় খানিকটা গিয়ে এক মোড় থেকে রুচিরা বিদায় নিলো সকলের

কাছ থেকে। ঊর্মিলা তখন কী পরামর্শ করলো বিনতার সঙ্গে জনান্তিকে। তারপর বললো উন্মেষকে, 'আমি এগিয়ে যাই, তোমার সঙ্গে কী-সব কথা আছে শ্রীমতীর, আমি থাকলে আবার সে-সব হবার নয়। তুমি শুধু দয়া ক'রে কথাগুলো একটু শর্টকাট কোরো, আর ওকে একটু পৌঁছে দিয়ো বাড়ি পর্যন্ত— শরীর ভালো নেই শ্রীমতীর, অসুস্থ শরীরেই বেরিয়েছেন—'

মুখে আঙুলের টোকা মেরে ঊর্মিলাকে থামায় বিনতা। উন্মেষকে স্বচ্ছন্দ গলায় বলে, 'অনেক রাত হ'য়ে গেছে, এখন থাক সে-সব কথা। কাল সকালে তুমি একবার আসতে পারবে আমাদের ওখানে?'

'না-পারার কী—' বললো উন্মেষ।

'আজকে দুপুরে—' ঊর্মিলা বললো, 'না-পারার কী হয়েছিলো? কোন চুলোয় গিয়েছিলে?'

'তোমার মুখে যে আজ খৈ ফুটছে ঊর্মিমালা, ব্যাপার কী!'

'সত্যি!' হাসলো বিনতা, 'কিন্তু আর দেরি কোরো না তুমি, যাও।'

'কাল কখন যাবো সকালে?'

'যখন খুশি।'

'যখন খুশি?'

* * চোদ্দ * *

বাড়ি ফিরে এসে উন্মেষ সরাসরি নিজের ঘরে উঠে এলো, দেখলো, ঘূর্ণি শুয়ে আছে মুখ ঢেকে বিছানায়।

জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে বসলো খাটের ওপর। ঘূর্ণির মাথাটা আস্তে নাড়া দিয়ে ডাকলো, 'রিণি—'

উঠে বসলো ঘূর্ণি। ধীর স্থির ভাব। চোখ দুটিতে অনীহা। কণ্ঠস্বর নির্বিকল্প। বললে, 'মা-র কাছে গিয়েছিলি ?'

'না, চল যাই—' কেঁপে ওঠে উন্মেষের বুক।

'গিয়ে আর কী হবে। যা আগুন জ্বালিয়েছিস— এখন আর না গেলেও চলবে! সারাটা দিন কিচ্ছু মুখে দেয়নি মা। ডাক্তার হাজরা ব'লে গেলেন, না খাওয়াতে পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি লাগবে। আর এদিকে জ্যাঠামণি— সকালে আমরা না যাওয়াতে ডাক্তার বক্সী এসেছিলেন দেখতে বিকেলে, জ্যাঠামণিকে কাছে গিয়ে কী-একটা বলতেই ধাঁই ক'রে এক চড় তাঁর গালের ওপর। বেঁধে রাখতে ব'লে গেলেন ডাক্তার বক্সী। কিন্তু কে বাঁধবে। পাগলামি করুন আর যা-ই করুন, তাই ব'লে বেঁধে রাখা যায় নাকি!'

'চল দেখি, দেখে আসি—' ঘূর্ণির হাত ধ'রে টানলো উন্মেষ।

যেতে-যেতে ঘূর্ণি বললে, 'কোথায় ছিলেন আপনি সারাটা দিন ?'

'লুম্বিনি গিয়েছিলাম। ডাক্তার সেন সব শুনে বললেন চেঞ্জে নিয়ে যেতে। হাওয়া-বদল করাতে পারলে এ-সব কেস নাকি ভালো হ'তে দেখা গেছে। আরো অনেক কথাই বললেন— বলব'খন পরে। তা আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি মেজোমামাকে নিয়ে হাজারিবাগ গিয়ে থাকবো। আর ছোটোমামি ও তুই থাকবি সঙ্গে।'

'শুধু হাওয়া-বদলেই হবে? আর-কিছু লাগবে না?'

'লাগবে। আমাকে থাকতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর চোখে-চোখে। তুই গেট সামলাবি, ওখানেও তো বদ ছেলেপিলে থাকতে পারে— তুই সব-সময় হুঁসিয়ার থাকবি যেন সে-সব আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একদম ঢুকতে না পারে। আমি মেজোমামার নাকের নিচে ব'সে-ব'সে প্রাণায়াম-ট্রানায়াম করবো, সৎ-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করবো। চাই কি, রোজ সকালে-বিকেলে বাড়ির সামনে ফুলের বাগান-টাগান ক'রে একটু এস্থেটিক কালচারও করা যাবে। তাছাড়া আরো দুটো কাজ ঠিক ক'রে ফেলেছি আমি— একটা বিলিতি কুকুর এবং একটা তোতাপাখি কিনে নিয়ে যাবো। কুকুরটাকে শেখাবো বিশ্বস্ত হ'তে এবং তোতা-পাখিটাকে শেখাবো কথা। এতেও যদি না হয়—'

তালাবন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো ওরা— নিত্যপ্রসাদ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন ইজিচেয়ারটার ওপর। ঘুমোলে নাক ডাকে না তাঁর, আজ তিন দিন পর্যন্ত সর্দি হয়েছে ব'লেই হয়তো নাক ডাকছে। কিন্তু কেন যে ঐ নাকডাকার শব্দটা এখন এত অসহ্য লাগছে উন্মেষের! মমতায় করুণায়— আবার সেই সঙ্গে আত্মগ্লানিতে আত্মধিক্কারে সমস্ত মনটা তার মথিত হ'তে শুরু করলো। কিন্তু ভেতরে ঢুকলো না— ঘূর্ণিকে টেনে নিয়ে নেমে এলো ছোটোমামির ঘরে।

দরজা খোলা, কিন্তু নিঃসাড় নিথর অন্ধকার ঘর। থমকে দাঁড়ালো দু-জনে দোরগোড়ায়। নয়নতারার ঘর থেকে তাঁর তারস্বর তর্জন আর সেই সঙ্গে দুটো বাচ্চার কান-ফাটানো কান্নার শব্দ, সরোজের ঘর থেকে হঠাৎ গিন্নির বেরিয়ে আসা এবং ওদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই মুখ-চোখ বেঁকিয়ে আবার সরোজের ঘরেই টুপ ক'রে ডুবে যাওয়া, বিভাবতীর ঘর থেকে তাঁর ছোটোছেলের একঘেয়ে পড়ার স্বর—

এমনি এক আবহাওয়া পেছনে রেখে ওরা দু-জনে ঢুকে পড়লো অন্ধকার ঘরটার মধ্যে।

আলো জ্বালতে দেখা গেল নীরজা শুয়ে আছেন চোখ মেলেই। অস্বাভাবিক হিমশীতল দুটি চোখ। ও-পাশের বিছানায় ঘুমোচ্ছে তাঁর ছোটো তিন মেয়ে। আদিত্যপ্রসাদ ঘরে নেই।

'ছোটোমামি—' ঝুঁকে পড়লো উন্মেষ নীরজার ওপর, দু-হাতে তাঁর মাথাটা চেপে ধ'রে বললো, 'তুমি আবার এ কী লাগালে বলো তো। আবার আমাদের দোষ দাও তুমি!'

অস্বস্তি, বিরক্তি বোধ করেন নীরজা।

কিন্তু উন্মেষ তবু ছাড়ে না। বিরক্তিটা সে স্পষ্টই টের পায়। কিন্তু আর ঝামেলা বাড়াতে সে নারাজ, যেমন ক'রে হোক, যতদূর তার সাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখবে এই অসহ্য অবস্থাটা থেকে মুক্তি পাবার। বললো, 'আজ লুম্বিনি গিয়েছিলাম ছোটোমামি ডাক্তার সেনের সঙ্গে আলাপ করতে। তিনি কি বললেন জানো, তিনি বললেন হাওয়া-বদল করান। হাওয়া-বদলে এ-সব কেস-এ নাকি বেশ উপকার পাওয়া যায়। তা আমি তো ঠিক ক'রে ফেলেছি মেজোমামাকে নিয়ে হাজারিবাগ গিয়ে থাকবো যদ্দিন-না তিনি সেরে ওঠেন। সঙ্গে থাকবে তুমি আর রিণি।'

হিমশীতল চোখ দুটিতে একটু যেন রঙ-বদল হয়।

নীরজা বললেন, 'শুধু হাওয়া-বদলেই হবে? আর-কিছু লাগবে না?'

'লাগবে না! আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো মেজোমামার সমস্ত— মনের সমস্ত— সমস্ত—' কথা হাতড়ে পায় না উন্মেষ কতক্ষণ, আর তারপর উচ্ছ্বসিত কথার ফোয়ারা ছুটে যায়, 'সমস্ত গ্লানি বিকার ধুয়ে-মুছে ফেলবার। আবার সেই আগেকার মেজোমামাকে আমরা উদ্ধার করবো। ফিরে আসবে সেই সহজ হাওয়া, হাসিখুশি মন, সেই

চমৎকার দিনগুলো। সেখানে গিয়ে আমরা নিরিবিলি থাকবো খুব, সব রকম ভিড় ধুলো হট্টগোল থেকে সরিয়ে রাখবো মেজোমামাকে। ভোর-ভোর থাকতে সূর্য উঠবার আগেই চ'লে যাবো সবাই মিলে পাহাড়ের দিকে। ঠিক আছে, মেজোমামা গাড়ি গাড়ি করছেন, একখানা মোটরকারও কিনে নিয়ে যাবো সঙ্গে, তাইতে ক'রে বেড়াতে বেরুবো সকলে মিলে ভোরবেলা আর সন্ধেবেলা··· আঃ, কী মজাই হবে। পড়াশুনো সম্পর্কেও আর ঝঞ্ঝাট থাকবে না কোনো। রিণি পড়তে পারবে আমার কাছেই, আমি পড়বো মেজোমামার কাছে। আবার সেই আগেকার মতো মেজোমামা নোট দেবেন, আমি সেগুলো—'

'কবে যাবি?' উত্তেজনায় উঠে বসেন নীরজা, 'যেতে হ'লে খামকা দেরি ক'রে লাভ কী। কালকেই তো রওনা হ'তে পারি আমরা, বাড়িটা তো খালিই আছে এখন—'

'কালকেই? কাল কী ক'রে যাবে এই অসুস্থ শরীরে?'

'কে অসুস্থ? আমার জন্যে ভাবিসনে—এ-বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারলেই আমি সুস্থ হ'য়ে যাবো। কালকেই তাহ'লে— দে রুণি, কী খেতে দিবি দে। আঃ, একথাটা আগে যদি মনে আসতো। তাহ'লে উনিশ, লক্ষ্মীটি, কালকেই তুই সব ব্যবস্থা সেরে ফ্যাল, কেমন?'

ঝিকিমিকি মৃগতৃষ্ণিকার খেলা চলতে লাগলো ঘরটার মধ্যে। আলেয়ার আলো জলতে লাগলো নিভতে লাগলো নীরজার চোখে— আর তাই দেখে টিপটিপ কাঁপে উন্মেষের চোখের তারা, ঘূর্ণির বুকের মধ্যে টিপটিপ করে।

•

টিপটিপ কাঁপছে আকাশের অনেক তারা। ডিমের আকার চাঁদ ভাসছে আকাশের মাঝখানে। তার রুপোলি হাসির বন্যায় প্লাবিত

পরিচ্ছন্ন পৃথিবী এখন কী সুধাময়ী! দেখে-দেখে অবাক লাগে উন্মেষের। জানালার পাশে, নির্জন ঘরে, এই আলো-নেভানো মধ্যরাতের নিঃসঙ্গ জাগরণ, জীবন সম্বন্ধে এখনো-অত্যন্ত-অনভিজ্ঞ উন্মেষকে যেন সহস্রচোখ ক'রে তোলে। সুন্দর-অসুন্দরের কত জটিল তত্ত্ব এখন ঐ আকাশের তারার মতোই টিপটিপ করে তার মনের মধ্যে, টিপটিপ করতে-করতে হেসে ফেটে গড়িয়ে পড়ে কণা-কণা, মিশে যায় বাইরের ঐ তরল আলোর ধারায়।

যদি ভেসে যাওয়া যেতো ঐ আলোর গভীরে। 'ওরে বাতাস দিলো দোল, দিলো দোল, এবার ঘাটের বাঁধন খোল, ও তুই খোল! মাঝনদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে! আর সময় নাহি রে…' কী সুন্দর গায় বিনতা। ওর গানের মতোই ও সুন্দর… মমতাময়ী… অপাপবিদ্ধ… যদি ঐ সুরের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অবগাহন করা যেতো সারাটা জীবন।

কী কথা বলতে এসেছিলো ও? কাল যেতে বললো সকালে। কী কথা বলবে ও? যদি— ধরা যাক যদি সেই কথাই হয়, তাহ'লেই বা কী। কাল না হোক পর্শু, আমার একমাত্র চিন্তনীয় এখন তো হাজারিবাগ! আত্মহত্যা, প্রায়শ্চিত্তই এখন আমার একমাত্র ব্রত, একমাত্র স্বপ্ন! কতদিনে সেরে উঠবেন মেজোমামা কে জানে, ততদিন কি অপেক্ষা করবে ও? করবে? 'কবে তুমি আসবে ব'লে রইবো না ব'সে, আমি চলবো বাহিরে! শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খ'সে, আর সময় নাহি রে!'

তাহ'লে কী হবে গিয়ে কাল সকালে। কে জানে কী ভবিষ্যৎ আমার। তার মধ্যে ওকে জড়িয়ে, ওকে দুঃখ দিয়ে কী লাভ! আচ্ছা, ওকেও যদি বলি, চলো-না হাজারিবাগ… পূষন্‌কে নিয়েই চলো… কলকাতা তো

ভালো লাগে না তোমার, কলকাতা ছাড়তে পারলে তো বাঁচো তুমি বলছিলে। রাজী হবে কি ও?

ও কি ঘুমোচ্ছে এখন? ঘুমিয়ে আছে? আশ্চর্য! ও তাহ'লে দেখছে না এই আকাশ? এই ঝিরিঝিরি হাওয়া ভ'রে নিচ্ছে না বুক? যদি ঘুমিয়েই থাকে তাহ'লে এই হাওয়া গিয়ে লাগছে না ওর আঁচলে? ওর— কিন্তু এত বড়ো আকাশ নেই তো ওর জানালায়—

হঠাৎ রীতিমতো চমকে ওঠে উন্মেষ।

'একি! এত রাত্তিরে? ঢুকলি কী ক'রে?'

'ঘুমোসনি তুই? কী করছিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?'

'তুই উঠে এলি কেন এত রাত্তিরে? ঘুম আসছে না তোরও?'

'জ্যাঠামণির ঘরে চল—'

ধক ক'রে ওঠে উন্মেষের বুকের মধ্যে। বললো কোনোরকমে, 'কেন, কী হয়েছে?'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাথরুমে যাচ্ছি— ভাবলাম, উঁকি দিয়ে দেখে যাই একবার জ্যাঠামণিকে। গিয়ে দেখি কি, আলো জ্বালা আছে, আর এলোমেলো পায়চারি করছেন জ্যাঠামণি ঘরের মধ্যে! আর থেকে-থেকে টেব্‌লে গিয়ে ব'সে প'ড়ে ঘসঘস ক'রে কী লিখছেন। দেখে তো আমার রক্ত জল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে শেষে ছুটে এলাম তোর ঘরে— তা দেখি তোর ঘরও খোলা।'

স্তব্ধ হ'য়ে থাকে উন্মেষ।

'আমার বড়ো ভয় করছে উনিশদা। মনে হচ্ছে বড়োজ্যাঠাকে এক্ষুনি খবর দেওয়া দরকার। কীরকম ভয়ানক দেখতে লাগছে এখন জ্যাঠামণিকে, দেখলেই বুক শুকিয়ে যায়। চল তুই, চল।'

শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইলো উন্মেষ।

'যাবি না ?'

টিপটিপ কাঁপছে আকাশের তারা। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে তাই উন্মেষ।

মুখ ঢেকে হঠাৎ কেঁদে উঠলো ঘূর্ণি।

'এই রিণি! এই! আরে! কী ছেলেমানুষী করছিস··· আঃ থাম না··· থামলি ?'

ছুটে পালিয়ে গেল ঘূর্ণি অন্ধকারের মধ্যে ঘরের বাইরে। উন্মেষও ছুটলো পিছু-পিছু। ঘূর্ণিকে ধ'রে ফেলে বললো, 'চল যাই দেখে আসি মেজোমামাকে, চল।'

দু-জনে এসে দাঁড়ালো নিত্যপ্রসাদের ঘরের দরজার মুখে। বাইরে থেকে তালা লাগানো আছে, চাবি ঘূর্ণির কাছেই। সেই তালাবন্ধ দরজার পাল্লা দুটো ঠেলে ফাঁক ক'রে দু-জনে উঁকি দিলো ভেতরে। কই ? কোথায় তিনি ? ঐ যে, পা-দুটো দেখা যাচ্ছে, শুয়ে আছেন ইজি-চেয়ারটায়, শুয়ে-শুয়ে পা নাড়ছেন।

স'রে এলো ওরা। বারান্দার আলোটা নেভানো, অন্ধকারের মধ্যে ফিসফিস ক'রে ঘূর্ণি বললে, 'কী করবি উনিশদা ? ঘুমোয়নি, এক্ষুনি আবার দাপাদাপি শুরু করবে। ডাকবো বড়োজ্যাঠাকে ?'

'সাহস হয় ?'

'তাহ'লে কি এমনি ছটফট ক'রে মরবে সারাটা রাত ?' ঘূর্ণির কান্না-জড়ানো বিকৃত চাপা গলা এবার অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে।

'কী করবি বল ?'

'কেন এরকম ছটফট করছেন জানিস তুই ?' অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছে ঘূর্ণি, 'আজ সারা দিন-রাত্তিরে কিচ্ছু পেটে পড়েনি, তাই। খিদের জ্বালায় এমনি করছেন।'

'কিছুই খাননি ?'

'সেই কোন সকালে একটু দুধ-সন্দেশ— ব্যস ! আর কিছু না। আমি এক কাজ করি উনিশদা, ভেতরে ঢুকি গিয়ে— তারপর যা থাকে কপালে। এখন তো আর অন্য কিছু খাবার হবে না, আপেল নাসপাতি সন্দেশ যা আছে দিয়ে দেখি— কি বলিস ?'

'বেশ, ছাখ কী হয়। আমার তো আর ঢোকা চলবে না, যা তুই, আমি বাইরে আছি।'

লঘু পায়ে ছুটে চ'লে যায় ঘূর্ণি ওদের শোবার ঘরে। উন্মেষ দাঁড়িয়েই থাকে বারান্দার অন্ধকারে। মিনিট দুই পরে পা টিপে-টিপে ফিরে এলো ঘূর্ণি, এক হাতে জল, অন্য হাতে রেকাবি-ভরা ফল-মিষ্টি নিয়ে।

'ধর তো উনিশদা।'

উন্মেষের হাতে ওগুলো দিয়ে চাবি বের ক'রে সন্তর্পণে খুললো ঘূর্ণি মস্ত তালাটা। তারপর রেকাবি আর গ্লাসটা নিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে।

আর উন্মেষ, ভারী নীল পর্দাটার পেছনে নিশ্চল স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

* * প নে রো * *

সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না বিনতার। আলো-নেভানো ঘরের নিশুতি অন্ধকারের মধ্যে সে-রাত্রে রাজ্যের অবসাদ আর ভয় ওর সমস্ত চৈতন্যে বাদুড় আর চামচিকের মতো ডানা ঝাপটাতে লাগলো। শেষপর্যন্ত আলো জ্বেলে ডায়েরি লিখতে বসলো সে। কিন্তু কী লিখবে? এই অন্ধকার, এই অসহ্য পথ-চলা, এই অন্তবিহীন রাত, আর এই বিক্ষুব্ধ মন! কেউ কি জানে— কী সেই পরম আশ্বাস যা পেলে সে আর কিছুই চায় না। কেউ কি জানে— কোথায় সেই সুখের নীল সরোবর যেখানে অজস্র পদ্ম ফুটে আছে— গুনে-গুনে শেষ করা যায় না, দেখে-দেখে ক্লান্তি লাগে না, মন ব'লে ওঠে না— না, না! কোথায় সেই স্বর্গ? সংসারের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে চল্‌কে-চল্‌কে উঠছে বিষ! কিলবিল করছে সাপ, আর মানুষের আশা আশ্বাস স্বপ্ন যেন অসহায় কতগুলো ব্যাঙ হ'য়ে গিয়ে পড়ছে ওদের মুখে! ফণা তুলে চতুর্দিক থেকে— বমি ক'রে ফেললো বিনতা বিছানার ওপরেই।

আস্তে নেমে পড়লো সে, ছুটে গিয়ে দরজা খুললো, অন্ধকারের মধ্যে টলতে-টলতে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমের মধ্যে, ব'সে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে। বমি আর হয় না। কিন্তু অসহ্য উদ্গার যায় না কিছুতেই। গলায় আঙুল দিয়েও ফল হয় না কিছু। জলের জন্য হাত বাড়ায় তখন কিন্তু মগটা হাতড়ে পায় না। আলো জ্বাললো বাথরুমের। আঃ, চৌবাচ্চা-ভর্তি জল! এই তো! এই তো পেলাম স্বর্গ! মগ-মগ জল ঢালতে লাগলো বিনতা বুকে মুখে মাথায়। আঃ, কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা!

একেবারে বেশ ক'রে স্নান ক'রে নিলে কেমন হয়, ভাবলো সে। শরীরের এই আগুন জল ছাড়া আর-কিছুতে নিভবে না। কিন্তু

বিছানাটা যে নোংরা হ'য়ে গেছে! ফিরে গিয়ে সে তুলে ফেললো বিছানার সুজনিটা। এনে বারান্দায় ফেললো। কী অন্ধকার বাইরে। কেউ কোথাও জেগে নেই। কী নিঃঝুম মৃত রাত। পাশের মস্ত বাড়িটা থেকে মাতালটার চ্যাচানোর শব্দও তো আসছে না? ক'টা বাজে? নাঃ, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই— খুব ঠেসে স্নান করা যাক— চৌবাচ্চা-ভর্তি জল! এত জল যে গলায় দড়ি-কলসী বেঁধে ডুবে পর্যন্ত মরা যায়! ডুবে পর্যন্ত মরা যায়? যাবে না কেন— মেজদি মরলো মা-র চাবুক খেয়ে, দিদি মরলো গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়ে, আমার নিয়তি তাহ'লে বোধ করি জল-ই! ইলেকট্রিক-বেল্‌টা বেজে উঠলো না? ধড়াস ক'রে ওঠে বিনতার বুকের মধ্যে। ছুটে গিয়ে বন্ধ করলো ঘরের দরজাটা। আলো নিভিয়ে দিলো। নিশ্চিহ্ন, অবলুপ্ত— কান খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। বেল্‌টা বেজেই চলেছে। ভরতের তিরিক্ষি বিড়বিড় গলা শোনা গেল। একটু পরে নীলাম্বরের মাতাল কথাবার্তা আর ভরতের ধমকানি। যাক, ওপরে উঠে যাক, ওরা ওদের নিজের-নিজের গর্তে ঢুকুক আগে, তারপর বেরুবে বিনতা তার গর্ত থেকে। সমস্ত শরীরে বিকার— বড়ো অশুচি হ'য়ে রয়েছে শরীরটা। ভালো ক'রে সাবান মেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ হ'তে হবে— কালকে যে উনিশ আসবে। সকালেই আসবে। খুব সকালে, সকলের ঘুম ভাঙবার আগেই, সূর্য ওঠার আগেই যদি আসে? তাই তো আসা উচিত। ও কি বুঝতে পারেনি সব? কী সুন্দর ওর চোখ দুটি। খুব সকালেই আসবে ও? তাহ'লে তখন তো স্নানের সময় পাওয়া যাবে না। রাত্রেই তাই ও-সব পাট সেরে ফেলতে হবে। একেবারে তৈরি হ'য়ে বাসকসজ্জায় ব'সে থাকতে হবে কাল সকালের জন্যে। যেন নতুন জীবন শুরু হ'তে পারে তার কাল সকাল থেকেই।

• • •

একেবারে প্রথম মুহূর্তটি থেকেই। যেন নির্মল প্রসন্ন সুন্দর চোখে সে বরণ ক'রে নিতে পারে নতুন জীবনকে— কিন্তু কী ব'লে অভ্যর্থনা করবে সে কালকের সকালকে?

আলো জেলে বিনতা দেয়ালে-ঝোলানো ক্যালেণ্ডারটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এত কাছে থেকে সে তাকিয়ে রইলো কালো-কালো বড়ো-বড়ো অক্ষরগুলোর দিকে আচ্ছন্ন বিবশ দুটি চোখ মেলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না চোখের সামনে তার নিকষ কালো সর্বগ্রাসী এক পর্দা দুলে উঠলো··· সব ডুবে গেল··· পৃথিবী ট'লে উঠলো··· আর দু-হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে ব'সে পড়লো সে মেঝের ওপর— ততক্ষণ পর্যন্ত সে টেরই পেলে না যে তার আবার বমির উদ্গার আসছে, সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচড়ে ঘুলিয়ে উঠছে। আর, এ কী— আবার গলগল ক'রে বমি ক'রে ফেললো সে।

মাথার মধ্যে কুরে-কুরে খাচ্ছে যেন কয়েকটা পোকা— আঃ, মাথার চুলগুলো সব যদি টেনে ছিঁড়ে ফেলা যেতো তো মাথার এই যন্ত্রণার শেষ হ'তো!

নাঃ, আর দেরি করা নয়— স্নানটা সেরে ফেলা যাক, নয়তো কিছুতেই এ-বিকার কাটবে না। এক টুকরো নেবু যদি পাওয়া যেতো, কি একটু নুন— যাক, তা এখন পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে না, তার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে লাভ নেই— একথাটা আগেই বোঝা ভালো। যা পাওয়া যাবে না, যা কিছুতেই পাওয়া যাবে না— উঃ, মাগো মা— কেঁদে ফেললো বিনতা।

সেই কান্না জড়িয়ে গেল নিশ্চুপ নিশ্চল সূচীমুখ প্রতিটি মুহূর্তে, আর স্তব্ধ আসনে কালরাত কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। বিশ্বজগৎ যেন সত্যিই তখন নিশ্বাসবায়ু সংবরণ ক'রে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে উত্থানশক্তি ফিরে পেলো বিনতা। উঠে তোয়ালে আর সাবানটা সংগ্রহ করলো, স্যুটকেস খুলে শাড়ি শায়া ব্লাউজ। কিন্তু বমিটা এমনি প'ড়ে থাকবে? স্নান ক'রে যখন ফিরে আসবে সে, তখনো এমনি অশুচি হ'য়ে থাকবে ঘরটা? তাহ'লে আর স্নান করার মানে কি হ'লো। কুঁজোর গলাটা ধ'রে সে ভাবতে লাগলো ব'সে-ব'সে বমিটার দিকে তাকিয়ে— কেমন ক'রে ওটা পরিষ্কার ক'রে ফেলা যায়।

নিষ্পন্ন হ'লো কাজটা।

তারপর স্নান। বমি-মাখা সুজনিটাও তুলে নিলো বারান্দা থেকে। এ-নোংরা তারই ধুয়ে ফেলা উচিত। বাথরুমে ঢুকে আগে সেটা পরিষ্কার করলো। তারপর— মনটা তার আনন্দে যেন ময়ূরের মতোই নেচে উঠলো, এই এক-চৌবাচ্চা জল এবার! একটু শীত-শীত লাগছে— তা হোক, ওটা বমির বিকার, জল গায়ে পড়লেই সব কেটে যাবে। অন্ধকার ক'রে নেবো? হ্যাঁ, সেই ভালো। সত্যি, অন্ধকারের মতো আর কিছু হয় না। কেমন আশ্চর্য লাগে নিজেকে নিকষ নিবিড় নিঃঝুম অন্ধকারের মধ্যে। তবে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্নান করা যাবে না— সে-খানে আরাম নেই, ঘুমের আমেজ নেই। বালতিটাতে জল ভর্তি ক'রে নেওয়া যাক বরং। তারপর— আঃ!

গুনগুনিয়ে একটা গান— অনেক, অনেক দূর থেকে ভেসে আসে যেমন ক্ষীণ করুণ কিন্তু মিষ্টি একটানা জলের ধারা, তেমনি— অথবা জংলা ঘন বনের মধ্যে যেমন পাতায়-পাতায় মৃদু শিরশিরানি, লঘু হাওয়ার কানাকানি কি ফিসফিস আওয়াজ থেকে-থেকে, তেমনি— অথবা গভীর, গভীর অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূর থেকে মালকোশ রাগে বেহালার স্বরমূর্ছনার মতো একটা গান যদি গাইতে পারতাম আমি। তাহ'লে এই শীত, শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি ছিঁড়ে যাবার এই যন্ত্রণা, এই

কুৎসিত অসহ্য বমির বিকার— সমস্ত, সমস্ত ঠেকানো যেতো নিশ্চয়। মাগো মা— শীতের আঁচড়ে যতই কাঁপতে লাগলো বিনতা থরথরিয়ে, সমস্ত শরীরটা যতই যন্ত্রণায় বিকারে দুমড়ে কুঁকড়ে ভেঙেচুরে যেতে লাগলো ততই অস্থির অবশ আচ্ছন্ন চেতনায় পাগলের মতো সে ঝুপ-ঝুপ ক'রে জল ঢালতে লাগলো সারা গায়ে।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর চললো না এই পাগলামি। তীব্র জ্বরের প্রচণ্ড ধমকে শেষপর্যন্ত কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলতে হ'লো, প্রাণপণ চেষ্টায় শরীর-মনের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে গা মুছে ফেলে শায়া আর ব্লাউজটা বদলে ফেলতে পারলো, কিন্তু শাড়িটা জড়িয়ে নিতে আর সামর্থ্যে কুললো না— সেটা গায়ের উপর ফেলে দাঁতে-দাঁত চেপে কাঁপতে-কাঁপতে অন্ধকার চোখে ছুটলো সে নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু বাথরুমের বাইরেই ছিলো মস্ত আর-একটা বালতি— সেটাতে বেধে গিয়ে একেবারে হুড়মুড় ক'রে পড়লো উঠোনের ওপর— প্রচণ্ড ঝঞ্ঝন শব্দ উঠলো অন্ধকারে। শীতার্ত কালরাত দীর্ণ হ'লো অকস্মাৎ। চৈতন্য লোপ পেলো বিনতার।

* * ষোলো * *

বেলা আটটায় উন্মেষ যখন এসে দাঁড়ালো বিনতার ঘরের চৌকাঠে, তখন সারদা ব'সে আছেন মেয়ের শিয়রে, পূষন্ পায়ের দিকে, আর উর্মিলা পাশে। শুধু কম্বলে মানেনি, তার ওপর লেপও চাপাতে হয়েছে একটা। ইতিমধ্যে ইনজেক্শনও হ'য়ে গেছে, টিপয়ের ওপর ওষুধ মেজার-গ্লাশ ফিডিং-কাপ ইত্যাদিও জড়ো হয়েছে। বিকারের ঘোরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রলাপ ব'কে এখন ক্লান্ত নিঃশেষিত বিনতা নেতিয়ে প'ড়ে আছে চোখ বুজে।

জলপটি লাগাচ্ছিলেন সারদা মেয়ের কপালে। মাথায় কাপড় নেই, নিষ্প্রভ কোটরগত সদাবিষণ্ণ চোখ দুটি এখন অস্থির পাগলের মতো, দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন তিনি। উন্মেষ এসে দাঁড়াতেই একটু যেমন স্বস্তি বোধ করলেন, তেমনি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে মাথায় কাপড়টা টেনে দিলেন।

উর্মিলা উঠে প'ড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, ইঙ্গিতে ডেকে নিলো উন্মেষকে। বারান্দায় স'রে এসে বললো, 'এত দেরি করলে কেন। এদিকে ইনি পাগলামি ক'রে ছাখো কী কাণ্ড বাধিয়েছেন। সারারাত বমি করেছে, জ্বরও ছিলো বোধ হয় গায়ে— তারই ওপর দুপুররাত্তিরে উঠে ঠেসে চান করেছেন! তার ফলে ধুম জ্বর— পাঁচে উঠেছিলো ঠেলে, ইনজেক্শন খেয়ে এখন তবু একটু কম, তিন ডিগ্রি এখন। আর আবোল-তাবোল! তুমি এলে কি না জিগ্যেস করেছে অন্তত পাঁচশো বার। যাও, এক্ষুন সামলাও গিয়ে—'

ঘরে ফিরে এলো দু-জনে।

সারদা উঠে চ'লে যান ঘর থেকে। দেখাদেখি পূষন্ও।

বিনতার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো উর্মিলা, 'এই, এসেছে উন্মেষ, ছাখ, ছাখ-না, এই বিনতা—'

দেখলো বিনতা।

এগিয়ে এসে বসলো উন্মেষ পাশে।

কাঁপতে-কাঁপতে দোপাটির পাপড়ির মতো চোখের পাতা ছুটি আবার বুজে আসে। কেটে যায় কয়েকটি মুহূর্ত। উর্মিলা স'রে যায় ঘর থেকে, ভেজিয়ে দিয়ে যায় দরজাটা।

বিনতার কপালে হাত রাখলো উন্মেষ। উঃ, পুড়ে যাচ্ছে হাতখানা।

উন্মেষের দিকে পাশ ফেরে বিনতা। লেপ-কম্বলের তলা থেকে হাত বের ক'রে জড়িয়ে ধরে উন্মেষের অন্য হাতটা। বলে, 'বড্ডো দেরি করেছো তুমি, ভয়ানক দেরি করেছো।'

'তা না-হয় করেছি, কিন্তু তুমি-ই বা হঠাৎ এমনি পাগলামি করতে গেলে কেন বলো তো। জ্বর-গায়ে শুনলাম চান করেছো দুপুররাত্তিরে উঠে? এ তোমার কী খেয়াল?'

'খেয়াল!' পাণ্ডুর মুখখানায় ক্ষীণ হাসির লজ্জা ফুটে ওঠে, 'কে বললো খেয়াল?'

'খেয়াল নয়? তবে তুমি ইচ্ছে ক'রেই এই জ্বর—'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রেই, ইচ্ছে ক'রেই—' বলতে-বলতে টেনে নেয় উন্মেষের হাতখানা তার বুকের মধ্যে।

রক্তের ঝড় ওঠে উন্মেষের শরীরে। কিন্তু অনভিজ্ঞ অবশ হাতখানা তার বোধ করি রক্তশূন্য হ'য়ে যায়।

'উনিশ!'

'কী?'

আর বললে না কিছু বিনতা। অসহ্য আবেগে কাঁপতে থাকে

জ্বরতপ্ত চোখ দুটি। অন্তরঙ্গ অনুভূতির তীব্রতায় মুখখানা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে।

আরো ঝুঁকে পড়ে উন্মেষ। বলে, 'বিনতা!'

'উঁ?'

'কী বলছিলে?'

'কিছু না।'

'কিছু না?'

'তুমি ভারি—'

ছোটো-ছোটো মাছ খেলা করে হ্রদের স্ফটিক জলে, নীল শূন্যে মিটিমিটি কাঁপে তারা, জলার বুকে নলখাগড়ার চারপাশে পাক খেয়ে মরে বাবুইপাখি, পানকৌড়ি টুপটুপ জলে পড়ে, কোন-এক পদ্মবিলে দুটি হাঁস জলের বুকে বিলি কেটে চলে অবিশ্রাম, মাকড়সা জাল বোনে ঘর বানায় ক্লান্তিহীন।

অনেকক্ষণ পরে উর্মিলা এসে দাঁড়ালো কাছে। উন্মেষ উঠে বসলো।

'কান্ট্ হেল্প—' দুঃখপ্রকাশ করে উর্মিলা, 'ওষুধ খাওয়াতে হবে এখন, তাই একটু ডিস্টার্ব না ক'রে পারা গেল না।'

'ঐ তিতকুটে ওষুধ আমি আর খেলে তো!'

'তা খাবে কেন, তার চেয়ে বরং খুব ক'রে আরেকটু স্নান ক'রে নাও। প্রেম আর বোকামি মূলত যে একই জিনিস, সেটা দেখছি অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি—' বলতে-বলতে কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা পরীক্ষা করে উর্মিলা, 'কই, কমেনি তো? তুমি কিচ্ছু না উন্মেষবাবু— কী করলে তবে এতক্ষণ, অ্যাঁ!'

এমন সময় দরজার মুখে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াতে দেখা গেল ভূষনের সঙ্গী-সাথী কিশোর বাহিনীর সেই ছেলে-মেয়েগুলিকে যারা বিনতার কাছে গান শিখতে আসছে ক'দিন ধ'রে।

'এই যে এসে হাজির হলেন বিনতা দেবীর চেলাচামুণ্ডা-বাহিনী! আর লজ্জা কী, এসেছো যখন ঢুকে পড়ো—' বললে উর্মিলা ওষুধ ঢালতে-ঢালতে।

'আমি উর্মিলাদি?' সকলের পেছন থেকে পূষনের উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

'তুমি? না, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। বরং জামা প'রে নাও চট্ ক'রে। বাজারে যেতে হবে তোমাকে। দিদির জন্যে কিছু ফল এনে দেবে।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল!' গভীর খেদ প্রকাশ করে পূষন্ বাইরে থেকেই। এবং সত্যিই সবাই ঢুকে পড়লো ঘরে, কিন্তু দেখা গেল, পূষন্ ঢুকলো না।

শ্যামলীর তৃতীয় গানটির পর উঠে দাঁড়ালো উন্মেষ।

'ও কি?' উর্মিলা প্রশ্ন করলো।

'সাড়ে দশটা বাজে, চলি এখন।'

'তারপর?' উর্মিলাই বললো।

'বিকেলে—' একটু না-হেসে উত্তরটা দিতে পারে না উন্মেষ। বিনতার দিকেও তাকায় একটু। ধরা প'ড়ে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় বিনতা, একটু যেন লজ্জা পায়। আর দাঁড়ালো না উন্মেষ। পূষনের মাথায় একটা টোকা মেরে বেরিয়ে পড়লো।

* * ঘ তে রো * *

ঘরের চার দেয়ালে এতটুকু জায়গাও আর বাকি ছিলো না। একটা পেন্সিল বাগিয়ে ধ'রে নিত্যপ্রসাদ দেয়ালের গায়ে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। যে-কথাটা একটু আগে মনে এসেছে তাঁর সেটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে অন্তত এক হাত পরিমাণ জায়গা দরকার। সেই এক হাত জায়গা ঘরের চার দেয়ালের গায়ে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেলেন নিত্যপ্রসাদ। গত কয়েকদিন অনবরত ছবি এঁকে-এঁকে আর লিখে-লিখে চারটে দেয়ালই হিজিবিজি কালো ক'রে ফেলেছেন। আর তাই এখন তাঁর প্রত্যাশিত জায়গাটুকু খুঁজে না পেয়ে চোখ-মুখ কালো কঠিন হ'য়ে উঠলো। হতাশ, বিরক্ত, ক্ষিপ্ত নিত্যপ্রসাদ অবশেষে দেয়ালের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিলেন, ধপাধপ লাথি মারলেন, বিকৃত মুখে গালাগালি দিলেন দেয়ালগুলোকে, 'শয়তানি ঘুচিয়ে দেবো তোমার, বেটা অকৃতজ্ঞ শয়তান!' দাঁতে-দাঁত চেপে গর্‌গর্‌ করতে-করতে এসে বসলেন ইজি-চেয়ারে। হাঁপাতে লাগলেন, ইংরিজিতে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

কিন্তু ব'সে থাকতে পারলেন না। উঠে প'ড়ে ফের ঘুরতে শুরু করলেন ঘরময়। চক্রাকারে। চক্রাকারে কখনো বন্‌বন্‌ ক'রে, কখনো আস্তে-আস্তে পাক খেতে লাগলেন লাট্টুর মতো। এমনি পাক খেতে-খেতে থেকে-থেকে প'ড়ে যেতে লাগলেন মাথা ঘুরে। একবার প'ড়ে গেলে মাথা ঝাড়া দিয়ে ফের উঠতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু তবু, আধঘণ্টা ধ'রে তাঁর মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে ব'সে আছে যে-হায়েনাটা— ধ্যানস্তিমিত-নেত্র কালো কুৎকুতে আবাকাবা-পরা বেড়াল-তপস্বী যে-হায়েনাটা, সেটা কিন্তু তবু দূর হ'লো না মাথা থেকে।

হায়েনাটার যে-চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চান তিনি তাঁর সদ্য-পরিকল্পিত

ছবিতে, তা হচ্ছে এই যে, পদ্মাসনে ব'সে আছে আবাকাবা-পরা হায়েনাটা' ধ্যানস্তিমিত-নেত্র, পুরু ঠোঁট দুটো তার যদিও ফাটা-ফাটা এবং কুৎসিত কালো— তবুও চেষ্টা করছে সে তাতে একটা সাত্ত্বিক নির্লোভ ভাব ফোটাতে। অথচ ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে ওর বেরিয়ে পড়েছে দুটো দাঁত— একটা সমুদ্রের জমাট ফেনার মতো শাদা, অন্যটা ড্রেনের ক্লেদের মতো কালো। এক হাতে তার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, অন্য হাতে একটা সাঁড়াশি (পায়ের তলায় লুকনো যদিও সেটা)।

ছবি আঁকার হাত নিত্যপ্রসাদের আবাল্য। কোনোদিন রঙ-তুলি নিয়ে বসেননি তিনি, চর্চা ক'রে-ক'রে এই গুণটিকে পাকা ক'রে তোলার কথা খেয়ালও করেননি। কেউ-কেউ খেয়াল করিয়ে দিলেও গ্রাহ্যে আনেননি। অথচ ছেলে-মেয়েদের পড়াতে-পড়াতে ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে কিংবা হাতে কোনো কাজ না থাকলে হাতের কাছে কাগজ-পেন্সিল পেয়ে গেলে— কখনো-কখনো, ঝোঁকের মাথায়, অবলীলায়, অবহেলায়— কত ছবিই যে এঁকেছেন তিনি জীবনে দু-চার টানে। আশ্চর্য প্রত্যক্ষ সব ছবি। সেই অযত্ন-লালিত প্রতিভাই যে আজ প্রৌঢ়, বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ নিত্যপ্রসাদের এমনি এক মানসিক অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়াবে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

চক্রাকারে ঘুরতে-ঘুরতে সহসা চোখ দুটি তাঁর খুশিতে জ্ব'লে ওঠে, বোঝা যায় আবার কিছু-একটা ঠাউরেছেন তিনি। ছুটে গিয়ে টি-টেব্‌লটা হেঁচকা টান মেরে দেয়ালের গায়ে নিয়ে এলেন। টেব্‌লটার ওপর ছিলো দামী একটি ফুলদানি, ছিটকে প'ড়ে গিয়ে সেটা টুকরো-টুকরো হ'লো। পেন্সিল-হস্তে নিত্যপ্রসাদ কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন টেব্‌লটার ওপর। দেয়ালে ভর দিয়ে নিবিষ্ট মনে লেগে গেলেন হায়েনাটার রূপায়ণে।

ঢং-ঢং ক'রে এগারোটা বাজতে লাগলো দেয়াল-ঘড়িটায়। ঢং ক'রে

প্রথম শব্দটা হ'তেই একটু চমকে উঠেছিলেন তিনি, তারপর আরো চার-পাঁচটা শব্দ পর্যন্ত ধৈর্য বজায় থাকলো তাঁর, কিন্তু তার পরেও ঢং-ঢং বেজে চললো দেখে বিরক্তির আর সীমা রইলো না— কুঞ্চিত বিকৃত মুখে গালি দিলেন ঘড়িটাকে, মুখ ফেরালেন ঘড়িটার দিকে— কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছলো না দৃষ্টি, তার আগেই আটকে গেল দেয়ালে-ঝোলানো একটা ছবিতে।

কার ছবি ওটা? কে? ও কে?

হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেল পেন্সিলটা। ঠোঁট ঝুলে পড়লো। স্তম্ভিত, বিবর্ণ, বৃদ্ধ মুখখানা সহস্র বলিরেখায় ছেয়ে গেল, ঘোলা-ঘোলা চোখ দুটি যেন তীব্র বিষক্রিয়ায় জ্ব'লে পুড়ে গ'লে যেতে লাগলো— ছবিতে বাঁধানো উন্মেষের হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিত্যপ্রসাদের সমস্ত সত্তা সহসা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিজেকেই দেখতে লাগলেন তিনি, সমস্ত অতীত ঝিকিয়ে উঠলো মনের অন্দরে। আক্ষেপে, হতাশায়, কান্নায় প্রথিতযশা উন্নত-ললাট এই অধ্যাপক সহসা যেন জীবনের শেষ বোঝাপড়ার সম্মুখীন হলেন।

কিন্তু হ'লো না বোঝাপড়া। অহমিকায়, বিদ্বেষে, রাগে আবার ভণ্ডুল হ'য়ে গেল সব। সহ্য হ'লো না ঐ হাসিমুখ। তীব্র ঘৃণায় মুঠি পাকালেন নিত্যপ্রসাদ। ছবিটা টেনে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে শরীরের সমস্ত মাংসপেশী তাঁর শক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু হাত বাড়িয়ে ছবিটা ধরতে যেতেই উল্টে গেল টেব্‌লটা, টাল সামলাতে না পেরে দড়াম ক'রে মুখ থুবড়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত কোনো স্পন্দনই রইলো না আর, তারপর মুঠি-পাকানো হাত দুটো একবার বুঝি খুলবার চেষ্টা করলেন, একটু জলের জন্যে তৃষ্ণার্ত জিভটা কেঁপে-কেঁপে উঠলো— আর তার পরই সব আগুন

নির্বাপিত, সব তৃষ্ণা প্রশমিত হ'য়ে গেল— নাভিমূল থেকে কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে এলো জীবনের শেষ সুদীর্ঘ নিশ্বাস। কেউ শুনলো না নিত্যপ্রসাদের শেষ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

বিনতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উন্মেষ মেজোমামাকে নিয়ে হাজারিবাগ যাওয়া সম্বন্ধে ডাক্তার বক্সীর পরামর্শ নিতে গিয়েছিলো। ডাক্তার বক্সীও অনুমোদন করেছেন ডাক্তার সেনের পরামর্শ। ভাবতে-ভাবতে উন্মেষ প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় যখন পৌছলো এসে বাড়িতে, তখন মিত্রসদন নিথর নিস্তব্ধ এক মৃত্যুপুরী।

* * আ ঠা রো * *

বিনতার কাছে খবরটা পৌঁছলো সন্ধের সময়— যখন সে অধীর হ'য়ে উঠেছে উন্মেষের জন্যে অপেক্ষা ক'রে-ক'রে।

ব'লে গেল সে বিকেলে আসবে, কিন্তু বিকেল গেল, অন্ধকার হ'য়ে এলো ঘর, মা এসে আলোটা জেলে দিলেন। কিন্তু কোথায় উন্মেষ। না সে, না উর্মিলা। উর্মিলারই বা হ'লো কী। না কি মুখপুড়ী ও আসবে ব'লেই আসছে না? সুযোগ দিচ্ছে আমাদের একলা থাকবার? কিন্তু কপাল আমার, সুযোগ যার কাছে কিছুতেই আসবে না তুই তাকে কী ক'রে ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে দিবি! মা ব'লে গেলেন জরটা এখন কমের দিকে, কিন্তু আছে একটু। তা থাকে থাকুক, গ্লানির ভাবটা ক্রমশই কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু সারদা এসে যেই আলোটা জেলে দিলেন, পাতলা অন্ধকারের রহস্যময় পর্দাটা অতর্কিতে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে বিশ্রি শাদা দেয়ালগুলো যেই ঝকঝক ক'রে উঠলো, অমনি ফাল্গুনের ঠাণ্ডা আদুরে বাতাস যেন হঠাৎ তাড়া খেয়ে দুরন্ত দামাল হ'য়ে লাফ দিয়ে পড়লো বিনতার মনের মধ্যে। গুরুগুরু ক'রে উঠলো মেঘ। উত্তর আকাশে যেন কেউ কালো মশাল তুলে ধরলো, ভ্রূকুটি দেখা গেল কি কালবৈশাখীর।

'ও কি রে বিনু, উঠে বসেছিস কেন—' দুধ-সাবু নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সারদা, আর তাঁর আগে-আগে পূষন্ বেদানার প্লেট হাতে নিয়ে।

'এগুলো সব তুমি একা খাবে না, আমিও খাবো। কিন্তু ঐ দুধ-সাবু সবটা তুমি একাই খাবে—' বলতে-বলতে পূষন্ বিনতার বিছানায় ব'সে প'ড়ে জড়িয়ে ধরে দিদিকে, বলে, 'খেয়ে নাও দিদি চটপট ঐ বিচ্ছিরি জিনিসটা, ও না খেলে জ্বর সারে না, জানো?'

চুলের মুঠি ধ'রে নেড়ে দেয় বিনতা পূষনের মাথাটা। হাসে মা-র দিকে তাকিয়ে।

খুশিতে এখন কেমন কোমল দেখাচ্ছে সারদার মুখখানা। বললেন, 'নে মা, খেয়ে নে একটু কষ্ট ক'রে। খারাপ লাগবে না, খেয়ে ছাখ।'

বিনতা বাটিটা নিলো।

'পর্শুদিন দিদি দোল, জানো? মাকে বলেছি, বাসন্তী রঙ কিনে দেবে। তোমার একখানা আর মা-র একখানা শাড়ি বাসন্তী রঙে ছুপিয়ে তোমরা পরবে, মা রাজী হয়েছে। আর আমি এমন ম্যাজেণ্টা রঙ লাগাবো তোমাদের যে ভূত বানিয়ে ছেড়ে দেবো। কিন্তু তুমি যে কী বোকার মতো জ্বর বাধিয়ে ব'সে আছো এই সময়।'

দুধ-সাবু খেয়ে নিয়ে বাটিটা ফিরিয়ে দিলো বিনতা সারদার হাতে। বললো, 'তুমি বুঝি মা খুব ক'ষে তাল দিচ্ছো ছেলের পাগলামিতে। এই রাক্ষস, আমার বেদানাগুলো কেমন টপাটপ মুখে পোরা হচ্ছে, দে আমাকে।'

এমনি সময় ঘরে ঢুকলো উর্মিলা উর্ধ্বশ্বাসে।

চমকে উঠলো বিনতা।

'সাংঘাতিক খবর মাসিমা, উন্মেষের মেজোমামা নিত্যপ্রসাদ মারা গেছেন।'

খবরটার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বোঝবার কথা নয় সারদার। কিন্তু বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি শিউরে উঠলেন।

'উন্মেষের মেজোমামা?' বলতে পারলেন সারদা, 'কী হয়েছিলো, কখন মারা গেলেন?'

কিন্তু সে-কথা যেন শুনতে পেলো না উর্মিলা, বিনতার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আমি দুপুরে বাড়ি ফিরেই মেজদার কাছে শুনি

খবরটা। শুনেই ছুটে গেলাম ওদের বাড়িতে। গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। শুনলাম হার্ট ফেল ক'রে হঠাৎ মারা গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে উন্মেষের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হ'লো না। শুধু বললো : বিনতাকে বোলো খবরটা।'

শুয়ে পড়ে বিনতা। স্থির চোখে শুনতে থাকে উর্মিলার কথা। আর উর্মিলা, খাপছাড়াভাবে বলতে থাকে নানান কথা। শুনতে-শুনতে একটু পরেই উঠে বসলো বিনতা। খাট থেকে নেমে প'ড়ে এগিয়ে গেল আলনার দিকে, চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালো, বললো উর্মিলাকে, 'আমার সঙ্গে যাবি ভাই একটু, একা-একা তো যেতে পারবো না।'

'সে কি! তুই এই জ্বর-গায়ে কোথায় যাবি—' সারদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ধরেন মেয়েকে, বললেন, 'আজ থাক। এখন আর গিয়ে কী করবি বল। তাছাড়া তুই নিজেই রুগী যে। অনর্থক ওদের ভোগ বাড়াবি।'

কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চায় না বিনতা। সে যাবেই। এক্ষুনি তার যাওয়া দরকার ও-বাড়ি।

অগত্যা সারদা পূষন্‌কে দিয়ে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দিলেন। উর্মিলা তার সঙ্গে চললো। ট্যাক্সি ছাড়বার আগে সারদা নিরুপায় চোখে অপরিসীম উদ্বেগে আর-একবার বললেন উর্মিলাকে, 'তুই তো মা রইলি সঙ্গে, সকাল-সকাল ফিরিস।'

ট্যাক্সিতে দু-জনের মধ্যে আর একটি কথাও হ'লো না। বিনতার একটা হাত দুই মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে উর্মিলা স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

মিত্রসদনের গেটে এসে গাড়ি থামতেই দরোয়ান দৌড়ে এসে খুলে দিলে গাড়ির দরজা। উর্মিলা বিনতাকে ধ'রে নিয়ে উঠে এলো দোতলায় একটি ঝিকে নিয়ে। যেতে-যেতে ঝি বললে, 'উনিশদাদাবাবু এখনো

ফেরেনিকো শ্মশান থেকে, তেনারই তো আসল কাজ, মুখাগ্নি তো তেনিই করবে। আহা, কী দেবতুল্য ব্যক্তিই ছিলেন গো মেজোকত্তা, কিন্তু কলির কেমন বিধান ভাখো দিদি, এমন অপঘাতে তেনি পরানটা খোয়ালেন। আহা, যেই-না বার করলে মেজোকত্তাকে ঘর থেকে, আহা-হা কী মরাকান্নাই না উঠলো বাড়িময়, আর ছোটো-মা সেই-যে অচৈতন্য হলেন, এখনতক পুরো চেতন হলেননি গো দিদি। আর ভুল বকছেন থেকে-থেকে। কেউ কাছে গেলে দূর-দূর ক'রে খেদিয়ে দিচ্ছেন। আহা, এমন সোনার সংসার— একটা মানুষ চ'লে গিয়ে এবার বুঝি স্বন্নলক্ষ্মী ছারেখারে যায় রে দিদি—' বলতে-বলতে ঝি নিয়ে এলো ওদের নীরজার ঘরের সামনে, ভেজানো-দরজাটা আস্তে ঠেলে খুলে দিলো। অন্ধকার ঘর, বাইরের বারান্দার আলো ঢুকে পড়লো খানিকটা ঘরের মধ্যে, ফিসফিস ক'রে বললে ঝি, 'রুণিদিদিমণি ব'সে রয়েছে ওঁয়ার শিয়রে ভাখো গে, আমি যাই বাচ্চাদের সামলাই গে—' বলতে-বলতে ঝি সেই ঘরের সুমুখ থেকে প্রায় পালিয়েই বাঁচলো।

উর্মিলা ও বিনতা সেই নিথর নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো নিস্পন্দ হ'য়ে। এমনি ক'রে কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে থাকতো বলা যায় না, কিন্তু একটু পরেই সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো ঘূর্ণি, বিস্রস্ত বসন ওর, কয়েক মুহূর্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো ওরা চুপচাপ। শেষে বিনতাই এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ঘূর্ণিকে।

'উনি কেমন আছেন এখন ? তোমার মা ?' মৃদু গলায় এক-সময় বলতে পারলো বিনতা।

'ভালো 'নেই। দাঁড়াও, আলোটা জেলে দিই—' ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে ঘূর্ণি।

'না— না, আলো জেলে দরকার নেই। চলো ওঁর পাশে গিয়ে

বসি—' বিনতা ঘূর্ণির হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে বসলো মস্ত পালঙ্কটার ওপর। ঊর্মিলাও বসলো এসে পাশে।

কাপড়চোপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন হ'য়ে নীরজা যেমন প'ড়ে ছিলেন তেমনিই রইলেন।

স্থির হ'য়ে রইলো সময়। অন্ধকার কাঁপতে লাগলো সেই ঘরে। আর ঘূর্ণি বিনতার কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে অস্থির হ'য়ে পড়তে লাগলো থেকে-থেকে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ওরা চমকে উঠলো। নীরজা ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বলছেন, 'কে তোমরা ?'

'আমি বিনতা—' কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো বিনতা।

'বিনতা ? ও, বিনতা।'

এর পরে আবার চুপ ক'রে রইলেন নীরজা কিছুক্ষণ। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন বিনতার মুখখানার দিকে সেই অন্ধকারের মধ্যেই। তার পরে বললেন আবার, 'আলোটা জ্বাল তো রুণি। দেখি, মেয়েটার মুখখানা দেখি একবার। তুমি কে ?'

'ও আমার বন্ধু, ঊর্মিলা।'

'ও। আলোটা জ্বাল-না রুণি।'

উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দেয় ঘূর্ণি। আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে ওঠে বিনতা। কেন কে জানে, হয়তো নীরজার মুখখানার ভয়ংকর বিষণ্ণতার দিকে তাকিয়ে, অথবা হয়তো অন্য-কিছু।

বিনতার দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে স্থির একহারা চোখে দেখতে লাগলেন নীরজা বিনতাকে। আর সেই অসহনীয় দৃষ্টির সামনে বিনতা কিছুতেই তুলে রাখতে পারলো না চোখ, বুঝি কাঁপতে লাগলো সে ভীরু দীপশিখার মতো।

আর, ঠিক এই সময় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো উন্মেষ।

উন্মেষকে দেখেই ঘূর্ণি খাটের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে।

উন্মেষ বিনতার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। গম্ভীর, পাথরের মতো নির্বিকার তার মুখ, বললো, 'তোমার না জ্বর ? জ্বর-গায়েই চ'লে এসেছো যে বড়ো ?'

'কেন আসবে না। একশো বার আসবে—' স্খলিত, অদ্ভুত গলায় ব'লে ওঠেন নীরজা, 'ও যে মানুষ, তাই এসেছে। তোর মতো অমানুষ হ'লে আসতো না।'

ঘূর্ণির ওপর ঝুঁকে পড়েছিলো উর্মিলা। বিনতা বোধ করি এবার তার নিজের মুখখানা, নিজের চোখ দুটি লুকনোর জন্যেই ঝুঁকে পড়লো ঘূর্ণির ওপর।

আর নীরজা বলতে থাকেন ছাড়া-ছাড়া গলায়, আপন মনে : 'কিন্তু ওরও নিয়তি দেখছি অনন্ত দুঃখভোগ। ভালোবাসা মহাপাপ। শুধু তিলে-তিলে জ্ব'লেপুড়ে খাক হ'য়ে যাওয়া। দ'গ্ধে-দ'গ্ধে বুক ফেটে ম'রে যাওয়া। সে যে কী যন্ত্রণা। একটা মানুষ কী যন্ত্রণা পেয়েই না পালিয়ে গেলেন আমাদের কাছ থেকে—' হঠাৎ নীরজার খেয়াল হয় ঘূর্ণি কাঁদছে, আর তাইতে রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন তিনি, খিটখিট ক'রে উঠলেন একেবারে, 'কাঁদিস কেন, অ্যাঁ, কাঁদিস কেন রে পোড়ামুখি, কাঁদিস কোন আক্কেলে ? কেন কাঁদবি, কার জন্যে কাঁদবি ? কেঁদে কিছু হবে না, আমি বলছি কেঁদে কিছু হয় না।'